আইন-ই-আকবরী

আবুল ফজল আল্লামী

আইন-ই-আকবরী আবুল ফজল আল্লামীর আকবরনামা গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড। মুসলিম ইতিহাস গ্রন্থমালার মধ্যে সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ এটি। *আকবরনামা*র প্রথম খণ্ডে রয়েছে রাজা তইমুর, সুর এবং বাবর আমলের বিস্তারিত ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ডে সম্রাট আকবরের ছেচল্লিশ বছর রাজত্বের ইতিহাস এবং তৃতীয় খণ্ড অর্থাৎ *আইন-ই-আকবরী*তে রয়েছে সম্রাট আকবরের রাজত্বসংক্রান্ত নানা তথ্য।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ শাসনব্যবস্থার বর্ণনায় যেখানে যুদ্ধবিদ্রোহ ও বিভিন্ন রাজবংশের কাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, সেখানে আবুল ফজল আল্লামী শাসনব্যবস্থার বর্ণনায় তা করেননি। তিনি সম্রাটের দরবারের সদস্য হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্রাটকে যেমন দেখেছেন ঠিক তেমনিভাবে সম্রাটকে তাঁর গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। ফলে মুসলিম ইতিহাসের অন্যান্য উৎসের প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার অনেক আগেই *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থ থেকে সবাই সাহায্য নিয়েছেন। গ্রন্থ হিসেবে *আইন-ই-আকবরী*র গুরুত্ব তাই অপরিসীম। এ গ্রন্থ থেকে সম্রাট আকবরের শাসনের খুঁটিনাটি বিষয়ও জানা যায়।

আবুল ফজল আল্লামীর জন্ম ১৪ই জানুয়ারি ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দ। মৃত্যু ১২ই আগস্ট ১৬০২ খিস্টাব্দ। সম্রাট আকবরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং মন্ত্রী। তাঁর পিতা শেখ মোবারক আধ্যাত্মিক নেতা এবং সে কালের খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন। পিতার সহচর্যে আবুল ফজল আল্লামীর শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত হয় এবং অতি অল্প বয়সেই তিনি মানসিকভাবে পরিপক্বতা অর্জন করেন। পনের বছর বয়সে একটি দুর্বোধ্য পাণ্ডুলিপির পাঠ উদ্ধারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং কাজটি তিনি করেছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। তাঁর মতো দূরদৃষ্টি ও ধীসম্পন্ন লেখক বিরল। তাঁর লেখায় শব্দের আলংকারিক ব্যবহার, বাক্য গঠনের কারুকার্য এমন যে অন্য কারো পক্ষে তা নকল করাও ছিলো কঠিন কাজ। সম্রাট আকবরের সভাসদ এবং লেখক হিসেবে তিনি খুব সহজেই সবার দৃষ্টি কেড়েছিলেন। *আকবরনামা*, *মক্তুবাদ-ই আল্লামী*, *আয়ার দানিশ* তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

আহমদ ফজলুর রহমান-এর জন্ম ২০শে এপ্রিল ১৯২৬ কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানার কাচিছাইড় গ্রামে। মৃত্যু ৮ই ডিসেম্বর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ। ১৯৪২ সালে আরমানিটোলা সরকারি হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৪৪ সালে প্রথম বিভাগে আইএ পাস করেন। ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে প্রথম বিভাগে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪৯ সালে বিসিএস (প্রথম ব্যাচ) অফিসার হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় এবং ১৯৬৬ সালে সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করলেও তাঁর পরিচিতি ঘটে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামি হিসেবে। এ সময়েই তাঁর চাকরি জীবনের অবসান ঘটে এবং এই মামলার আসামি থাকাকালেই তিনি এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেন।

আইন-ই-আকবরী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

আবুল ফজল আল্লামী

মূল ফারসি থেকে ইংরেজি অনুবাদ

এইচ ব্লকম্যান

ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ

আহমদ ফজলুর রহমান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

আইন-ই-আকবরী

আবুল ফজল আল্লামী

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : কার্তিক ১৪২৫/অক্টোবর ২০১৮

বাএ ৫৭৫২

প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৪০৯/এপ্রিল ২০০৩। পাণ্ডুলিপি ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি। প্রথম পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৫/সেপ্টেম্বর ২০০৮। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪২২/নভেম্বর ২০১৫। তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ। মুদ্রণ সংখ্যা ২২৫০ কপি। প্রকাশক : ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক ড. আমিনুর রহমান সুলতান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা। প্রকাশনা তত্ত্বাবধান : ইমরুল ইউসুফ, পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ। প্রচ্ছদ মামুন কায়সার। মূল্য : ১৮০.০০ টাকা।

AIN-I-AKBARI by Abul Fazal Allami. Translated into English by H Block Mann and rendered into Bangla from English version by Ahmad Fazlur Rahman. Published by Dr. Jalal Ahmed, Director (in-charge), Sales, Marketing and Reprint Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. Third Reprint Reprint Sub-Division, October 2018. Price : Taka 180.00 Only, US $ 20.00

ISBN 984-07-5777-6

প্রসঙ্গ-কথা

মোগল সম্রাটদের মধ্যে আকবর অনন্য। তাঁর পুরোনাম জালাল উদদিন মহাম্মদ আকবর (১৫৪২-১৬০৫)। আবুল ফজল ছিলেন তাঁর মন্ত্রী এবং ইতিহাস রচয়িতা। আবুল ফজল আকবরের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন (১৫৫১-১৬০২)। তিনি আকবরনামা লিখেছেন। আইন-ই আকবরী আবুল ফজল আল্লামীর আকবরনামা গ্রন্থের একটি খণ্ড। আকবরনামায় আছে শূর বংশের রাজাদের রাজত্বসংক্রান্ত বিষয় এবং সম্রাট বাবরের ইতিহাস ও আকবরের প্রায় ছেচল্লিশ বছরের রাজত্বসংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ। অপর খণ্ড অর্থাৎ আইন-ই আকবরীতে রয়েছে আকবরের রাজ্যশাসন সংক্রান্ত নানা রাজনীতি ও তথ্য। এই সব তথ্য মোগল ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয় মহামতি আকবরকে জানার জন্য এসব উপকরণ অত্যন্ত সহায়ক। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ মোগল ইতিহাস জানার জন্য যেখানে বর্ণনা করেছেন শাসন-শোষণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি ঘটনার, আবুল ফজল আল্লামী তা করেননি। তিনি ছিলেন সম্রাট আকবরের ঘনিষ্ঠজন। সম্রাটের দরবারে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থেকে সম্রাটকে যেমনটি দেখেছেন ঠিক তেমনটি সংযত ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এই রচনারীতিই গ্রন্থটিকে মুসলিম ইতিহাস গ্রন্থমালার সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মূল গ্রন্থটি ফারসী ভাষায় লিখিত। ইংরেজী অনুবাদ করেন এইচ ব্লকম্যান। ইংরেজী গ্রন্থটির নির্বাচিত অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছেন আহমদ ফজলুর রহমান। তিনি কাজটি করেছেন প্রায় তিন দশক আগে। নানা কারণে গ্রন্থটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে। অনুবাদক লোকান্তরিত হওয়ায় ও সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানের কারণে অনুবাদের মান উন্নয়ন সম্ভবপর হয়নি। তবে ঐতিহাসিক তথ্যের গুরুত্ব তেমন কমেনি। সেই প্রয়োজন থেকেই বাংলা একাডেমী গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়েছে। মুদ্রণ প্রমাদ সর্বাংশে পরিহার করা সম্ভব হয়নি।

মনসুর মুসা
মহাপরিচালক

সূচিপত্র

প্রথম ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা

আইন-ই আকবরী শেখ আবুল ফজল প্রণীত আকবরনামার তৃতীয় খণ্ড। মুসলিম ইতিহাস গ্রন্থমালার মধ্যে সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ এটি। এই বিশাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে রয়েছে তইমুর বংশের বৃত্তান্ত, বাবরের, শূর বংশের রাজাদের ও অন্যান্যদের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ডে মোগল বাদশাহ আকবরের প্রায় ছয়াল্লিশ বৎসরের রাজত্বের বিস্তারিত ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। শেষ খণ্ডটি হচ্ছে আইন-ই আকবরী। এতে রয়েছে আকবরের রাজত্বসংক্রান্ত তথ্যসমূহ।

এইসব তথ্য একান্তভাবেই ইতিহাসগত। তবু সেই কালকে যথার্থভাবে বোঝার পক্ষে তা দরকারী। এতে এমন সব বৃত্তান্ত ও জ্ঞাতব্যাদি রয়েছে যার জন্য এ কালে আমাদের বিভিন্ন শাসনরিপোর্ট, পরিসংখ্যান সংগ্রহ বা গেজেটিয়ারের শরণাপন্ন হতে হয়। এখানে রয়েছে আকবরের আইন (অর্থাৎ শাসনপ্রণালি)। বস্তুতপক্ষে, ১৫৯০ সালে তাঁর সরকার যেমন ছিল, এটি তাঁর প্রশাসনরিপোর্ট ও পরিসংখ্যান বিবরণী। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত। এর পাঁচটি ভাগের প্রথমটিতে রয়েছে এইসব বিষয়ের বর্ণনা। সম্রাট আকবর নিজে, তাঁর সংসার ও দরবার। সম্রাট আকবর এখানে প্রত্যেকটি বিভাগের আত্মা যিনি তাঁর বিভিন্ন কর্তব্য পালনের উপর এমনভাবে নজর রাখেন যেন সেটি তাঁর ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গ এবং যিনি একটি সুশৃঙ্খল সমগ্রতা গড়ে তোলার জন্য সরকারি ক্রিয়াকর্মের খুঁটিনাটিতে প্রবেশ করেন। অতি উচ্চে বিচিত্র আলোকমণ্ডিত বাদশাহ হিসাবে তিনি প্রকাশমান। জনসাধারণের সকল পার্থিব ও পরমার্থিক বিষয়ের পরিচালকরূপে তাঁর ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বলরূপে সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর চরিত্রে ও মেজাজে প্রজাকুল এমন ধৈর্য ও শান্তির সাক্ষাৎ পায় যা কোনো বিধিবিধানই দিতে পারে না এবং একটি নতুন প্রাগ্রসর ধর্মবিশ্বাসের প্রণেতারূপে তার থেকে চিরতরে অসহিষ্ণুতার মালিণ্য দূর হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে রাজকীয় কর্মচারী বাহিনী, সামরিক চাকুরি এবং ভৃত্যদের কথা। এছাড়া সাহিত্যিক ও সাংগীতিক প্রতিভা যা সম্রাটের উৎসাহ লাভ করেছিল এবং পক্ষান্তরে সরকারের উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করেছিল।

তৃতীয় ভাগে স্থান পেয়েছে সামরিক ও প্রশাসনিক বিভাগসমূহের নিয়মকানুন। সহজ ও বাস্তবসম্মতভাবে ভূমি জরিপ, ভূমিকর ও খাজনার খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ ভাগে রয়েছে জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ কৃষিজীবীদের সামাজিক অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম। এইসব কৃষিজীবীর প্রকৃত উন্নতিতেই সম্রাট তাঁর রাজত্বের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেখতে পেয়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন বিদেশী অভিযানকারী, গণ্যমান্য পরিব্রাজক এবং মুসলিম

ওলী, দরবেশ ও ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে তাঁরা যেসব ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত—এই সবের বিবরণ সংবলিত কতকগুলি অধ্যায়ও এই ভাগে রয়েছে।

পঞ্চম ভাগে সংকলিত হয়েছে সম্রাট কথিত নীতিবাক্যসমূহ, সরস উক্তি, মন্তব্য এবং বিভিন্ন জ্ঞানবান রায়। শিষ্য সে ভাবে গুরু বচন চয়ন করেন, আবুল ফজল সেইভাবে এইসব বচন চয়ন করেছেন।

অতএব, আইনে আমরা পাই বিভিন্ন বিভাগে আকবরের সরকারের যে রূপ প্রতিফলিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন পদাধিকারীর সঙ্গে সরকারের যে সম্পর্ক ছিল তার চিত্র এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রজাকুলের অন্তর্গত মিশ্রিত জাতিসমূহের চিত্র। বেশিরভাগ মুসলিম ইতিহাসেই আমরা সীমাহীন যুদ্ধবিগ্রহ ও বিভিন্ন রাজবংশের পতনোত্থানের কাহিনী শুনি এবং একটি জনগোষ্ঠীর নিছক অস্তিত্বের কথাই শুধু আমাদের মনে করিয়ে দেয়া হয় এবং লেখকেরা দুর্ভিক্ষ ও অনুরূপ দুর্যোগাদির পরোক্ষ উল্লেখ মাত্র করেন, তখন এখানে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন শাসিত শ্রেণীগুলোকে যাঁরা জীবন্ত মানুষ হয়ে আমাদের চোখের সামনে ঘোরাফেরা করে এবং সেই কালের বৃহৎ সব প্রশ্ন, যেমন যে সব সত্যে তখন বিশ্বাস করা হত, যে সব নীতি অনুসৃত হত, যে সব অসম্ভবের পেছনে ছোটা হত, যে সব ধ্যান-ধারণা তখন বিরাজ করছিল এবং যেসব সাফল্য অর্জিত হয়েছিল, সে সবই আমাদের চোখের সামনে বাস্তবসম্মত এবং উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এই কারণেই ভারতের মুসলিম ইতিহাসসমূহের অন্যান্য উৎসের প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার অনেক আগেই এবং সেইসব উৎসে সন্নিবিষ্ট বিষয়সমূহের রীতিসম্মত পরীক্ষার অনেক আগেই আইন-ই-আকবরী থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছিল। ১৭৭৬ সালে Le Pire Tieffentaller তাঁর *Description géographique de l'Indostan* গ্রন্থে আইনের তৃতীয় ভাগের খতিয়ান থেকে দীর্ঘ সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রধান সেরেশতাদার গ্র্যান্ট তাঁর ভারতীয় অর্থনৈতিক বিবরণীতে এই খতিয়ান বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন। ১৭৮৩ সালের মতো সুদূর অতীতে বিরাট প্রাচ্য পণ্ডিত ফ্রানসিস গ্ল্যাডউইন তাঁর "আইন-ই আকবরী" ওয়ারেন হেস্‌টিংস্‌কে উৎসর্গ করেন এবং ১৮০০ সালে লণ্ডনে তাঁর মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। গ্ল্যাডউইন তাঁর অনুবাদে প্রথমভাগের বেশি অংশ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অর্ধেকের বেশি ও চতুর্থ ভাগের প্রায় সিকি অংশ প্রদান করেছেন। একালে অবশ্য তাঁর অনূদিত পর্বের কোনো অংশে যথার্থতার অভাব আবিষ্কৃত হয়েছে সন্দেহ নেই, তার প্রধান কারণ, তিনি পাণ্ডুলিপি থেকে অনুবাদ করেছিলেন এবং পাণ্ডুলিপি থেকে অনুবাদ করা সব দিক থেকেই দুরূহ কাজ—তথাপি তাঁর অনুবাদ সব সময় ন্যায্যত উচ্চ আসন অধিকার করে এসেছে এবং নিশ্চিতভাবে একথা বলা যায় যে গত সত্তর বছরে তাঁর অনুবাদের মতো আর কোনো গ্রন্থ থেকে এত বেশি উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয় নি। এমনকি দেশীয় লেখকদের মতে আইনের রচনারীতি বা স্টাইল "সাধারণ পাঠকদের পক্ষে বিনা কষ্টে বোধগম্য নয়"। এ কথা যখন স্মরণ করি তখনি আমাদের কাছে বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অবিন্যস্ত পাণ্ডুলিপি থেকে আইন অনুবাদের কাজটি কত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু গ্রন্থ হিসাবে আইনের এত মূল্যমান হওয়ার কারণ যে শুধু তাতে বিধৃত বিভিন্ন বিস্তৃত তথ্যাবলী তা নয়, গ্রন্থকারের নিজের বিশ্বাসযোগ্যতাও এর কারণ। উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে ইচ্ছামতো যে কোনো দলিল দেখার ক্ষমতা তাঁর ছিল। রাজকার্যে তিনি দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগে তিনি প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাছাড়া, তাঁর ছিল অসাধারণ প্রকাশ ক্ষমতা। স্পষ্টতই এই বিষয়গুলি তাঁকে আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরীর মতো গ্রন্থ প্রণয়নের যোগ্যতা দান করেছিল। সত্য-প্রীতি ও তথ্যের যথার্থতা তাঁর গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় জাজ্বল্যমান। এই গ্রন্থ তিনি মহান সম্রাটের স্মৃতিরূপে এবং অনুসন্ধিৎসু চিত্তের পথনির্দেশক রূপে ভাবীকালের জন্য রেখে যেতে চেয়েছিলেন। রাজসিংহাসনের স্থায়ীত্বই জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা, তাঁর সহনশীলতার নীতি, মানবাধিকার সম্পর্কে তাঁর মহৎ আবেগসমূহ, ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে একান্ত অনীহা এবং প্রবল শত্রুর প্রতিও অসদিচ্ছার মনোভাবের অভাব—এই সব থেকে স্পষ্টরূপে বোঝা যায়, তাঁর বিরাট হৃদয়কে তাঁর দূরদৃষ্টি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান আরো প্রসারিত করে তুলেছিল। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা অনেক সময় আবুল ফজলের বিরুদ্ধে তোষামোদের এবং এমনকি তাঁর প্রভুর সুনামের হানিকর বিভিন্ন ঘটনা গোপন করার অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু সতর্কভাবে আকবরনামা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই সব অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। আমরা যদি তাঁর রচনাসমূহের সঙ্গে প্রাচ্যের অন্যান্য ঐতিহাসিক রচনার তুলনা করি, আমরা দেখব, তিনি যখন প্রশংসা করেন, তা করেন অন্য যে কোনো ভারতীয় ঐতিহাসিক বা কবির চেয়ে অত্যন্ত কম মাত্রায় কিন্তু অনেক বেশি শোভন ও মর্যাদার সঙ্গে। কোনো দেশীয় লেখক আজ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে তোষামোদের অভিযোগ আনেন নি। ন্যায়শাস্ত্রসংক্রান্ত সকল প্রাচ্যদেশীয় রচনাই রাজার মতের প্রতি শর্তহীন সম্মতি প্রদান করেছে—তা অভ্রান্তই হোক বা ভ্রান্ত হোক—এবং সেটাকে মানুষের কর্তব্য বলেই মনে করা হয়েছে। তাছাড়া প্রাচ্যের সমগ্র কাব্যচর্চাই হচ্ছে নির্জলা জাত-তোষামোদ, যার প্যাশে আধুনিক তোষামোদ অতি তুচ্ছ বস্তু। এই কথাটি যদি আমরা মনে রাখি তাহলে আমরা আবুল ফজলকে মাফ করতে পারব, কারণ তিনি যখন একজন সত্যিকার বীরের সাক্ষাৎ পান শুধু তখনই তাঁর প্রশংসা করেন।

এই অনুবাদের বিভিন্ন অংশ প্রকাশ করতে, আমি প্রথমে যেমন আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লেগে গেছে। যে ফারসি পাঠ থেকে বর্তমান অনুবাদ করা হয়েছে, একই সঙ্গে আমার সেই ফারসি পাঠের প্রকাশনা, অসুবিধাজনক পাণ্ডুলিপি, অনুবাদে বিভিন্ন মুসলিম ঐতিহাসিক ও সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে টীকাসমূহের সংযোজন—এইসব ব্যাপারের জন্য অনুবাদের কাজ অবধারিতভাবেই গতি লাভ করতে পারে নি।

আইনের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি ও আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন অথ্যাদি আমার হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য এবং উক্ত পাঠের সম্পাদনার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করার জন্য আমি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের ভাষাতত্ত্ব কমিটির কাউন্সিলের কাছে গভীরভাবে ঋণী। এই কাজের জন্য ভারত সরকার অত্যন্ত বদান্যতার সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন।

জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সুপারিনটেনডেন্ট ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি ড. টমাস ওলড্‌হ্যামের কাছে আমি এই কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি। কর্নেল এইচ য়ুল্‌ সি বি এবং ডাভ্‌টন কলেজের এইচ রবার্টস্‌ এস্কোয়ারের কাছে দরকারী নির্দেশাদি ও সংশোধনীর জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি প্রথম খণ্ডের সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত টীকা ও দুটি নির্ঘণ্ট (একটি ব্যক্তি ও বস্তুর এবং অন্যটি ভৌগোলিক নামসমূহের) যুক্ত করা দরকার বলে মনে করেছি। সমগ্র কাজটি সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে এ কাজ করেছি। এইভাবে আমি কতকগুলো ভুল ও বিভিন্ন নামের বানানের অসামঞ্জস্য সংশোধনের ও অন্যান্য অভাব মোচনের সুযোগ লাভ করেছি। যতই চেষ্টা করি না কেন ভুলত্রুটি থেকে যাবে।

কলকাতা মাদ্রাসা **এইচ ব্লকম্যান**
২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩

ব্লকম্যানকৃত অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণ সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়ার আছে। ব্লকম্যানের মূল অনুবাদ কিছু কাল থেকে মুদ্রিত নেই। এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল আমাকে পুনর্মুদ্রণের প্রস্তুতির কাজ হাতে নিতে অনুরোধ করেন। এটি কী পরিমাণ পরিশ্রমের কাজ হতে পারে তা না বুঝেই আমি লঘুচিত্তে কাজটি গ্রহণ করি। ব্লকম্যানের অনুবাদ ও টীকায় রয়েছে অশেষ বিশ্লেষণ ও ব্যাপক পাণ্ডিত্য। যদিও ক্বচিৎ তাঁর সংশোধনের দরকার হয়েছে, তবু প্রায়শঃই তার যথার্থতা যাচাইয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অবশ্য বর্তমান সংস্করণটি প্রধানত পুনর্মুদ্রণ মাত্র। এই পুনর্মুদ্রিত সংস্করণটিও ব্লকম্যানের পাণ্ডিত্য ও বিরাটত্বের প্রমাণ কম বহন করবে না। অবশ্য প্রতিবর্ণীকরণের কাজ আরো আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণে করা হয়েছে এবং কিছু অতিরিক্ত টীকা [তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে] যুক্ত হয়েছে। B-চিহ্নিত টীকা ব্লকম্যানের নিজের পাণ্ডুলিপির টীকা—আমার কাছে তাঁর যে মুদ্রিত গ্রন্থটি রয়েছে এইসব টীকা তা থেকে গৃহীত। তাঁর সব টীকা আমি বর্তমান সংস্করণে সামিল করি নি, কারণ অনেকগুলিরই আমি পাঠোদ্ধার করতে পারি নি। P-চিহ্নিত টীকাগুলি আমার নিজের।

ফেল্‌স্‌টেড ব্যারি,
ফেল্‌স্‌টেড, এসেক্‌স্
১৯২৭

ডি.সি.পি.

শেখ আবুল ফজল আল্লামীর জীবনী

সম্রাট আকবরের মন্ত্রী ও বন্ধু শেখ আবুল ফজল ৯৫৮ হিজরীর ৬ই মহরম[১] ইসলাম শাহের রাজত্বকালে আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। দেখা যায়, তাঁর পরিবার শেখ মুসা থেকে উদ্ভূত। শেখ মুসা আবুল ফজলের পঞ্চম পূর্বপুরুষ। তিনি নবম শতাব্দীতে ফিলিস্তানের (সিন্ধু) রেল নামক স্থানে বাস করতেন। এই মনোরম গ্রামটি শেখ মুসার সন্তান–সন্ততিরা দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বাস করার পর পরিবারের তৎকালীন কর্তা শেখ খিজির অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সন্ধানে হৃদয়ের আকুল তৃষ্ণা নিয়ে হিন্দুস্থানে হিজরত করেন। সেখানে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করে আল্লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন। অতঃপর তিনি হেজাজে গিয়ে যে আরব উপজাতির থেকে তাঁর বংশের উদ্ভব সেই উপজাতির সঙ্গে অল্পকাল বসবাস করে পুনরায় তিনি ভারতে আগমন করেন এবং আজমীরের উত্তর–পশ্চিমে নাগোর নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসতি করে পীর দরবেশদের সাহচর্যে কালাতিপাত করতে থাকেন। সেখানে তিনি বোখারার মীর সৈয়দ য়াহ্য়ার বন্ধুত্ব লাভ করেন।

পূর্ব পুরুষদের আদি বাসভূমির স্মরণচিহ্ন রূপেই এ পরিবারের সকলে শেখ উপাধি ব্যবহার করতেন। এর অল্পকাল পরে ৯১১ হিজরীতে আবুল ফজলের পিতা শেখ মোবারকের জন্ম হয়। মোবারক শেখ খিজিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না ; তাঁর জন্মের পূর্বে আরও কয়েকটি সন্তান হয়ে মারা গিয়েছিল। এরপর এই পুত্র জন্মালে খিজির আনন্দিত মনে তাঁর নাম দেন মোবারক অর্থাৎ আশীর্বাদপ্রাপ্ত। ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীগণ মনে করেন যে মৃত সন্তানেরা পরবর্তী সন্তানদের আশীর্বাদ করে এবং আল্লার নিকট তাদের দীর্ঘজীবন কামনা করে—শেখ খিজির এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই নিশ্চয় পুত্রের এরূপ নামকরণ করেছিলেন।

শেখ মোবারক মাত্র চার বৎসর বয়সেই তাঁর অদ্ভুত ধীশক্তির পরিচয় দেন এবং শেখ আতন নামে এক ব্যক্তির সাহচর্যে চরিত্র গঠন ও জ্ঞান লাভ করেন। শেখ আতন জাতিতে তুর্কি ছিলেন এবং সিকান্দর লোদীর শাসনকালে নাগোরে আসেন। সেখানে তিনি শেখ সালারের অধীনে চাকরি করতেন। কথিত আছে যে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১২০ বৎসর। শেখ খিজির অবশেষে নাগোরে স্থানীয়ভাবে বসবাস করা স্থির করে তাঁর এই নতুন বাসস্থানে আরও কতিপয় আত্মীয়–স্বজনকে নিয়ে আসার জন্যে পুনরায় শিবিস্তানে গমন করেন। ভ্রমণকালে সহসা তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলে নাগোরে তাঁর পরিবার ভয়ানক

---

১. ১৪ জানুয়ারি ১৫৫১

দুর্বিপাকে পড়ে। এই সময়েই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং মরুভূমিতে পরিবেষ্টিত এই উষর ভূমিতে বহুলোক প্রাণ হারায় এবং এই পরিবারের সমস্ত লোকের মধ্যে শুধু মোবারক ও তাঁর মায়ের প্রাণ রক্ষা পায়।

বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে মোবারকের জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উত্তরকালে যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার ভিত্তি গঠিত হতে থাকে। অচিরে তাঁর মনে শিক্ষা সমাপ্ত করার ও অন্যান্য স্থানের খ্যাতনামা শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎ করার প্রবল বাসনা জাগে কিন্তু মায়ের প্রতি ভালবাসা তাঁকে সে স্থানে ত্যাগে বিরত করে এবং তিনি তাঁর জন্মস্থানে থেকেই বিখ্যাত দরবেশ খাজা আহরারের[২] উপদেশাবলী দ্বারা চালিত হয়ে বিদ্যাশিক্ষা করতে থাকেন। যা হোক, তাঁর মা মারা গেলে এবং প্রায় সেই সময়েই মালদেও-এর হাঙ্গামা সংঘটিত হলে মোবারক তাঁর মনের বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ পান এবং তিনি গুজরাটের আহমেদাবাদে গমন করেন। তিনি হয় আহমেদাবাদ শহরের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে অথবা সেখানে অবস্থিত তার দেশবাসী খাও'র আহমদের[৩] দরগাহের আকর্ষণে সেখানে গিয়েছিলেন। আহমেদাবাদে তিনি পারস্যের মাজারুম থেকে আগত খ্যাতনামা ধর্মপ্রচারক শেখ আবুল ফজলের সাথে পরিচিত হন এবং তাঁকে তিনি দ্বিতীয় পিতা লাভ করেন। এখানে তিনি চাট্টার শেখ ওমর এবং শেখ ইউসুফ প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসেন। সেখানে কয়েক বৎসর থাকার পর তিনি হিন্দুস্থানে ফিরে আসেন এবং ৯৫০ হিজরীর মহরম মাসের ৬ তারিখে আগ্রার বিপরীত দিকে যমুনা নদীর বাম তীরে সম্রাট বাবরের নির্মিত চারবাগ ভিলার[৪] নিকটে ইমজুর (শিরাজ) দরবেশ মীর রফিউদ্দিন সাকাভীর কাছাকাছি স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। আগে তিনি এই দরবেশের শিষ্যদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। এখানেই মোবারকের বড় দুই পুত্র শেখ আবুল ফয়েজ[৫] ও তার চার বৎসর পর শেখ আবুল ফজল জন্মগ্রহণ করেন। মোবারকের বয়স তখন পঞ্চাশ। তিনি স্থির করেন যে সাম্রাজ্যের রাজধানী আগ্রাতেই থাকবেন। তারপর সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রথম বৎসর যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং ৯৬৩ হিজরীতে আগ্রায় যে ভয়াবহ প্লেগ রোগ দেখা দেয়, যার ফলে বহু লোক আগ্রা ত্যাগ করে, তার কোনোটাই শেখ মোবারককে আগ্রা ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে প্ররোচিত করতে পারে নি।

মোবারকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে বহুলোক তাঁর শিষ্য হন এবং তিনি তাঁর ছেলেদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা তাঁর গভীর জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়। আবুল ফজল তাঁর লেখার বহু স্থানে তাঁর পিতার প্রতি যে সন্তানোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করেছেন এবং বাদাওনীর মতো বিরুদ্ধভাবাপন্ন লেখকেরা তাঁর সম্বন্ধে যা লিখে গিয়েছেন, তাতে আর কোনো সন্দেহ

২ ২৯ শে রবিউল ১৮৯৫ হি; ২০ শে ফেব্রুয়ারি ১৪৯০ খ্রি. সমরকন্দে ইন্তেকাল করেন।

৩. খাউর আহমদ আহমেদাবাদের নিকটবর্তী সারকিন নামক স্থানে ৮৪৯ হি. (১৪৪৫ খ্রি.) পরলোকগমন করেন।

৪. পরবর্তীকালে হাশ্‌ত বেহেশত অথবা নুরাফশান বাগ নামে পরিচিত। বর্তমান নাম রামবাগ।

৫. ৯৫৪ হি. ১৫৪৭ খ্রি. জন্ম।

থাকে না আবুল ফয়েজ ও আবুল ফজলের মধ্যে যে বিশ্বজনীন উদার মনোভাব প্রকারান্তরে কিছুটা ইসলামবিরুদ্ধ মনোভাব গড়ে ওঠে মোবারকের ব্যাপক শিক্ষাই তার ভিত্তি গঠন করে। এরই ফলে মুসলমান লেখকগণ এই উভয় ভ্রাতাকে কখনও নিরীশ্বরবাদী, কখনও হিন্দু, কখনও সূর্য-উপাসক বলে অভিহিত করেছেন এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি সম্রাট আকবরের বীতশ্রদ্ধার জন্যেও তাঁদেরই দায়ী করেছেন।

৯৬৩ হিজরীর কয়েক বৎসর পূর্বে আফগান শাসনকালে শেখ মোবারক নিজের পার্থিব স্বার্থের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে এক ধর্মীয় আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে ফেলেন। এই আন্দোলন ৯০০ হিজরীতে শুরু হয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে দশম শতাব্দী পর্যন্ত চলে। ইসলাম প্রচারের এক সহস্র বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যেই এই আন্দোলনের সূচনা করা হয়েছিল। একটা প্রচলিত ধারণা ছিল এই যে ইসলামের এক সহস্র বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বের বৎসরগুলোতে ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং নৈতিক অবনতি ঘটবে এবং এক সহস্র বৎসর যখন পূর্ণ হবে তখন অবনতি চরম পর্যায়ে পৌঁছুবে ঠিক সে সময়েই একজন ইমাম মাহদী[৬] বা যুগের প্রভুর আর্বিভাব হবে যিনি ইসলামকে পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যিশু খ্রিষ্টেরও পুনরাবির্ভাব হবে এবং তারই মাধ্যমে সব লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এবং তারপরই আসবে শেষ বিচারের দিন। প্রতিশ্রুত এই লোক সম্বন্ধ ফারসিতে বার ইমামের জীবন সম্বন্ধীয় রওজাতুল আইম্মা গ্রন্থে নিম্নরূপ লেখা আছে :

মুসলিম, আবু দাউদ, নিসাঈ বায়হাকী ও অন্যান্যদের মধ্যে যাঁরা হযরতের বাণী (হাদিস) সংগ্রহ করেছেন তাঁরা বলেন যে হজরত মুহম্মদ একদা বলেছিলেন, "আমার পরিবার থেকেই মুহম্মদ মাহদীর উদ্ভব হবে এবং সে ফাতিমার (হযরতের কন্যা ও আলীর পত্নী) বংশধর হবে।"

আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ্ বলেন যে, হযরত আর এক সময় বলেছিলেন যে,

"যখন মাত্র একদিন সময় থাকবে তখন আল্লাহ আমার বংশধরদের মধ্যে থেকে এমন একজনকে নির্বাচন করবেন যিনি পৃথিবীতে পূর্ণ ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তার পূর্বের অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলার অবসান হবে।" এছাড়া আবার বলেছেন,

"যতদিন না পৃথিবীর রাজা আবির্ভূত হবেন, এবং তিনি আমার পরিবারভুক্তই হবেন, ততদিন কেয়ামত হবে না এবং তাঁর নাম আমারই নাম হবে।"

এছাড়া আহমদ ও অন্যান্য হাদিস সংগ্রাহকদেরও মতে হযরত একবার বলেছিলেন, "মুহম্মদ মাহদী আমার বংশোদ্ভুত, আট ও নয় বৎসর।" সেই অনুসারে, মাহদীর আবির্ভাব লোকে বিশ্বাস করে। কিন্তু একদল মুসলমান আছেন যাঁরা বলেন যে ইমাম মাহদী পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং বর্তমানে জীবিত আছেন। তাঁর বংশগত নাম আবুল কাসিম এবং তাঁর গুণবাচক বিশেষণ হল, "নির্বাচিত, প্রতিষ্ঠাকারী, মাহদী, প্রত্যাশিত, যুগপ্রবর্তক।" এ

---

৬. সাহবে জামান। ইনি দ্বাদশ ইমাম। প্রথম এগার জন পয়গম্বরের পরবর্তীকালের ইমাম। মাহদীর অর্থ পরিচালিত। হাদীর অর্থ দিশারী বা পরিচালক।

দলের মতে তিনি ২৫৮ হিজরীর ২৩ শে রমজান সুররাহমান রাআ তে (বাগদাদের সন্নিকটে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৬৫ হিজরীতে তিনি সারদাবাতে (গ্রীষ্মবাস) গমন করেন। সেখানে তিনি তাঁর বাসস্থান থেকেই অন্তর্হিত হন। শাওয়াহীদ নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে তাঁর যখন জন্ম হয় তখন তাঁর ডান বাহুতে লিখিত ছিল,"

"বল. সত্যের আবির্ভাব হয়েছে এবং অসত্য দূরীভূত হয়েছে, অসত্য অবশ্যই দ্রুত অপসারিত হচ্ছে।" (কোরআন, ১৭ : ৮৩)।

আরও কথিত আছে যে তিনি ভূমিষ্ঠ হবার পরই হাঁটু গেড়ে বসে আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলেন, "আল্লাহ প্রশংসনীয় ও সর্বশক্তিমান।" অপর এক ব্যক্তি ইমাম হাসান আসকারীর (একাদশ ইমাম) সাথে তাঁর এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখে গিয়েছেন। তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে প্রেরিত পুরুষের পুত্র, আপনার পরে কে খলিফা ও ইমাম হবেন?" আসকারী তখন তাঁর ঘরে চলে গেলেন এবং খানিকক্ষণ পরে একটা শিশুকে কাঁধে করে নিয়ে এলেন। শিশুটির চেহারা পূর্ণ চন্দ্রের মতো এবং সম্ভবত বয়স তিন বৎসর হবে। সে লোকটিকে তিনি বললেন", তুমি যদি আল্লাহর প্রিয়পাত্র না হতে তা হলে তিনি তোমাকে এ শিশু দেখাতেন না, নবীর নামই এর নাম এবং এর পদবী তারই মতো।' যে সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে মাহদী এখনও জীবিত আছেন তাঁরা বলেন যে তিনি সুদূর পশ্চিমের শহরসমূহ শাসন করছেন এবং তাঁর সন্তানাদি আছে। একমাত্র আল্লাই জানেন কোনটা সত্য।

মাহদী অর্থাৎ ধর্ম পুনস্থাপনকারী সম্বন্ধীয় হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী বলে কথিত কথাগুলো ইসলামের এক হাজার বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগের শতাব্দীতে বিশেষ জোরদার হয়ে ওঠে। সর্বত্রই আলেমদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা হতে হতে ভারতে[৭] জইনপুরের মীর সৈয়দ খানের পুত্র মীর সৈয়দ মুহাম্মদের প্রচারকার্যের ফলে তা এক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি হযরতের বংশধর ছিলেন এবং তাঁর নামও হযরতের নামানুযায়ী ছিল। জইনপুরের পতন তাঁর কাছে শেষ দিনের সূচনার লক্ষণ বলেই মনে হয়। তাঁর জীবনে বহু অসম্ভব ঘটনা ঘটে যেগুলোকে অলৌকিক বলে মনে হয় এবং এক স্বর্গীয় বাণী তাঁর কানে ধ্বনিত হয় ; "আন্‌তা মাহদা।" অর্থাৎ "তুমিই মাহদী।" কিছু কিছু লোক যদিও বলেন যে মীর সৈয়দ মুহম্মদের নিজেকে মাহদী বলে ঘোষণা করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি যে নিজেকে সে সময়ে যুগপ্রবর্তক মনে করতেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই। প্রধানত তাঁর বাগ্মিতার বিরাট ক্ষমতার জোরে তাঁর বহু শিষ্য জুটল, কিন্তু শত্রুদের চাপে পড়ে তিনি গুজরাট গমন করলেন

৭. বদায়ুনী তাঁর নাজাতুররশীদ নামক গ্রন্থ বাদাখশানে এ আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। বাদাখশান থেকে এ আন্দোলন পারশ্যে এবং ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। আবু ইসহাক খাতলানির শিষ্য সৈয়দ মোহাম্মদ নূরবখশ বাদাখশানে এ আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর অনুবর্তীদের সংখ্যা এবং উৎপাত এত বৃদ্ধি পায় যে তাঁদের দমন করার জন্য সেনাবাহিনী আহ্বান করতে হয়। নূরবখশ পরাজিত হয়ে ইরাকের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। সেখানে তাঁর ৩০,০০০ হাজার শিষ্য হয়। গবর্নরদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হতে থাকে : কিন্তু তিনি সকলকেই অমান্য করে চলেন। নূরবখশ যে ঘোষণাপত্রটি বিভিন্ন দরবেশদের নিকট প্রেরণ করেন তার একটি নকল বদায়ুনী সংরক্ষণ করেন। তাঁর এক শিষ্যের নাম শেখ মোহাম্মদ লাহিজী, যিনি পুলশানে রাজ গ্রন্থের টীকাকার।

এবং সেখানে প্রথম সুলতান মাহমুদ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। গুজরাট থেকে তিনি সুলতানের অনুরোধে মক্কায় হজ করতে যান। তাতে তাঁর শত্রুগণ অত্যন্ত খুশি হন। কিন্তু মক্কা থেকেও মনে হয় তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন। ফেরার পথে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর মতামত অনেকের বিরক্তি উৎপাদন করছে এবং তিনি তাঁর সহশিষ্যদের বললেন, "আল্লা আমার মন থেকে মাহদীর গুরুভার অপসারণ করেছেন। আমি যদি নিরাপদে ফিরতে পারি তা হলে আমি যা বলেছি সব প্রত্যাহার করব।" কিন্তু তিনি যখন বেলুচিস্তানের ফারাহ শহরে পৌঁছান সেখানে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন (৯১১ হিজরী ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দ)। শাহ ইসমাইল ও শাহ গহমাসপ তাঁর কবর ধ্বংস করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা সাধারণের তীর্থস্থানে পরিণত হয়। মাহদা আন্দোলন কিন্তু চলতে থাকে। তাঁর কতিপয় শিষ্য তিনি যে মাহদী ছিলেন এই বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং ঐতিহাসিক বদায়ুনী পর্যন্ত ফিন মাহদী মতবাদে বিশ্বাস করতেন। তাঁকে একজন বড় দরবেশ বলে আখ্যায়িত করেন। ভারতের অন্যান্য স্থানে আরও সব মাহদীর আর্বিভাব হয়। ৯৫৬ হিজরীতে (১৫৪৯ খ্রি.) আগ্রার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত বিয়ানাহ নামক স্থানে শেখ আলাই নামে এক ব্যক্তি মাহদী বলে জোর দাবি করেন। তিনি ছিলেন একজন বাঙালি মুসলমান। তাঁর পিতাকে সেখানে একজন জ্ঞানী দরবেশ বলে মনে করা হত। তিনি মক্কায় হজ করে এসে তাঁর ছোট ভাই নসরুল্লাহসহ (তিনি নিজেও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন) ৯৩৫ হিজরীতে বিয়ানমতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। অল্পদিনে তাঁরা সেখানে খুব গণ্যমান্য হয়ে উঠেন। শেখ আলাই অল্প বয়স থেকেই উকিলের মতো জ্ঞানবত্তা এবং দরবেশের মতো দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দেন এবং তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন। "কিন্তু ন্যায়ের চেয়ে ক্ষমতার মোহ তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠে।" ঈদের দিনে তিনি একজন প্রভাবশালী শেখকে তাঁর হাওদার ওপর থেকে লাথি মেরে ফেলে দিলেন এবং তাঁর ভাইদের ও প্রবীণ আত্মীয়দের সমর্থনের জোরে ঘোষণা করলেন যে একমাত্র তিনিই এ শহরে শেখ হবার উপযুক্ত। প্রায় সে সময়েই মিয়া আব্দুল্লাহ্ নামে একজন নিয়াজী আফগান এবং জইনপুরে মীর সৈয়দ মুহম্মদের শিষ্য মক্কা থেকে ফিরে বিয়ানাহ–এর নিকটে এক নিরিবিলি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি তাঁর গুরুর মতো খুব ভাল বক্তৃতা করতে পারতেন এবং পথে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কাঠুরিয়া ও ভিস্তিওয়ালদের মধ্য থেকে বহু শিষ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। শেখ আলাই নিজেও মিয়া আব্দুল্লাহর বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে পড়েন এবং তিনি প্রচারকার্য ও তাঁর স্থানীয় প্রভাবের মায়া ছেড়ে ফকির হয়ে যান এবং স্ত্রীকে বলেন হয় তার সাথে অজানার পথে ভেসে পড়তে, নতুবা তাঁর কাছ থেকে চলে যেতে। নিজের গ্রন্থাদিসহ সমস্ত সম্পত্তি তিনি নিয়াজীর হাবীব শিষ্যদের মধ্যে বিলি করে দেন এবং তাঁরা যে সংঘ গড়েছিলেন তাতে সামিল হয়ে যান। এই ভ্রাতৃসংঘ নিজেদের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তির সমষ্টিগত মালিকানা কায়েম করেছিল। তারা ভিক্ষালব্ধ আয় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। তারা কাজ করা ছেড়ে দিল কারণ কোরআনে আছে,' "মানুষ যেন ব্যবসা–বাণিজ্যের প্রলোভনে পড়ে আল্লার এবাদত না ভুলে যায়।" আসন্ন মাহদীর আর্বিভাবের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে তোলার উদ্দেশ্যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর ধর্মীয় সভা বসত। এই ভ্রাতৃসংঘ একত্রে নামাজ পড়ত এবং তারা যেখানেই যেত অস্ত্রশস্ত্রে পুরোপুরি সজ্জিত থাকত। অচিরেই তাঁরা নিজেদেরকে নাগরিক ক্রিয়াকর্মেও হস্তক্ষেপ করার মতো

ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করলেন এবং বাজারসমূহ পরিদর্শন করে জোর করে আইন নিষিদ্ধ জিনিসসমূহ অপসারণ করতে আরম্ভ করল ; বিচারকগণ তাদের বিরোধিতা করলে তাঁরা তাদেরকেও অগ্রাহ্য করতে লাগলেন এবং তারা তাদের সমর্থন করলে তাদের সাহায্য করতে লাগলেন। প্রতিদিন তাদের দলে লোক বাড়তে থাকে এবং ক্রমে বিয়ানাতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে পিতা তাঁদের সন্তানদের কাছ থেকে এবং স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়। শেখ আলাইর আগের পদমর্যাদা এবং তাঁর বর্তমানের পুরোপুরি মত পরিবর্তন তাঁকে দ্বিতীয় নেতার পদে উন্নীত করে। প্রকৃতপক্ষে অল্পকালের মধ্যেই তিনি আন্তরিকতায় এবং অনুচর সংগ্রহে মিয়া আবদুল্লাকে ছাড়িয়ে যান। ফলে মিয়া আবদুল্লা তার এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারণের জন্যে ছয়-সাত শত সশস্ত্র অনুচরসহ মক্কার দিকে রওনা করিয়ে দিলেন। আলাই তাঁর দলবলসহ প্রচার কার্য চালাতে চালাতে ও অনুচর সংগ্রহ করতে করতে বাসাওয়ার (Basawar) হয়ে খাবাসপুর (Khawaspur) পর্যন্ত গেলেন কিন্তু সেখানে কি এক সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ায় তাঁরা সবাই বিয়ানাতে ফিরে এলেন।

অবশেষে শেখ আলাইর খ্যাতি ইসলাম শাহের কানে গিয়ে পৌঁছুলে তিনি তাঁকে আগ্রায় ডেকে পাঠালেন। যদিও তিনি স্থির করে রেখেছিলেন যে বিপজ্জনক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর প্রাণদণ্ড দেবেন এবং তাঁর সামনে এসে শেখ আলাই যে কর্কশ ব্যবহার করলেন তাতে তিনি বিশেষভাবে আহতও হলেন, তবু আলাই দুনিয়ার অনিত্যতা ও জ্ঞানীদের ধর্মে কপটতা সম্বন্ধে এমন এক সারগর্ব উপস্থিত বক্তৃতা দিলেন যে তাতে মুগ্ধ হয়ে সুলতান শেখ আলাইর অনুচরদের রান্না করা খাদ্য পাঠিয়ে দিলেন। দরবারের আফগান আমীর ও সেনাপতিদের উপহাস উপেক্ষা করে আলাই আর এক বৈঠকে মাহদীর আগমন সংক্রান্ত বিতর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিদের হারিয়ে দিলেন এবং দিনের পর দিন ইসলাম শাহের কাছে সংবাদ আসতে থাকে এবং তাঁর একজন না একজন আমীর আলাইর সভায় গিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে সামিল হয়েছেন।

এই সময়ে শেখ মোবারকও আলাইর অনুচরভুক্ত হলেন এবং মাহদী সংক্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করলেন। তিনি ধর্মীয় কারণে, না রাজনৈতিক কারণে এ দলে যোগ দিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না, কারণ রাজদরবারের পণ্ডিত ব্যক্তিদের দলটিকে যার পুরোভাগে ছিলেন মাখদুমুল মূলক—ভেঙে দেয়াই ছিল এই দলের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এ দলে যোগ দিয়ে থাকুন না কেন, এর ফলে মাখদুমুল মূলক তাঁর ভয়ানক শত্রু হয়ে উঠেন, তাঁকে দেওয়া জায়গাজমি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেন, তাঁকে জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন, বিশ বৎসর ধরে তাঁর উপর নানারূপ অত্যাচার চালিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত মোবারকের ছেলেরা এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন।[৮]

---

৮. সুলতানপুরের আবদুল্লার উপাধি ছিল মাখদুমুল মূলক। পাঠক এর সম্বন্ধে জানতে চাইলে নির্ঘণ্ট দেখুন। খাজিনাতুল আসফিয়াতে লোহার পৃ. ৪৪৩, ৪৬৪) তাঁর সম্বন্ধে সুন্নী মতাবলম্বীদের নিম্নরূপ মতামত লিপিবদ্ধ আছে :
"সুলতানপুরের মৌলানা আবদুল্লাহ আনসারী ভারতের খ্যাতনামা পণ্ডিত ও দরবেশদের অন্যতম। ধর্ম বিষয়ে তিনি বিস্তি মতাবলম্বী। শেরশাহের সময় থেকে আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত তাঁর উপাধি ছিল

দরবারের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কিন্তু আলাইর সফলতায় বিচলিত হলেন না এবং মাখদুমুলের প্রতিপত্তি এত সঠিক ছিল যে তিনি অবশেষে রাজাকে বুঝিয়ে শেখকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। আলাই ও তাঁর অনুচরগণ সহজেই আদেশ মেনে নেন এবং দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। ইসলাম শাহের রাজ্যের সীমান্তে নর্মদার তীরে হানদিয়াতে যখন তাঁরা পৌঁছলেন তখন তাঁরা বাহার খান আজাম হুমায়ূনকে ও তাঁর সৈন্যদলের অর্ধেককে স্বীয় মতে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন। রাজা তাঁর এই শেষ সফলতার সংবাদ পেয়ে তাঁর পূর্ব আদেশ প্রত্যাহার করে শেখ আলাইকে পুনরায় দরবারে ডেকে পাঠান।

ঠিক এই সময়েই (৯৫৫) ইসলাম শাহ্ পাঞ্জাবে নিয়াজী আফগানদের বিদ্রোহ দমন করতে আগ্রা ত্যাগ করেন এবং তিনি যখন বিয়ানার নিকটবর্তী হন, মাখ্দুমুল মুল্ক মিয়া আবদুল্লাহ নিয়াজীর প্রতি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আবদুল্লাহ নিয়াজী শেখ আলাইর দক্ষিণে যাত্রার পর তিন চার শত সশস্ত্র অনুচর নিয়ে বিয়ানার পার্বত্য অঞ্চলে বিচরণ করছিলেন এবং তাঁর স্বগোত্রীয় লোকের উপর প্রচুর আধিপত্যের অধিকারী বলে খ্যাতি লাভ করেন, যার ফলে পাঞ্জাবের নিয়াজী বিদ্রোহীদের ওপরও তাঁর আধিপত্য আছে বলে প্রচারিত হয়। ইসলাম শাহ বিয়ানার শাসনকর্তাকে হুকুম দেন মিয়া আবদুল্লাহকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। বিয়ানার শাসনকর্তা নিজে মাহদী মতাবলম্বী ছিলেন এবং তিনি তাঁর ধর্মীয় গুরুকে অনুরোধ করেন যেন তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। কিন্তু মিয়া আবদুল্লাহ তা না করে অকুতোভয়ে সম্রাটের সামনে উপস্থিত হন এবং দরবারের আদব-কায়দা ভঙ্গ করে সম্রাটের এতই

মাখদুলুল মূল্ক। তিনি বিচক্ষণ আইনজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করতেন। তিনি ধর্মত্যাগীদের কঠোর সাজা দিতেন। আকবর যখন তাঁর নতুন ধর্মমত প্রচার করেন এবং মানুষকে তাঁর 'দীন-ইলাহী সূর্য উপাসনীয় দীক্ষিত করেন এক মানুষকে তাঁদের ধর্মমত পরিবর্তন করে "আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং আকবর তাঁর প্রতিনিধি" এইরূপ ধর্মমতে বিশ্বাসী হতে আদেশ দেন, মৌলানা আব্দুল্লাহ তখন তাঁর বিরোধিতা করেন। অবশেষে দরবার থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি এক মসজিদে আশ্রয় নেন; কিন্তু সম্রাট বলেন যে মসজিদটা তাঁরই সাম্রাজ্যভুক্ত, সুতরাং তিনি যেন অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নেন। তখন মাখদুমুল মক্কায় চলে যান। যখন পুনরায় ভারতরাষ্ট্রে আগমন করেন তখন আকবর তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন কাশফুল ঘুম্মাহ (Kashful ghummah), ইফ্ফাতুল্ আম্বিয়া (Iffatus Ambiyah) মিন হাজদ্দীন ইত্যাদি। তাঁকে হিজরী ১০০৬ সনে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

"তাঁর পুত্র হাজি আব্দুল করিম পিতার মৃত্যুর পর লাহোর গমন করেন এবং সেখানে ধর্মীয় পথপ্রদর্শক হন। তিনি ১০৪৫ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং লাহোরে জবউন্নিসা গ্রামের নিকটে ছোট মোজায় তাঁকে কবর দেয়া হয়। তাঁর পুত্রদের নাম শেখ ইয়াহীয়া, ইলাহ্নূর, আব্দুল হক এবং আলা হুজুর। শেখ ইয়াহিয়া পিতার ন্যায় অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারতেন।"

এই বিবরণীতে যে তারিখ দেয়া হয়েছে তা ভুল। কারণ মাখদুমুল্ মূল্ক ৯৯০ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং মাহদুয়ের সমর্থক ঐতিহাসিক বাদায়ুনী তাঁকে বিষ প্রয়োগ করার কথা উল্লেখ করেন নি। (বাদায়ুনী, ২য়, ৩১১) ফলে খাজিনবাকুশ আসাফিয়ার বক্তব্য অনায়াসে বাতিল করে দেয়া যায়। বাদায়ুনী আরও লিখেছেন যে, মাখদুসের ছেলেরা ছিলেন একেবারে অপদার্থ। মাখদুমুল মূল্কের লেখা বইগুলোর নামই ঠিকমত দেয়া হয়নি।

বিরাগভাজন হন যে ইসলাম শাহ আদেশ দেন যেন তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। সম্রাট ঘোড়ায় চড়ে একঘণ্টা ধরে তাঁর আদেশের কার্যকরী হওয়া পরিদর্শন করেন এবং মিয়া আবদুল্লাহ যখন আপাতদৃষ্টিতে নিষ্প্রাণ অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান তখন সে স্থান ত্যাগ করেন। কিন্তু অনেক কষ্টে তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে আনা হয়। তিনি এরপর বহুদিন আত্মগোপন করে থাকেন, সমস্ত মাহদী মতবাদ ত্যাগ করেন এবং অবশেষে ৯৯৩ হিজরীতে, সম্রাট আকবরের কাছ থেকে এক খণ্ড নিষ্কর জমি পান, কারণ তিনিও ছিলেন মাখদুমুল মূল্কের দ্বারা অত্যাচারিত। ৯০ বৎসরেরও অধিক বয়সে ১০০০ হিজরীতে সারাহন্দে তিনি মারা যান।[৯]

ইসলাম শাহ নিয়াজী বিদ্রোহ দমন করে আগ্রাতে ফিরে আসেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার পাঞ্জাবে যাবার প্রয়োজন হয় এবং সেখানেই শেখ আলাই সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হন। ইসলাম শাহ শেখকে দেখে নিম্নস্বরে তাঁকে বলেন, "আমার কানে কানে বলুন যে আপনি আপনার মত প্রত্যাহার করছেন, তাহলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।" কিন্তু শেখ আলাই তা করতে সম্মত হন না। এবং ইসলাম শাহ তাঁর ক্ষমতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে একজন ভৃত্যকে আদেশ দেন তাঁর সামনে শেখকে কয়েক ঘা চাবুক মারতে। সে সময় কয়েক বৎসর ধরে ক্রমাগত সারা ভারতবর্ষে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব চলছিল, শেখ আলাই সবে মাত্র তা থেকে সেরে উঠেছেন, এবং তাঁর গায়ে তখনও প্লেগের চিহ্ন ছিল। চাবুকের আঘাত একটা ক্ষত থেকে রক্ত পড়তে শুরু করে এবং শেখ আলাই অজ্ঞান হয়ে যান এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর দেহটা তখন হাতির পায়ের নিচে পিষে ফেলা হয় এবং আদেশ জারি করা হয় যেন কেউ তাঁর কবর না দেন। ঠিক সেই সময় এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। যার ফলে সম্রাটের শিবিরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং সম্রাটের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে কেয়ামত এসে গিয়েছে। ঝড় শেষ হলে দেখা যায় যে আলাইর দেহ গোলাপ ও অন্যান্য ফুলে ঢেকে রয়েছে। তখন তাঁর কবর দেবার হুকুম হয়। ৯৫৭ হিজরীতে (১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ) এই ঘটনা ঘটে। লোকে তখন অচিরেই ইসলাম শাহের ধ্বংস ও তাঁর বংশের অবসান হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকে।[১০]

এরপর মাখদুল-উল-মূলক আর কখনও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি।

---

৯. বাদায়ুনী সারহিন্দে তাঁর সাথে দেখা করেন এবং আবদুল্লাহর নিকট বাদায়ূনী জানতে পারেন যে মীর সৈয়দ মোহাম্মদ মৃত্যুর পূর্বে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। নানা কথার মধ্যে আব্দুল্লাহ এও বলেছিলেন যে ফারাহ্-তে মীরের মৃত্যুর পর সে শমরের এক খ্যাতনামা ব্যক্তি বালুচীদের জায়গা জমি দখল করে নিজেকে খ্রিষ্ট বলে ঘোষণা করে। তিনি আরও বলেন যে তিনি উচ্চ বংশের অন্তত তের জন লোকের কথা জানেন যাঁরা অনুরূপভাবে নিজেদের খ্রিষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন।

১০. যেভাবে শেখ আলাইর মৃত্যু হয় তা অনেকটা জালালুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে সিদি মওলার মৃত্যুর অনুরূপ।
পাঞ্জাবের যে স্থানে এ ঘটনা ঘটে তার নাম বান (বাদায়ুনী ১, ৪০৮),
বাদায়ুনী তাঁর যৌবনকাল বিয়ানার নিকটে বাসাওয়ারে কাটিয়েছিলেন, আর তা ছিল মাহদী আন্দোলনের কেন্দ্রে অবস্থিত, সম্ভবত এ জন্যেই সারাজীবন তিনি মাহদী মতবাদের অনুরক্ত ছিলেন।

সব মাহদী আন্দোলনেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল : (১) শেষ দিকের প্রচারকগণ ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ভাল বক্তা। ফলে তাঁরা জনসাধারণের ওপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন ; (২) মাহদী আন্দোলন সম্রাটের দরবারের পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিরোধিতার রূপ ধারণ করত। ইসলামে রাষ্ট্রের কোনো রাষ্ট্রীয় ওলামার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু দরবারের ওলেমাদের মধ্যে খ্রিষ্টানদের রাষ্ট্রীয় যাজক সম্প্রদায়ের অনুরূপ এক রাষ্ট্রীয় প্রতিরূপ দেখা যায় এবং তাঁদের থেকেই প্রদেশের সদর, মীর আদল, মুফতী এবং কাজীসমূহ নিযুক্ত করা হত। দিল্লী এবং আগ্রাতে পণ্ডিত সভা গোঁড়া সুন্নী মতাবলম্বীদের নিয়েই গঠিত হত, যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে তাদের কাজ সম্রাটকে সত্য পথে রাখা। তাদের ক্ষমতা যে কত বেশি ছিল তা বোঝা যায় যখন দেখা যায় যে সমস্ত মুসলমান সম্রাটের মধ্যে একমাত্র সম্রাট থাকায় এবং সম্ভবত আলাউদ্দীন খিলজীই এই উদ্ধত গোষ্ঠীকে দমন করে রাখতে পেরেছিলেন।

শেখ আলাইর মৃত্যু ছিল রাজদরবারের ওলামাদের পক্ষে একটা বিরাট জয়। এর পর পরই শুরু হয় মাহদী মতালম্বীদের উপর নির্যাতন। এই নিপীড়ন আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্তও চলে। আফগানদের ক্ষমতা অবসানের পর অল্পদিনের জন্য যখন হুমায়ুন পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন সে সময় অল্পকালের জন্য এই নির্যাতন বন্ধ থাকে, কারণ সে সময় সম্রাট হুমায়ূনের শিয়া মতের প্রতি বিশেষ অনুরাগের জন্যে ওলামাগণ নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু আকবর যখন শিয়া মতাবলম্বী বইরাম খানের মৃত্যুর পর আগ্রার সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, তখন আবার নির্যাতন শুরু হয়। রাজদরবারের পণ্ডিত, বিশেষ করে, শেখ মোবারকের প্রতি ঘৃণা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় যে শেখ আবদুল নবী এবং মাখ্‌দুম-উল-মূলক সম্রাটের নিকট আবেদন করেন যে যেহেতু শেখ মোবারক মাহদী মতাবলম্বী, তাই তিনি শুধু নিজেই পাপী নন, তিনি অন্যকেও পাপের পথে নিয়ে যান সেইজন্য তাঁর মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। তাঁরা তাঁকে সম্রাটের সামনে নিয়ে আসার এক হুকুম আদায় করতেও সক্ষম হন। মুবারক বুদ্ধিমানের মতো আগ্রা থেকে পালিয়ে যান, পিছনে রেখে যান শুধু কিছু আসবাবপত্র যার ওপরে তাঁর শত্রুরা আক্রোশ মিটিয়ে নেন। কিছুদিন লুকিয়ে থেকে তিনি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য ফতেহপুর সিকরির শেখ সলীম চিশতির নিকট আবেদন করেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁকে গুজরাটে আশ্রয় নিতে উপদেশ দেন তখন তিনি আকবরের পালক ভাই মহানুভব খান-ই-আজম মীর্জা কোকার শরণাপন্ন হন। মীর্জা কোকা সম্রাটকে শেখ মোবারকের দারিদ্র্যের কথা বলেন এবং তিনি যে মোবারকের শত্রুদের মতো কোনো নিষ্কর জমি ভোগ করে রাষ্ট্রের কোনো আর্থিক ক্ষতি করেন নি এবং তাঁদের মতো তিনি লোভী নন, এইসব বলে সম্রাটকে বুঝিয়ে তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য অন্তত নিরাপত্তা আদায় করেন। এর কিছু পরে মোবারক তাঁর ছেলে শেখ আবুল ফয়েজের জন্যে নিষ্কর ভূমির প্রার্থনা জানান। যদিও তাঁর বয়স তখন মাত্র ২০ বৎসর কিন্তু ইতিমধ্যেই শেখ ফয়েজ সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মোবারক তাঁর ছেলেকে নিয়ে শেখ আবদুল নবীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু শেখ আবদুল নবী তাঁর মাহদী মতে অনুরক্ত এবং শিয়া মতের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে তাঁদেরকে তাঁর অফিস থেকে বের করে

দেন। এমনকি আকবরের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে যখন ফয়েজীর কবিতার খ্যাতি সম্রাটের দরবার পর্যন্ত পৌছেছে (আকবর তখন চিতোরের সামনে শিবির গেড়েছেন) এবং তরুণ কবির কাছে আহ্বান গেল যেন তিনি সম্রাটের সামনে হাজির হন, তখনও আগ্রায় তাঁদের শত্রুগণ এর মধ্যে নিজেদের ধ্বংসের সূচনা দেখতে পেয়ে গভর্নরকে তাঁকে বাদ দিতে প্ররোচিত করেন। গভর্নর তখন একদল মোঘল সৈন্য পাঠিয়ে দেন মোবারকের বাড়ি ঘেরাও করতে। ঘটনাক্রমে ফয়েজী সে সময় বাড়ি ছিলেন না। ফলে এর মধ্যে কোনো চক্রান্ত রয়েছে সন্দেহ করে সৈন্যরা মোবারককে নানাভাবে উৎপীড়ন করে ; অবশেষে ফয়েজী যখন বাড়ি ফিরে আসেন তখন তাঁকে বলপূর্বক চিতোরে নিয়ে যাওয়া হয়।[১১] যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে দরবারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি আকবরের শুভেচ্ছা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন এবং তাঁর শত্রুদের অন্ধতার কথা বুঝতে পারেন ততক্ষণ তিনি তাঁর পিতা ও নিজের জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ছিলেন।

এদিকে আবুল ফজল পিতার নিকট অত্যন্ত উৎসাহ ও মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করে বড় হয়ে উঠেছেন। শেখ মোবারককে তাঁর মাহদী মতবাদের প্রতি অনুরাগের জন্যে রাজ দরবারের পণ্ডিত ব্যক্তিদের হাতে যে সব নিপীড়ন সইতে হয়েছে, তা তাঁর তরুণ মনে গভীর রেখাপাত করে। এই নির্যাতনের মধ্যে বড় হওয়ার ফলেই যে আবুল ফজল সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করেন তাতে কোনো সন্দেহ নাই এবং উত্তরকালে এরই উপর ভিত্তি করেই আকবরের সাথে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। অপর দিকে এই নিপীড়নই তাঁকে অধ্যয়নের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে যার ফলে পরবর্তীকালে রাজ-দরবারে ধর্মীয় আলোচনার সময়ে তিনি বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের নেতৃত্ব করেন এবং গভীর জ্ঞান ও উদার মতের দ্বারা তিনি চক্রান্তকারী ওলেমাদের, যাদের সম্রাট আকবর অত্যন্ত ঘৃণা করতেন, তাঁদের পরাজিত করতে সক্ষম হন।

মাত্র পনের বৎসর বয়সেই তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক মানসিক পরিপক্কতা দেখা যায়, যা ভারতীয় বালকদের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। তিনি এরই মধ্যে হিকামী ও নাকলী বা মাকুল ও মানকুল নামে পরিচিত বিজ্ঞানের যত শাখা আছে সেই সব শাখার বই অধ্যয়ন করেন। সে সময়েই তাঁর পড়াশুনা যে কত ব্যাপক ছিল তা একটা ঘটনা থেকে জানা যায়। ইসফাহানীর একটা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তাঁর হাতে আসে। দুর্ভাগ্যবশত সেই পাণ্ডুলিপির প্রত্যেক প্যাতার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে অর্ধেক হয় দুর্বোধ্য ছিল নতুবা আগুনে পোড়া। আবুল ফজল এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটির পাঠোদ্ধার করার জন্য সংকল্প করেন এবং পোড়া দিকটা কেটে ফেলে দিয়ে তাতে নতুন কাগজ জুড়ে নিলেন এবং তারপর প্রত্যেক পংক্তির হারানো অংশ পুনরুদ্ধারে লেগে যান। বহু চিন্তাভাবনা ও পৌনপুনিক চেষ্টার পর তিনি তা লিখে ফেলতে সক্ষম হন। এর কিছুকাল পরে ঐ গ্রন্থের আর একটা পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায় এবং তখন এর সাথে আবুল ফজলের উদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে দেখা যায় যে বহুস্থানে দুটি

---

১১. ২০ শে রবিউল আউওয়াল, ৯৭৫ বা ২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৫৬৭। ফয়েজী যে প্রশংসা গীতিটি পেশ করেছিলেন তা 'আকবরনামাতে আছে।

লেখাতে হুবহু মিল রয়েছে এবং অনেক জায়গায় ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হলেও অর্থ একই আছে এবং কোনো কোনো স্থানে অতিরিক্ত যুক্তি সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে মোটামুটি তাঁর লেখা অংশটির সঙ্গে মূল লেখার এত মিল ছিল যে তাঁর বন্ধু–বান্ধব এই ভেবে অবাক হন যে কি করে আবুল ফজল এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হলেন যার দ্বারা তিনি অপর এক লেখকের চিন্তাধারা ও রচনা–কৌশল আয়ত্ত করতে পারলেন।

আবুল ফজল লেখাপড়ায় এতই মনোনিবেশ করেছিলেন যে তিনি বড় লোকের অনুগ্রহ বা রাজদরবারে থাকার ফলে যে অবধারিত বন্ধনের সৃষ্টি হয় তার চেয়ে কৃচ্ছ্রসাধনই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু যে সময় আকবর ফয়েজীকে দরবারে ডেকে পাঠান সে সময় থেকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা দেখা দেয় এবং সম্রাটের দরবারে শেখ মোবারকের বহু শত্রু থাকা সত্ত্বেও ফয়েজী সম্রাটের কাছ থেকে যে উৎসাহ পান তাতে সতের বৎসর বয়সের আবুল ফজলেরও মনে বিশ্বাস জন্মে যে তার অধ্যবসায়ও বিফলে যাবে না। এর মধ্যেই ফয়েজী যে কৌশলে আকবরের বন্ধুত্ব অর্জন করেন তা তিনি রক্ষা করে যেতে থাকেন এবং তাতে আবুল ফজলেরও পথ খুলে যায়। ৯৮১ হিজরীর শেষ দিকে (১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভ) যখন আবুল ফজলকে ফয়েজীর ভাই হিসাবে আকবরের সামনে হাজির করা হয়, সম্রাট তাঁর প্রতি এত আগ্রহ দেখান যে আবুল ফজল পাণ্ডুলিপির মধ্যে জীবন কাটাবার মনোভাব পরিত্যাগ করেন। আবুল ফজল 'আকবরনামায়' লিখেছেন,

যেহেতু শুরুতে ভাগ্য আমাকে সাহায্য করেনি। আমি স্বার্থপর ও আত্মাভিমানী হয়ে উঠেছিলাম এবং স্থির করেছিলাম যে আত্মপ্রসাদপূর্ণ নির্জনতায় কাটিয়ে দেব। আমার চারপাশে আমি যে ছাত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হলাম তা আমার পাণ্ডিত্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের গর্ব আমার মস্তিষ্ককে নিঃসঙ্গতার নেশায় মাতাল করে তুলেছিল। সুখের বিষয়, আমি যখন নির্জনে প্রকৃত জ্ঞানানুসন্ধানীদের সাথে রাত কাটালাম এবং হৃদয়বান ও উচ্চমনের অধিকারী অথচ বিত্তে দুর্বল লোকের সাহচর্য আস্বাদন করলাম তখন আমার চোখ খুলে গেল এবং আমি তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের স্বার্থপরতা ও লোলুপতা উপলব্ধি করলাম। আমার পিতার উপদেশ আমাকে অতি কষ্টে নির্বোধ কাজ থেকে দূরে রাখল ; আমার মন ছিল সদা–চঞ্চল। আমার হৃদয় মঙ্গোলিয়ার দরবেশদের প্রতি অথবা লেবাননের সন্ন্যাসীদের প্রতি আকৃষ্ট হত। আমার মন তিব্বতের লামা বা পর্তুগালের পাদ্রীদের সাহায্য চাইত এবং পারসী ধর্মযাজক বা জেন্দাবেস্তার পণ্ডিতদের সান্নিধ্য পেলে আমি সুখী হতাম। নিজ দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের আমি সহ্য করতে পারতাম না, আমার ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন তখন আমাকে উপদেশ দিলেন সম্রাটের দরবারে যেতে, তাদের আশা ছিল যে সম্রাটের মধ্যে আমি মনন–জগতের এক চিন্তানায়কের নেতৃত্ব। আমি নির্বোধের মতো প্রথমে তাঁদের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আজ আমি সত্যিই সুখী যে আমি আমার সম্রাটের মধ্যে পেয়েছিলাম কর্মজগতের পথপ্রদর্শক এবং নির্জন একাকীত্বে সান্ত্বনাদাতা। তাঁর মধ্যে একসঙ্গে পেয়েছিলাম আমার সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা এবং জগতে আমার নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার আকাঙ্ক্ষা। তিনি সেই পূর্বগগণ যেখানে রূপ ও অরূপের প্রভাত আলোক ছড়ায়। তিনিই আমাকে শিক্ষা দেন যে জগতের বিপুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মের মধ্যেই নিহিত আছে আধ্যাত্মিক সত্যের ঐক্য। আমি এইভাবে রাজদরবারে উপস্থিত হলাম। সম্রাটের চরণে অর্পণ করার মতো আমার কোনো ঐশ্বর্য ছিল না বলে আমি 'আয়াতুল কুরসি'র একটা ব্যাখ্যা লিখলাম এবং আগ্রাতে সম্রাটের কাছে তা নিবেদন করলাম। আমি সমাদর পেলাম এবং সম্রাট অনুগ্রহ করে আমার নিবেদন গ্রহণ করলেন।

আকবর সে সময় বঙ্গ ও বিহার অভিযানের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। ফয়েজী এই অভিযানে সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু আবুল ফজল স্বভাবতই আগ্রাতে থেকে যান। কিন্তু ফয়েজী যখন তাঁর ভাইকে চিঠি লিখে জানালেন যে সম্রাট তাঁর খোঁজ করেছিলেন, তখন সম্রাট

ফতেহপুর সিক্রিতে ফিরে এলেই আবুল ফজল দরবারে উপস্থিত হন। সেখানে প্রথমে জামে মসজিদে আকবর তাঁকে লক্ষ্য করেন। আবুল ফজল আগের মতো এবারও কোরানের সূরা ফাতেহা বা 'জয়ের অধ্যায়'-এর এক ব্যাখ্যা লিখে সম্রাটকে উপহার দেন।[১২]

রাজদরবারে মাখদুমুল মূল্‌ক ও শেখ আবদুল নবীর নেতৃত্বে পণ্ডিত ও গোঁড়া মুন্সীদের যে দল ছিল তাঁদের আবুল ফজল ও ফয়েজীর সাফল্যে বিক্ষুব্ধ হবার যথার্থ কারণ ছিল ; কারণ এই সময়েই আকবরের বিহার অভিযান থেকে ফিরে আসার পর শুরু হয় বৃহস্পতিবারের স্মরণীয় সান্ধ্য আলোচনা যার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বাদায়ূনী বিস্তৃত বিবরণ লিখে গেছেন। আকবর প্রথমে তাঁর দরবারের পণ্ডিত ব্যক্তিদের ফেরাউনদের মতো গর্ব দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। এসব পণ্ডিতের অশেষ বাদানুবাদের কাহিনী তাঁর কানে পৌঁছেছিল। শিয়া ও অন্যান্য বিধর্মীদের প্রতি ধর্মীয় নিপীড়ন ও তাঁর প্রধান বিচারপতি কর্তৃক কতিপয় প্রাণদণ্ড দানের খবরে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং তখনই সর্বপ্রথম তিনি বুঝতে পারেন যে, যে সাম্রাজ্য বিশ বছর ধরে তিনি গড়ে তুলেছেন, তাতে ধর্মগুরু ও ভক্ত ব্যক্তিগণ বিশেষ ক্ষমতা দখল করে আছেন। সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দু প্রজাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এক সকালে ফতেহপুর সিক্রিতে একখণ্ড প্রস্তরে বসে নির্জনে, বিষণ্ন মনে বসে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে সাম্রাজ্যের সব ধর্মের লোকের প্রতি তিনি সমান ব্যবহার করবেন। কিন্তু পণ্ডিত ও আইনজ্ঞদের গোঁড়া মতবাদ সর্বদা তাঁকে বিধর্মীদের নিপীড়নে প্ররোচিত করত, ফলে তাঁর মনে হল হয়ত তাঁরই ভুল হচ্ছে। তাই তাঁর মনে হলো সম্রাট হিসেবে অনুসন্ধান করা তাঁর অবশ্য কর্তব্য। তিনি ধর্মসভায় আলোচনার ব্যবস্থা করলেন। এইসব আলোচনার সম্পর্কে এখানে বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নাই। আলোচনার গোড়ার দিকেই পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে একতা ছিল তা ভেঙে গেল। গণ্ডগোল যুক্তির স্থান দখল করল এবং সম্রাটের সম্মুখেও তাঁরা সহজ নীতিজ্ঞান বিস্মৃত হলেন। ফলে আকবরের মনের সন্দেহ দূর না হয়ে আরও বৃদ্ধি পেল। দেখা গেল, হানাফী মতবাদের কয়েকটি আইন যা অধিকাংশ সুন্নী দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকেন, তা অন্য তিন মজহাবের আইনজ্ঞদের ব্যাখ্যায় আরো ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। হাজরতের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা গেল তাতেও খুঁত আছে। মাখদুমুলমূলক সাম্রাজ্যের সদয় আবদুল নবী সম্পর্কে এক পুস্তিকা প্রকাশ করে তাঁর নিন্দা করলেন। তখন আবদুন নবী মাখদুমকে নির্বোধ বলে গালাগাল করে তাঁকে অভিসম্পাত দিলেন। সম্রাট আকবর প্রথম থেকেই আবুল ফজলকে তাঁর দলের নেতা বলে স্থির করলেন। আবুল ফজল কৌশলে পণ্ডিতদের মতানৈক্যকে এককথা থেকে আর এককথায় নিয়ে গিয়ে তাঁদের বিরোধ বাড়িয়ে তুলতেন। তিনি সবশেষে সম্রাটকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে প্রজাগণ সম্রাটকে শুধু পার্থিব নেতা বলেই গণ্য করবে না, তারা তাঁকে একমাত্র আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক রূপেও গণ্য করবে। আবুল ফজলের ভাগ্য খুলে গেল। তিনি এবং সম্রাট আকবর তাঁদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই নীতি আঁকড়ে ধরেছিলেন। কিন্তু এই

---

১২. কোরানের দ্বিতীয় সূরার ২৫৬ সংখ্যক আয়াতের নাম।

মত ইসলামের নীতির পরিপন্থী[১৩]। কারণ ইসলামের আইন সম্রাটের উর্ধ্বে এবং তার কোনো ব্যতিক্রম করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় ; যদিও আলাউদ্দীন খিলজীর মতো উদ্ধত রাজারা ইতিপূর্বে সাময়িক প্রয়োজনে আইনকে ('মাস্‌ল হাতে ওয়াক্ত') কোরানের আইনের উপরে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু তাঁরা কখনও আইনকে ধর্মের গণ্ডি থেকে আলাদা করে নিতে পারেননি বা সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে মোল্লাদের আওতা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হননি। ফলে আবুল ফজল যখন চার বৎসর পরে ৯৮৬ হিজরীতে বৃহস্পতিবারের সান্ধ্য আসরে এই প্রশ্ন তুলেন তখন এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং যে তর্ক এতদিন হজরতের জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা বা দলীয় মতদ্বৈতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা এরপর ইসলামের নীতি সম্বন্ধীয় আলোচনায় পর্যবসিত হয়। এতদিনে দরবারের সুন্নী ওলেমাগণ বুঝতে পারেন যে গত চার বছরে আলোচনার ফলে কত ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ; বুঝতে পারেন যে সুসংবদ্ধ আইন ও দৃঢ়বিশ্বাসের ভিত্তি কিভাবে শিথিল হয়ে এসেছে এবং আকবর বিশ্বাস করেন যে সব ধর্মেই বিবেচক লোক বর্তমান এবং সব জাতির মধ্যেই উচ্চ চিন্তাশীল ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোক বিদ্যমান। সুতরাং সম্রাটের মতে ইসলাম ধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে উচুস্তরের কিছু নয়। পণ্ডিতগণ যখন দেখলেন যে দরবারে তাঁদের প্রতিপত্তি খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখন তাঁরা গোঁড়ামী ত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত হলেন, কিন্তু তখন আর সময় নেই। তাঁরা শেখ মোবারক ও তাঁর ছেলেরা মিলে যে দলিল মুসাবিদা করেন তাতেও দস্তখত দিলেন। এই দলিল ইসলামের ধর্মীয় ইতিহাসে অদ্বিতীয়। বাদায়ুনী এর একটা হুবহু নকল রেখে গিয়েছেন। এতে সম্রাটকে ন্যায়পরায়ণ শাসক বলে ঘোষণা করা হয় এবং সেজন্য তাঁকে মুজাতাহিদ আখ্যা দেয়া হল অর্থাৎ ইসলামের সর্ববিষয়ে তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নেয়া হয়। ফলে ন্যায়পরায়ণ সম্রাটের বুদ্ধি বিবেচনাই হল আইন-প্রণয়নের একমাত্র উৎস এবং পণ্ডিত ও কাজীদের পুরো দলটা ধর্মীয় ব্যাপারে আকবরের নির্দেশ মেনে নিতে সম্মত হলেন। শেখ আবদুন নবী ও মাখদুমুল মূলক অনিচ্ছা সত্ত্বেও দলিলে দস্তখত করেন—অপরদিকে শেখ মোবারক সই করার সময় যোগ করলেন যে তিনি অতি আনন্দের সঙ্গে সই করছেন এবং তিনি এইরূপ প্রগতিশীল আন্দোলনের সূচনা বহুদিন ধরে আকাঙ্ক্ষা করে আসছেন। আবুল ফজল আকবরনামাতে লিখেছেন, "দলিলটির চমৎকার ফল দেখা গেল। যেমন—

১. দরবারের সব সম্প্রদায়ের জ্ঞানী-গুণীদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হল ; সব ধর্মের ভাল নীতিগুলো স্বীকৃতি পেল এবং তাদের দোষত্রুটিগুলোর জন্যে ভালগুলো অবহেলিত হল না ;
২ সকলের সাথেই মিত্রতা স্থাপিত হল এবং
৩. বিপথগামী ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা সম্রাটের নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে লজ্জিত ও অনুগ্রহচ্যুত হল। দলিলের যে নকলটি সম্রাটের হাতে দেয়া হল তা ছিল শেখ মোবারকের নিজের হাতের লেখা এবং তার তারিখ ছিল ৯৮৭ হিজরী (সেপ্টেম্বর ১৫৭৯ সাল)।

---

১৩. ব্লকম্যানের এই ধারণা ভুল। ইসলামে ইমাম বা নেতা রাষ্ট্রনায়কও। ইসলামে খলিফা একই সঙ্গে রাষ্ট্র নেতা এবং ধর্মনেতা। আবুল ফজল মোল্লাদের থেকে সম্রাটকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য ইসলামের এই মতবাদই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা অনুবাদক

এর কয়েক সপ্তাহ পরে শেখ আবদুল নবী ও মাখদুম-উল-মূলককে মক্কায় পাঠিয়ে দেয়া হল। ফলে শেখ মোবারক ও তাঁর ছেলেরা শত্রুদের ওপরে জয়ী হলেন। আবুল ফজল যে কত উদারচেতা ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁদের নির্বাসন সম্বন্ধে আকবরনামায় তিনি যা লিখেছিলেন তা থেকে। যদিও তাঁরা তাঁর পিতাকে সর্বপ্রকারে নির্যাতন করেছিলেন এবং শুধু তাঁর প্রাণ নিতে বাকি রেখেছিলেন এবং তাঁর পরিবারের সর্বনাশ সাধন করেছিলেন তবু তিনি তাঁদের কারো সম্বন্ধে এমন একটা কথাও লেখেন নি যাতে তাঁদের প্রতি তাঁর কোনো বিরূপতা প্রকাশ পায়। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থটির অন্যান্য সব অংশের মতো এ জায়গাটুকুও ছিল আবেগহীন, দূরদর্শী। "তাঁর পরিবারে কখনো কূট কথা বা অশিষ্ট শব্দের ব্যবহার ছিল না" বলে ঐতিহাসিকরা তাঁর চরিত্রের যে উচ্চ সুখ্যাতি করেছেন তা যে কতো সত্য তা এ থেকে বোঝা যায়।

অবশেষে কলহ ও বাকবিতণ্ডার অবসান হল (১৫৭৯ খ্রি:) এবং ফয়জী ও আবুল ফজল সম্রাটের স্থায়ী বন্ধুত্ব অর্জন করেন। আকবর ফয়েজীকে কত বিশ্বাস করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই থেকে যে সেই বছরই তিনি তাঁকে রাজপুত্র মুরাদের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। যেহেতু উভয় ভ্রাতাই সম্রাটের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করেছিলেন—তখন সেনাবাহিনীই ছিল একমাত্র সরকারি চাকুরির ক্ষেত্র, তাই উভয়েই সব পেয়েছিলেন, এবং তাঁদের বিভিন্ন বিভাগে চাকুরির ফলে নতুন নতুন সম্মানের সুযোগ খুলে যায়। উভয়েই আকবরের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব লাভের ফলে ফতেপুর সিক্রিতে থাকতেন, নতুবা অভিযানের সময় সম্রাটের অনুগমন করতেন। দুই বৎসর পর ফয়েজী আগ্রা, কালপী ও কালিঞ্জরের সদর নিযুক্ত হন। এই পদে তাঁর একটা কাজ ছিল নিষ্কর ভূমি খাস দখলে আনার সম্ভাবনা বিবেচনা করা, কারণ ততদিনে সরকারি কর্মচারীদের অসদাচরণের ফলে এবং নিষ্কর ভূমি মালিকদের চাতুরীর জন্যে নিষ্করের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে সাম্রাজের ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছিল। আবুল ফজল ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে এক হাজারী মনসবদার উন্নীত হল অর্থাৎ তিনি এক হাজার ঘোড়সওয়ারের সেনাপতি নিযুক্ত হন এবং পর বৎসর দিল্লী প্রদেশের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ফয়েজীর পদ আরও অনেক নিচে ছিল ; তিনি ছিলেন মাত্র চারশতের সেনাপতি। কিন্তু তিনি আর পদোন্নতির কোনো চেষ্টা করেননি। কাব্যোপাসক হিসাবে তিনি সভা কবি উপাধি পেয়েই এত সন্তুষ্ট হলেন যে তা আর কোনো রাজপদই তাঁকে দিতে পারত না। ১৫৮৮ সালে আকবর তাঁকে এই পদে ভূষিত করেন। সম্রাট যদিও কাব্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নি, তবু ফয়েজীর প্রতিভা তিনি ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। কারণ দিল্লীর আমীর খসরুর পর মুসলিম ভারতে ফয়েজীর চেয়ে বড় কবি আর কেউ জন্মান নি।

১৫৮৯ সালের শেষের দিকে আবুল ফজলের মাতৃবিয়োগ হয় তিনি তাঁর স্মরণে আকবরনামার একটি পৃষ্ঠা উৎসর্গ করেন। সম্রাট তাঁকে সান্ত্বনা দিতে তাঁর নিকট গমন করেন এবং বলেন, "এই পৃথিবীর লোকেরা যদি চিরদিন বেঁচে থাকত এবং মাত্র একবারই তাদের মরণ না হত তা হলে তাদের মনে আল্লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে ও তার প্রতি নির্ভরতা জাগাতে সহানুভূতিশীল বন্ধুর প্রয়োজন হত না ; কিন্তু এই পৃথিবীর সরাইখানায় কেউ বেশি দিন বেঁচে থাকে না। তাই শোকে সান্ত্বনা পাওয়াই বিধেয়।"

ইত্যবসরে ধর্মীয় বিষয়সমূহ অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। আকবর 'দীন ইলাহী', বা স্বর্গীয় বিশ্বাস নামে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেছেন। শেখ মোবারকের পূর্বে লিখিত দলিল অনুযায়ী যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এক আল্লায় এবং পৃথিবীতে আকবর তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা এই নীতিতে বিশ্বাস। দরবারে ইসলামী উপাসনা বন্ধ করে দেয়া হল এবং পারসীদেরও কিছুটা হিন্দু ধর্মানুযায়ী "বিশিষ্ট"দের পূজা প্রবর্তিত হল। তারিখ ইলাহী নামে যে নতুন অব্দ সমস্ত সরকারি দলিলে প্রবর্তন করা হল এবং সম্রাট যে সব ভোজের আয়োজন করতেন তা নেয়া হল পারসী ধর্ম থেকে। দরবারের মুসলমান আমীরগণ এসবে বিশেষ বাধা ছিলেন না ; তাঁরা আকবরের নতুন ধর্ম প্রবর্তনের বিষয়টির চেয়ে দরবারে হিন্দু ওমরাহদের আগমনেই বিশেষ চিন্তিত ছিলেন, কারণ ধর্ম-প্রবর্তনার ব্যাপারটি খুব কম লোকের গায়েই আঁচড় কেটেছিল। কিন্তু আবুল ফজলের প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল অত্যন্ত বিরূপ এবং তাঁরা প্রায়ই সম্রাটকে পরামর্শ দিতেন যাতে তাঁকে দক্ষিণে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাঁরা আশা করতেন, যুদ্ধে বা শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে দরবারে তাঁর প্রতিপত্তি হ্রাস পাবে। রাজপুত্র সলিমও (জাহাঙ্গীর) এই অসন্তুষ্টদের মধ্যে ছিলেন। আবুল ফজলের প্রতি তাঁর বিরাগ ক্রমে এত গভীর হয়ে উঠেছিল যে তিনি তাঁকে তাঁর উদ্দাম সব পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রধান অন্তরায় বলে মনে করতেন। একবার তিনি প্রত্যাশিতভাবে আবুল ফজলের সাথে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে কপটতার অভিযোগে অভিযুক্ত করার এক চমৎকার সুযোগ পান। ঘরে ঢুকে তিনি দেখতে পান যে চল্লিশ জন লেখক কোরানের ব্যাখ্যা নকল করছেন। তিনি তাঁদের তখনই তাঁর সাথে যাবার আদেশ দেন এবং তাঁদের নিয়ে সম্রাটের নিকট গিয়ে নকলগুলো দেখিয়ে বলেন, "আবুল ফজল আমাকে যা শেখান তা কিন্তু তিনি তাঁর বাড়িতে যা করেন তার থেকে ভিন্ন।" কথিত আছে, এ ঘটনার ফলে সাময়িকভাবে সম্রাটের সাথে আবুল ফজলের সম্পর্কে অবনতি হয়। খুব বিশ্বাসযোগ্য না হলেও অনুরূপ আর একটি ঘটনা জাখীরাতুল্ খাওয়ানীন-এর লেখক বিবৃত করেছেন। তিনি বলেছেন যে আবুল ফজল ইসলাম ত্যাগ করে অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং রাত্রিবেলায় ছদ্মবেশে দরবেশের বাড়ি যাতায়াত করতে থাকেন এবং তাঁদের সোনার মোহর উপহার দিয়ে অনুরোধ করেন যেন তাঁরা তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস যাতে অটুট থাকে তার জন্যে মোনাজাত করেন। এই সব অনুরোধ করার সময় তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেন এবং হাঁটু চাপড়িয়ে বলতেন, "আমি কি করব?" সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা যেমন ফয়েজীকে এই বলে তাঁর ধর্ম ত্যাগ এবং তার জন্যে তাঁর নরক ভোগ থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি হজরতের প্রশংসা করেছিলেন, তেমনি অন্যান্য লেখকগণ আবুল ফজলের জন্যেও বেহেশতে যাবার ব্যবস্থা দান করেছেন। কয়েকটি গ্রন্থেই লিখিত আছে যে লাহোরের দরবেশ শাহ আবুল আলী ক্বাদিরী[১৪] একদা আবুল ফজলের কাজ এবং কথার নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, এক রাত্রে তিনি আবুল ফজলকে বেহেশতে এক সভায় আসতে দেখতে পান ; হজরত যখন তাঁকে সভায় ঢুকতে দেখেন তখন তিনি তাঁকে বসতে বলেন এবং বলেন, "এই ব্যক্তি তাঁর জীবনের কিছু সময় অন্যায় কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁর একটা বইয়ের সূচনায় এই শব্দগুলি রয়েছে যে, "হে আল্লাহ, ভাল লোকদের তাদের ন্যায়পরায়ণতার জন্যে পুরস্কৃত করুন, এবং অন্যায়কারীকে

১৪. জন্ম ৯৬০ হিজরী ; লাহোরে মৃত্যু ১০২৪ হি.। দ্র. 'খাজিনাতুল্ আসফিয়া', পৃ. ১৩৯।

আপনার ভালবাসা দ্বারা সাহায্য করুন," এবং এই বাক্যই এঁকে রক্ষা করেছে। শেষ গল্প দুটো খুব সম্ভব সুন্নীদের সন্তুষ্ট করার জন্যে বানানো। কিন্তু প্রথমটা যদি সত্যি হয় তবে তা আবুল ফজলের গ্রন্থসমূহে যে একই ধরনের মতবাদ ও দার্শনিক বিশ্বাস দৃষ্ট হয় তা থেকে কোনো রূপেই ভিন্ন নয় ; এবং যদিও তিনি খাঁটি দেবত্ববাদ ও ধর্মীয় দর্শনে বেশি আনন্দ পেতেন এবং মোল্লাদের কূটতর্কের চেয়ে তাতেই বেশি সঙ্গতি দেখতে পেতেন, তাঁর মন যৌবনকালের প্রারম্ভ থেকে কঠোর সাহিত্যিক অধ্যয়নাদিতে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে ইসলাম বাতিল করার পরও তাঁর পক্ষে কোরানের ব্যাখ্যা নিয়ে গবেষণা করা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ মুসলিম সাহিত্যের যত উচ্চ যুক্তিতর্ক ও গভীর ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা বহু শত বৎসর ধরে পবিত্র গ্রন্থ কোরানের ব্যাখ্যার মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল।

এই সময়েই সম্রাটের নিজের তত্ত্বাবধানে সাহিত্য সৃষ্টির কাজ শুরু হয়। আবুল ফজল, ফয়েজী এবং বাদায়ূনী, নকীব খান, শেখ সুলতান, হাজী ইব্রাহীম, শেখ মুনাউওয়ার প্রমুখ পণ্ডিতেরা ও অন্যান্যরা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সংকলনাদি প্রণয়নে এবং সংস্কৃত ও হিন্দি থেকে ফারসি ভাষায় পুস্তক অনুবাদের মনোযোগ দেন। ফয়েজী অঙ্কশাস্ত্র সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ 'লীলাবতী' অনুবাদের কাজ হাতে নেন এবং আবুল ফজল 'কলিলা দামনা', 'আয়ার দানিশ' নামে আরবি থেকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি মহাভারতের অনুবাদে এবং তারিখ-ই আলফী বা 'সহস্র বৎসরের ইতিহাস' রচনায় অংশগ্রহণ করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে শেষোক্ত বইটি মাহদবী আন্দোলনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল, যদিও শেখ আলাইএর মৃত্যুর পরও 'সহস্র বৎসরে' বিশ্বাসীগণকে নির্যাতিত হতে হয়েছে। দৃশ্যত এর পর থেকেই এই আন্দোলনের অবসান ঘটে, কিন্তু সহস্র বৎসর পরে ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের প্রসঙ্গ ফতেপুর সিক্রির আলোচনায় এবং শরীফ-ই আমুলির দলের[১৫] লোকদের প্রচারের ফলে পুনর্জীবিত হয়—শুধু এই গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীটি যুক্ত হয় যে আকবর হচ্ছেন স্বয়ং "কালের প্রভু" যাঁর হাতেই ক্ষয়িষ্ণু ইসলামের অবলুপ্তি ঘটবে। এই নতুন ভাবধারা আকবরের অনুমোদন লাভ করেছিল এবং তাঁর ধর্মবিশ্বাসের অগ্রগতিতে এ ধারণা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই তারিখ-ই-আলফীর কাজ ছিল ইসলামকে অতীতের ঘটনা রূপে উপস্থিত করা এবং এই মতো প্রচার করা যে ইসলাম এক সহস্র বৎসর ('আলফ') বেঁচে থাকার পর তার কাজ সম্পূর্ণ করে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। ইসলামের প্রারম্ভের ইতিহাসও লেখা হয়েছিল শিয়া মতানুযায়ী। সুন্নীদের পক্ষে তা খুবই বিরক্তিকর হয়েছিল। তার চেয়েও

---

১৫. ১৬২৮ সালে শাহজাহানের সিংহাসনারোহণের কালে মাহ্‌দবী আন্দোলনের কথা শেষবারের মতো শোনা গিয়েছিল। আকবর তখন মারা গেছেন এবং তিনি 'সহস্র বৎসরের' আন্দোলনকে রক্ষা করেও যাননি। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, বিশেষত প্রথম দিকে দরবার ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় নি—বাদশাহ 'সিজ্‌দা'র আনুষ্ঠানিকতা বজায় রেখেছিলেন—এই 'সিজদা' মুসলমানেরা একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যেই করা যায় বলে মনে করেন। কিন্তু শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করে অনেক মুসলিম ধর্মানুষ্ঠান আবার আরম্ভ করলেন—এগুলিকে ইতিপূর্বে দরবার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। আর যেহেতু ১০০০ হিজরীতে তাঁর জন্ম, তিনি প্রকৃত রক্ষাকারী রূপে চিহ্নিত হয়ে পড়েন। তারপর থেকে ওই আন্দোলনের আর কোনো সমর্থক জোটে নি।

খারাপ কথা, বিভিন্ন ঘটনাক্রমের তারিখও পরিবর্তন করে নেয়া হয়েছিল, যেমন হজরতের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ঘটনা থেকে না শুরু করে, ইতিহাস শুরু করা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর সময় থেকে। হিজরী ১০০০ অব্দের (১৫৯২ শতাব্দীর প্রারম্ভ) মাঝামাঝি আকবর আবুল ফজলকে দোহাজারী মনসবদারে উন্নীত করেন, অর্থ তাকে দুই হাজার ঘোড়সওয়ারের সেনাপতি পদে উন্নীত করেন। ফলে আবুল ফজল দরবারের উমারা-ই-কিবার বা প্রধান আমীরদের মধ্যে পরিগণিত হন। আগের মতো তিনি সম্রাটের কাছে কাছে থাকেন। সে বৎসরই ফয়েজীকে দাক্ষিণাত্যেও প্রেরণ করা হয় বুরহানউল মূলকের কাছে এবং খান্দেশের রাজা আলী খানের দরবারে সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে। রাজা আলী খান তাঁর কন্যাকে রাজপুত্র সলিমের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ষোল মাসেরও বেশি বাইরে থেকে ফয়েজী পুনরায় দরবারে ফিরে আসেন।

শেখ মোবারক তাঁর বিখ্যাত দলিল প্রকাশের পরই কর্মজীবন থেকে প্রায় অবসর নিয়েছিলেন। পর বৎসর তিনি লাহোরে মৃত্যুমুখে পতিত হন (রবিবার ১৭ই জিল্‌কাদ ১০০১ হিজরি, বা ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৫৩৯ সাল)। তাঁর বয়স তখন ৯০ বৎসর হয়েছে। তিনি জীবনের শেষ দিনগুলি মান্‌বাউ নাফাইসুল উয়ূম নামে কোরআনের ৪ খণ্ড সুবৃহৎ ব্যাখ্যা লিখে কাটিয়েছেন। চোখের দৃষ্টিহীনতা সত্ত্বেও মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিনি এ কাজ শেষ করেন।

ঐতিহাসিক বাদায়ূনী তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, শেখ মোবারক বর্তমান যুগের পণ্ডিত ব্যক্তিদের অন্যতম। ব্যবহারিক জ্ঞানে, দয়ায় এবং আল্লার প্রতি নির্ভরতায় তিনি তাঁর কালের লোকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম পালন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসে এত অনমনীয় ছিলেন যে যদি কেউ কখনো সোনার আংটি হাতে দিয়ে, বা রেশমের কাপড় পরে, বা পায়ে লাল মোজা পরে অথবা লাল বা হলুদ কাপড় পরে নামাজের জমাআতে সামিল হতে আসতেন তিনি তাঁকে সে সব জিনিস খুলে আসতে আদেশ দিতেন। আইনের বিচারের প্রশ্নে তিনি এত কঠোর ছিলেন যে তাঁর মতে সাধারণ পদাঘাতের বেশি যে কোনো আঘাতে মৃত্যুদণ্ডই যোগ্য শাস্তি। যদি রাস্তায় চলার সময় কখনো গানের সুর তাঁর কানে আসত, তিনি দৌড়ে সেখান থেকে সরে যেতেন। কিন্তু কালক্রমে ঐশ্বরিক ভক্তির প্রেরণায় তিনি গানের এত ভক্ত হয়ে পড়েন যে কোনোরূপ সুরের মূর্ছনা না শুনলে তাঁর জীবন দুর্বিষহ মনে হত। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিপরীতধর্মী জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন। আফগান শাসনকালে তিনি শেখ আলাইর দলের সঙ্গে দহরম মহরম করেন। সম্রাট আকবরের শাসন-কালে যখন নক্‌শবন্দীর প্রাধান্য চলছিল তখন তিনি তাঁদের সাথে সদ্ভাব গড়ে তোলেন ; এরপর তিনি হামদানী মতবাদ গ্রহণ করেন, সবশেষে যখন দরবারে শিয়াদের প্রাধান্য দেখা দেয় তখন তিনি শিয়া মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেন। "যার বোধশক্তি যতটুকু সে সেই অনুযায়ীই কথা বলে"—সময়ের সাথে খাপ খাওয়ানোই তাঁর নীতি, বাকিটা বুঝতেই পারেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি সর্বদা ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়াতে নিযুক্ত ছিলেন। ছন্দপ্রকরণ, হেঁয়ালী রচনায় ও

সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। আর অতীন্দ্রিয় দর্শনে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী, তদানীন্তন ভারতের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে আর কারও কিন্তু এ গুণ ছিল না। শাতিবী ("তাজভীদের" লেখক—তাজভীদ কোরআন বিশুদ্ধভাবে পাঠ করার বিদ্যা) তাঁর মুখস্থ ছিল এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা তিনি করতে পারতেন এবং দশ রকমের বিভিন্ন কোরআন পাঠ পদ্ধতি তাঁর জানা ছিল। তিনি রাজাদের প্রাসাদে যেতেন না, কিন্তু সঙ্গী হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভালো এবং নানাবিধ রসালো গল্প বলে আসর সরগরম রাখতে পারতেন। জীবনের শেষ দিকে যখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে তখন তিনি পড়াশুনা ছেড়ে দেন এবং নির্জনে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি কোরআনের যে ব্যাখ্যা লিখেছিলেন, তার অনেকটা তফসীর-ই কবির-এর মতো ছিল এবং তা সুবৃহৎ চার খণ্ডে লিখিত হয়েছিল ; তার নাম দেয়া হয়েছিল, সামবাউ নাফাইসুল্ উয়ূম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই গ্রন্থের ভূমিকায় একটা অনুচ্ছেদে আছে যাতে তিনি নিজেকে নতুন শতাব্দীর সংস্কারক বলে নির্দেশ করেছেন বলে মনে হয়।[১৬] এই সংস্কারক বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন তা আমরা জানি। যে সময়ে তিনি এই পুস্তকটি শেষ করেন সে সময় তিনি সাতশত চরণ সম্বলিত ফারিজী গীত, বারদা গীত, কবি ইবনে জুবায়েরের লিখিত গীত ও অন্যান্য গীতিকাব্য কণ্ঠস্থ করেন এবং ১০০১ হিজরীর ১৭ই জিলকাদ তারিখে লাহোরে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার দিন পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই সেগুলো আবৃত্তি করতেন।

এত ব্যাপক জ্ঞানসম্পন্ন আর কোনো মানুষ আমি দেখিনি কিন্তু হায়, দরবেশের ছদ্মাবরণে তাঁর মধ্যে পার্থিব পদোন্নতির এত মোহ ছিল যে তিনি তার জন্যে আমাদের ধর্মের কোনো নীতিকেই রেহাই দেননি। প্রথম জীবনে আমি আগ্রাতে বহু বৎসর তাঁর সাথে পাঠাভ্যাস করেছিলাম। তিনি সত্যি সত্যিই মেধাবী লোক ছিলেন ; কিন্তু তিনি বহু পার্থিব অধার্মিক কাজ করতেন, তিনি সম্পদ ও পদের মোহেই ছুটতেন এবং অত্যন্ত সুবিধাবাদী ছিলেন, শঠতা ও মিথ্যার আশ্রয় নিতে তাঁর বাধত না ; এবং ধর্মের নীতিকে তিনি এতই বিকৃত করে নিয়েছিলেন যে তাঁর আগের প্রতিভার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। "বলো, হয় আমি ঠিক পথে আছি, অথবা পরিষ্কার ভুল পথে আছি, বা তুমি" (কোরআন, ৩৪ : ২৩)। তাছাড়া একটা সাধারণ কথা প্রচলিত আছে যে, পুত্র পিতার ওপর অভিশাপ টেনে আনে। সেইজন্য লোকে এজিদের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলে থাকে এজিদ অভিশপ্ত এবং তাঁর পিতাও"।

শেখ মোবারকের মৃত্যুর দু'বৎসর পরে আবুল ফজল তার ভ্রাতা ফয়েজীকেও হারান। ৫০ বৎসর বয়সে ছ'মাস রোগ ভোগের পর ১০০৪ হিজরীর ১০ মকর (৫ই অক্টোবর ১৫৯৫ খ্রি:) ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকাল যখন সমুপস্থিত তখন মধ্যরাত্রে আকবর তাঁকে দেখতে গেলেন এবং যখন দেখলেন তিনি আর কথা বলতে পারেন না, তখন আকবর সাবধানে তাঁর মাথাটা

---

১৬. বাদায়ূনী তাঁর নাজাতুর রশীদ গ্রন্থে বলেছেন যে, তাঁর সময়ে সারা আরবের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তি জালালুদ্দীন সুয়ূতী নিজেকে অনুরূপভাবে দশম শতাব্দীর সংস্কারক বলে নির্দেশ করেছিলেন।

তুলে ধরে বললেন, "শেখ, জাগো। আমি হাকিম আলীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?" কিন্তু কোনো জবাব না পেয়ে সম্রাট শোকে অভিভূত হয়ে তাঁর মাথার পাগড়ি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তারপর আবুল ফজলকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে চলে গেলেন। আবুল ফজল তাঁর বড় ভাইকে যে কত গভীরভাবে ভালবাসতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরীতে। তাঁর ভ্রাতার কবিতাবলী থেকে বাছাই করে যে সব কবিতা উদ্ধৃত করেন সেগুলোর মুখবন্ধে তিনি তাঁর সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী। তিনি লেখেন ; "তাঁর কবিতায় যে ভাবের মণিকনা আছে তা কখনও বিস্মৃত হবে না, যদি সময় পাই এবং পার্থিব কার্যে মনোনিবেশ করতে পারি তা হলে এ যুগের শ্রেষ্ঠ এই লেখকের চমৎকার লেখাগুলো আমি সংগ্রহ করব এবং সতর্ক সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে কিন্তু বন্ধুর মনোভাব নিয়ে তাঁর কবিতাগুলো সংগ্রহ করব। কিন্তু বর্তমানে সহোদরের ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, যার সাথে সমালোচকের কোনো সম্বন্ধ নেই, আমি তাঁর কয়েকটি কবিতা তুলে দিচ্ছি।" আবুল ফজল তাঁর শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর ভ্রাতার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তিনি ফয়জীর মারফাজুল আদ্ওয়ার নামক সংকলনে বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলো একত্র সংগ্রহ করেছিলেন। তাছাড়া আকবরনামায় তিনি তাঁর যে অসংখ্য লেখা উদ্ধৃত করে গিয়েছেন তা তো রয়েছেই।

প্রায় এই সময়েই আবুল ফজল আড়াই হাজার ঘোড়সওয়ার সৈন্যের সেনাপতি পদে উন্নীত হন। এই পদোন্নতির জন্যই তিনি আইন-ই-আকবরীতে আমার ওমরাহদের নামের তালিকায় নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। যে বৎসরে তিনি তাঁর ভ্রাতার লেখা সংকলন করেন সে বৎসরই তিনি আইন-ই-আকবরী লেখাও শেষ করেন (১৫৯৬-৯৭ খ্রি:)।

পর বৎসর, আকবরের রাজত্বের ৪৩-তম বৎসরে, আবুল ফজল সর্বপ্রথম সক্রিয় কার্যে অংশগ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যে সুলতান মুরাদ ঠিকমত শাসনকার্য চালাতে পারছিলেন না, তাঁর অতিরিক্ত মদ্যপানে সম্রাট উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তাই আবুল ফজলকে পাঠালেন যাতে সম্রাটের কর্মচারীগণ দাক্ষিণাত্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলে আবুল ফজল রাজপুত্রকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসতে পারেন। আর যদি সেখানকার কর্মচারীগণ দাক্ষিণাত্য রক্ষায় বিশ্বস্তভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অসম্মত হন তাহলে আবুল ফজল রাজপুত্রকে দরবারে পাঠিয়ে দিয়ে শাহরুখ মির্জার সাথে দাক্ষিণাত্যের সেনাপতির দায়িত্ব নেবেন। রাজপুত্র মুরাদ ও যানখামানের অধীনে সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে সেখানে সম্রাটের অফিসারদের মধ্যে আশ্চর্যজনক শঠতা দৃষ্ট হয়, এবং এর ফলে সম্রাটের হাজার হাজার লোক ক্ষয় হয় এবং প্রচুর রসদের অপচয় হয়। জাহাঙ্গীরের আমলেই বিশেষ করে এরূপ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের সেনাপতিদের মধ্যে খান খামান নিজেই ছিলেন সবচেয়ে বেশি অবিশ্বাসী। তাই আবুল ফজলের সততা ও সম্রাটের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের ফলে তিনি অল্পদিনেই যুদ্ধে সফলতা লাভ করেন। তিনি বুরহানপুরে পৌঁছলেই খান্দেশের সুলতান বাহাদুর খানের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পান। বাহাদুর খানের ভ্রাতা আবুল ফজলের ভগ্নিকে

বিবাহ করেছিলেন। আবুল ফজল এক শর্তে তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে সম্মত হন। শর্ত হলো বাহাদুর খান সম্রাটের অভিযানের সাফল্যের জন্যে আবুল ফজলকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবেন। ব্যাহাদুর কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে সম্রাটের অভিযানে সাহায্য করতে সম্মত হলেন না, তবে তিনি আবুল ফজলকে বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে তাঁর শর্ত না মানার শাস্তি থেকে রেহাই পাবার প্রয়াস পেলেন। আবুল ফজল কিন্তু উপঢৌকনে ভুলবার পাত্র ছিলেন না। তিনি উপহারগুলো ফেরৎ পাঠাবার সময় বলে দিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে চারটি শর্ত পূর্ণ না হলে আমি কোনো উপহার গ্রহণ করব না, তা হলো (১) বন্ধুত্ব, (২) উপহারকে আমি বেশি মূল্য দেব না, (৩) উপহার নেবার আমার বিশেষ আগ্রহ থাকবে না এবং (৪) তা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। এখন আমি যদি ধরে নেই যে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রথম তিনটি শর্ত পূর্ণ হয়েছে, তবু আমার প্রতি সম্রাটের অনুগ্রহের ফলে অন্য কারো কাছ থেকে আমার উপহার নেওয়ার ইচ্ছা দূর হয়ে গেছে।"

ইতিমধ্যে রাজপুত্র মুরাদ আহমদনগর থেকে পশ্চাদপসরণ করেই ইলিচপুর এসেছিলেন এবং এই সময় তাঁর শিশুপুত্র মির্জা রুস্তমের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় তিনি অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও মধ্যপান অব্যাহত রাখেন। আবুল ফজলের উদ্দেশ্য জানতে পেরে তিনি তৎক্ষণাৎ আহমদনগরের দিকে রওয়ানা হন, যাতে তিনি পিতার নিকট ফিরে না যাবার একটা অজুহাত পান ; কিন্তু তিনি যখন দৌলতাবাদের দশ ক্রোশ দূরে পূর্ণা[১৭] নদীর তীরে পৌছেন তখন তাঁর ইন্তেকাল হয়। আবুল ফজলও সেই দিনই সেখানে পৌছলেন এবং দেখলেন রাজপুত্রের শিবিরে চরম বিশৃঙ্খল। প্রত্যেক সেনাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ পশ্চাদপসরণের পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু আবুল ফজল বললেন যে, তিনি অগ্রসর হয়ে যাবার জন্যে দৃঢ় সংকল্প, কারণ শত্রু নিকটে আর এটা বিদেশ, এ অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা চলে না, যুদ্ধ করতেই হবে। সেনাধ্যক্ষদের অনেকেই অগ্রসর হতে অস্বীকার করে ফিরে গেলেন। কিন্তু আবুল ফজল এতে বিচলিত না হয়ে কয়েকদিন বিলম্ব করে অগ্রসর হতে শুরু করেন। তিনি অল্পদিনেই অফিসারদের সব অভাব পূরণ করে তাঁদের তুষ্টি বিধান করেন। সাবধানে সৈন্য সন্নিবেশ করে তিনি দাক্ষিণাত্যের বিজিত স্থানের মধ্যে একমাত্র নাসিক ছাড়া আর সবই দখল করে তার রক্ষার ব্যবস্থা করেন। নাসিক বেশ কিছু পশ্চিমে অবস্থিত হওয়ায় তা দখল করার অসুবিধা দেখা দিল। তিনি বহু দুর্গের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করলেন এবং বৈতালা, তালুতম এবং সাতোনদা অধিকার করেন। এরপর তিনি চাঁদ বিবির সাথে এক সন্ধি করে স্থির করেন যে চাঁদ বিবির সাথে যুদ্ধরত আভাং খান হাবশীকে শাস্তি দিলে চাঁদ বিবি জায়গীর হিসেবে জানীর গ্রহণ করে আহমদনগরের দুর্গ ছেড়ে দেবেন।

ইতিমধ্যে আকবর স্বয়ং উজ্জয়িনীতে এসে গিয়েছেন। বাহাদুর খান রাজপুত্র দানিয়েলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে অস্বীকার করায় এবং খান্দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়ার

---

১৭. পূর্ণা দ্বারা এখানে দক্ষিণের পূর্ণা নদী বুঝায়। উত্তরের পূর্ণা খান্দেশে তাপ্তী নদীতে পড়েছে। কিন্তু দক্ষিণের পূর্ণা, দুধনা সহ গোদাবরী নদীতে পড়েছে। রাজপুত্র মুরাদ ইলিচপুর থেকে নারনালা যান এবং সেখান থেকে যান শাহপুরে, যে শাহপুর তিনি বালাপুরের আট মাইল দূরে নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে এটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ফলে ততদিনে দাক্ষিণাত্য অভিযানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আকবর বাহাদুর খানের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমিরের বিরুদ্ধে অভিযান করতে মন স্থির করলেন এবং রাজপুত্র দানিয়েলকে আহমদনগরের ভার নেওয়ার আদেশ দিলেন। দানিয়েল তৎক্ষণাৎ আবুল ফজলকে আহমদনগরের অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন যাতে তিনি স্বয়ং আহমদনগর দখল করতে পারেন। ফলে যখন রাজপুত্র বুরহানপুর ত্যাগ করলেন, আবুল ফজল আকবরের অনুরোধে মীর্জা শাহরুখ ও মীর মর্তুজা এবং খাজা আবুল হাসানকে সৈন্যদের দায়িত্ব দিয়ে আকবরের সাথে সাক্ষাতের জন্যে রওনা হলেন। ১০০৮ হিজরীর ১৪ই রমজান (আকবরের রাজত্বের ৪৪ বর্ষের প্রারম্ভে) তিনি বিলাগড়ের নিকটে খার্গোতে আকবরের সঙ্গে মিলিত হন। সম্রাট তাঁকে নিম্নলিখিত কবিতাটি দিয়ে অভিনন্দিত করেন,

[রাত্রি প্রশান্ত ও চাঁদের আলো মনোরম। আমি তোমার সাথে অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করতে চাই।]

এবং তাঁকে তাঁর চমৎকার কাজের জন্য চার-হাজারী মনসবে উন্নীত করেন। সম্রাটের বাহিনী এরপর আমির আক্রমণ করে তা অবরোধ করেন।[১৮]

একদিন আবুল ফজল যখন তাঁর কয়েকটি পরিখা তদারক করছিলেন তখন অবরুদ্ধদের একজন যে দলত্যাগ করে আকবরের দলে চলে এসেছিল, তাঁকে মালাই দুর্গের প্রাচীর অতিক্রম করার একটা গুপ্ত পথ দেখিয়ে দেবার প্রস্তাব করে। মালাই দুর্গ আমির গড়ের নিচের একটা উল্লেখযোগ্য দুর্গ। পাহাড়ের অর্ধপথে, পশ্চিম দিকে, সামান্য উত্তর ঘেঁষে মালাই ও অন্তর মালাই নামে দুটি বিখ্যাত প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল। আমির অধিকার করতে হলে প্রথমে এগুলো দখল করা প্রয়োজন, এবং উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর দিকের মাঝখানে চুনা মালাই নামে আর একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল। এর প্রাচীরের একটা অংশ তখন অসম্পূর্ণ ছিল। পূর্ব

---

১৮. "সম্রাট আকবর নর্মদা অতিক্রম করলে রাজা বাহাদুর শাহ তাঁর হাসের (আমির) দুর্গ সুরক্ষিত করেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে রসদ সংগ্রহ করেন। সম্রাট এই দুর্গটি পশ্চাতে ফেলে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক মনে করে, তা দখলের উপায় ভাবতে থাকেন। এই গড়ে তিনটি দুর্গ ছিল। এর প্রথমটির নাম চো-জানিন; দ্বিতীয়টি কোমারঘর; আর তৃতীয়টি ছিল পাহাড়ের একেবারে চূড়ায়। ফলে ছয় ক্রোশ দূর থেকেও দুর্গটা বিশেষভাবে নজর পড়ত। সম্রাট কালমাত্র বিলম্ব না করে আমিরগড় চারদিক থেকে অবরোধ করে ফেলেন এবং এত প্রবলভাবে দিনরাত সমানে আক্রমণ চালান যে ছয় মাস পরে তা প্রায় দখলে আসার মতো হয়। বাহাদুর শাহ তখন বিপদ বুঝতে পেরে নিজের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি আদায় করে সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সম্রাট যখন বিশ্রাম করছিলেন তখন আবুল ফজল তাঁর কাছে এসে তাঁকে দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। ফলে সম্রাট দাক্ষিণাত্যে অভিযানে যাবার দৃঢ় সংকল্প করেন।" উপরোক্ত বর্ণনাটি ডি লারেটের ইন্ডিয়া ভেরা বই থেকে অধ্যাপক লেথব্রিন তাঁর ফ্র্যাগমেন্ট অব ইন্ডিয়ান হিষ্ট্রি বইতে অনুবাদ করেছেন এবং তা ১৮৭৩ সালের ক্যালকাটা রিভিউতে ছাপা হয়েছে। দু'এক জায়গায় ভিলারেট ছোটখাট ভুল করেছেন, চো-জানিন নামটা আমি ধরতে পারিনি। কোমারঘর হলো ফারসি ভাষায় কামার গা, অর্থ পর্বতের মধ্যস্থান। দুর্গ চুনা মালাই ও কোরহিয়া পর্বত এই নামগুলো সত্যি কিনা সন্দেহ আছে, পাণ্ডুলিপিতে আছে খাজামালাই এবং কোরখাহ, কোরতাহ, কোড়িয়াহ ইত্যাদি রূপ লেখা আছে।

থেকে দক্ষিণ–পশ্চিমে ছিল পাহাড় এবং দক্ষিণে ছিল কোরহিয়া নামে একটা উঁচু পর্বত। দক্ষিণ–পশ্চিমে সাপন নামে একটা পাহাড় দিল্লীর বাহিনীর দখল করে নিয়েছিল। আবুল ফজল যে গুপ্ত সংবাদ পাবেন তাকে কাজে লাগানোর দৃঢ় সংকল্প করেন এবং একদল সৈন্য বাছাই করে তাদের তাঁকে অনুসরণ করার আদেশ দিলেন। পরিখার তত্ত্বাবধানকারী সেনাপতিকে শিঙ্গা ও বিউগলের শব্দ পেলে মই নিয়ে তাঁর সাহায্যে যাবার জন্যে আদেশ করে তিনি রাত্রের অন্ধকারে বৃষ্টি মাথায় করে বের হয়ে পড়লেন। সাপন পাহাড়ে তাঁর বাছাই করা সেনাদল রেখে, কারা বেগের অধীনে কয়েকজনকে যে পথ তাঁকে দেখান হয়েছিল সে পথে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা এগিয়ে গিয়ে মালাই দুর্গের একটা দরজা ভেঙ্গে শিঙ্গা বাজিয়ে দিলেন। দুর্গাভ্যন্তরের লোকেরা তাদের বাধা দিতে অগ্রসর হয়। আবুল ফজল কালক্ষেপণ না করে তাঁদের নিকট যান, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। অবরুদ্ধ বাহিনী তখন হতভম্ব হয়ে বিশৃঙ্খলভাবে আমির দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। যে দিনই সম্রাটের অন্যান্য সৈন্যদল চুনা মালাই ও কোরহিয়া পাহাড় দখল করে নেয় এবং বাহাদুর শাহ বাধা দেওয়া নিরর্থক দেখে সম্রাটের ক্ষমা ভিক্ষা করেন (১০০৯)। রাজপুত্র দানিয়েল ততদিনে আহমদনগর জয়[১৯] সম্পূর্ণ করে নিয়ে, আমিরে এসে পিতার সাথে মিলিত হন।

এ সময়ে দাক্ষিণাত্যে রাজু মুন্না গোলযোগ সৃষ্টি করে এবং একদল আলী শাহের পুত্রকে রাজা বলে ঘোষণা করে। আলী শাহের পুত্রের দলে লোক বৃদ্ধি পেলে সম্রাট খান খামানকে তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার আদেশ দিলেন এবং আবুল ফজলকে নামিকে পাঠান হল ; কিন্তু এর অল্প কাল পরেই তাঁকেই খান খানানের সাথে মিলিত হওয়ার হুকুম দেয়া হল। রাজপুত্র দানিয়েলকে বুরহানপুরে রেখে আকবর তখন আগ্রাতে ফিরে গেলেন––সেটা তাঁর রাজত্বের ৪৬ বৎসর দাক্ষিণাত্যে আবুল ফজলের সময় খুব সুখে কাটল। খান খামান যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই তিনি নিষ্কর্মা হয়ে আহমদ নগরে বসে রইলেন এবং যুদ্ধ চালনার ভার আবুল ফজলের ওপর ছেড়ে দিলেন। আবুল ফজল তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করতেন। আবুল ফজল তাঁর সুদক্ষ পুত্র আবদুর রহমানের সাহায্যে জোরালোভাবে অভিযান পরিচালনা করে যেতে থাকেন। আলী শাহের পুত্রের সাথে সমঝোতা করে নিয়ে তিনি রাজুমান্নাকে আক্রমণ করলেন এবং জালনাপুর এবং পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ পুনর্দখল করলেন ও তাঁকে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত করলেন। মান্না দৌলতাবাদে সাময়িকভাবে আশ্রয় পেলেন কিন্তু পরবর্তী যুদ্ধে তিনি প্রায় বন্দী হতে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন।

রাজপুত্র সেলিমকে উদয়পুরের রানার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল। সম্রাট আকবর যখন আমির অবরোধ করেছিলেন সে সময়ই তিনি বিদ্রোহ করে এলাহাবাদে গিয়ে রাজা উপাধি ধারণ করেন। আকবর যখন বুরহানপুর থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন পিতাপুত্রে বিরোধের মীমাংসা হয় কিন্তু আকবরের রাজত্বের ৪৭ বৎসরে পুনরায় তাঁর বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পায়

---

১৯. আহমদ নগরে লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে ছিল একটি সুন্দর গ্রন্থাগার। ফয়েজীর গ্রন্থাগারটি তাঁর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ায় সেটি সম্রাটের গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এবং আকবরের অনেক যোগ্য কর্মচারীকে সেলিমের সমর্থক বলে মনে হওয়ায় সম্রাট তাঁর একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য কর্মচারী আবুল ফজলকে ডেকে পাঠান। তাঁর অনতিবিলম্বে দরবারে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় আকবর তাঁকে তাঁর বাহিনী দাক্ষিণাত্যে রেখে আসতে নির্দেশ দেন। পুত্র আবদুর রহমানকে সেনাদলের ভার দিয়ে আবুল ফজল মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নিয়ে আগ্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আবুল ফজলের প্রতি সেলিমের বিদ্বেষ গোপন ছিল না, তিনি দেখলেন আবুল ফজলের এই অরক্ষিত অবস্থায় ভ্রমণকালে তাঁকে অপসারণের চমৎকার সুযোগ উপস্থিত। তিনি তখন উবচার বুন্দেলা নেতা রাজা বীর সিংহকে অনুরোধ করে সম্মত করালেন যাতে আবুল ফজল তাঁর এলাকার মধ্যে দিয়ে আসার সময় তিনি ওৎ পেতে থেকে তাঁকে হত্যা করেন। বীর সিংহ সম্রাটের বিরাগভাজন ছিলেন, তাই তিনি রাজপুত্রকে তুষ্ট করার এ সুযোগ ছাড়লেন না। সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করলে তাঁকে অবশ্যই উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন ভেবে তিনি অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনার এক বড় বাহিনী নারওয়ারের নিকটে মোতায়েন করেন। উজ্জয়িনীতে পৌছলে সেলিমের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আবুল ফজলকে সতর্ক করে দেয়া হয় এবং তাঁর লোকেরা তাঁকে ঘাটি চান্দা হয়ে যাবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু আবুল ফজল বললেন, চোর ও ডাকাতদের তাঁর দরবারে যাবার পথে বাধা দেবার সাধ্য নেই। তিনি নারওয়ারের পথে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। ১০১১ হিজরীর ৪ঠা রবিউল আউওয়াল শুক্রবার (১২ই আগস্ট ১৬০২ খ্রি:) নারওয়ারের ছয় ক্রোশ দূরে সরাইবার থেকে এক ক্রোশ দূরে বীর সিংহের সৈন্যদের দেখা গেল। যে মুষ্টিমেয় সৈন্য আবুল ফজলের সাথে ছিল তারা তাঁকে পরামর্শ দিল কোনো সংঘর্ষের মধ্যে না যাবার এবং গদাই খান নামে একজন পুরাতন আফগান কর্মচারী তাঁকে দ্রুত আন্ত্রীতে পিছিয়ে যেতে বললেন। আন্ত্রী সেখান থেকে মাত্র তিন ক্রোশ দূরে ছিল এবং সেখানে রায় রায়ান ও সুরয সিংহের অধীনে সম্রাটের তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তিনি বললেন, আবুল ফজল তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে তারপর বীর সিংহকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু আবুল ফজল পলায়নকে অত্যন্ত অপমানজনক মনে করলেন। তিনি আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে লড়াই করলেন, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই শত্রুরা তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং একজন পদাতিকের বর্শায় বিদ্ধ হয়ে তিনি মৃত অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেলেন। বীর সিংহ আবুল ফজলের মাথা কেটে নিয়ে এলাহাবাদে সেলিমের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। কথিত আছে, সেলিম মাথাটাকে "একটা খারাপ জায়গায়" ফেলে রেখেছিলেন এবং সেটা সেখানেই অনেকদিন পড়ে ছিল।

ওলন্দাজ পরিব্রাজক ডি লারেট আবুল ফজলের মৃত্যুর নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়েছেন[২০]

> সলিম হালেবাসাতে (ইলাহ্বাস—ইলাহাবাদের পুরাতন নাম) প্রত্যাবর্তন করলেন এবং নিজ নামে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করলেন এবং পিতার আরো বিরক্তি উৎপাদনের জন্যে তা তাঁর নিকটও পাঠিয়ে দিলেন।

---

[২০] অধ্যাপক ই. লেথব্রীজের "Fragment of Indian History" (ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৭৩) থেকে। আবুল ফজলকে যে স্থানে হত্যা করা হয়েছিল, পাণ্ডুলিপিতে তাঁকে সারা–ই–বীর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্রাট রাগান্বিত হয়ে এসবের একটা বিবরণ লিখে আবুল ফজলের নিকট পাঠালেন। আবুল ফজল সম্রাটকে ধৈর্য ধরে থাকার পরামর্শ দিয়ে জানালেন যে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব সম্রাটের নিকট হাজির হবেন। তিনি আরও জানালেন যে তাঁর পুত্রকে ছলে বলে কৌশলে যেভাবে হোক বেঁধে তাঁর সামনে এনে হাজির করতে হবে। এর পরেই আবুল ফজল রাজপুত্র দানিয়েলের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে তাঁর মালপত্র পেছনে ফেলে আসার হুকুম দিয়ে মাত্র দুই কি তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শাহ্ সলিম এ সব সংবাদ অবগত হলেন। আবুল ফজল সর্বদাই তাঁর প্রতি আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে সলিম তাঁকে দরবারে আসার পথে বাধা দেওয়া স্থির করলেন। তিনি তখন রাজা বীর সিং বুন্দেলা যিনি তাঁর প্রদেশ ওমেনে (উজ্জয়িনী) বাস করতেন, তাঁকে সুর (নারওয়ার?) এবং গোয়ালিয়রের নিকটে তাঁকে আক্রমণ করে হত্যা করার জন্যে এবং তাঁর মাথাটা তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি বীর সিংহকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি এই এত বড় উপকার স্মরণ রাখবেন এবং তাঁকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর সেনাপতি করবেন। রাজা বীর সিং এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে এক সহস্র অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতিক সৈন্য নিয়ে গোয়েলিয়রের তিন-চার ক্রোশ দূরে অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং আবুল ফজলের আগমন সংবাদ সংগ্রহ করে তাঁকে আগেভাগে দেবার জন্য চারিদিকের গ্রামসমূহে চর পাঠিয়ে দিলেন। আবুল ফজল এই লুক্কায়িত সেনাদল সম্বন্ধে কোনো সংবাদ না পেয়ে কোলেবাগা (কালবাগ) পর্যন্ত এসে সুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই সময় রাজা বীর সিংহ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে চারদিকে থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলেন। আবুল ফজল ও তাঁর মুষ্টিমেয় সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন কিন্তু সংখ্যায় অত্যল্প হওয়ায় টিকে থাকতে পারলেন না। আবুল ফজল নিজে যুদ্ধে বারো জায়গায় জখম হন, শেষে একজন বন্দী ক্রীতদাস নিকটবর্তী গাছতলা থেকে দেখিয়ে দিলে শত্রুরা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর শিরচ্ছেদ করে ফেলে। তাঁর মস্তকটি রাজপুত্রের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং তিনি এতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

যে স্বার্থপর নিরাসক্তি ও আত্যন্তিক ঔদাসীন্য রাজপুত্র সলিমের সারাজীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল সেই নিরাশক্তি ও ঔদাসীন্যের সঙ্গে তিনি তাঁর "জীবন স্মৃতিতে"খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছেন যে যেহেতু আবুল ফজল তাঁর শত্রু ছিলেন সেজন্য তিনি তাঁকে হত্যা করিয়েছিলেন। তিনি অকপটভাবে নিজেকে পিতার কর্তব্যপরায়ণ সন্তান বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে অন্যলোকের চক্রান্তের ফলেই তিনি তাঁর পিতার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন :

সিংহাসনে আরোহণ করে আমি বন্দেলা রাজপুত্র রাজা বীর সিংহকে তিন হাজারী সেনাপতি পদে উন্নীত করলাম। তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনি সাহস, সং চরিত্র ও সরলতার জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁকে পদোন্নতি দেওয়ার কারণ ছিল এই আমার পিতার রাজত্বের শেষ দিকে, শেখ আবুল ফজল নামে এক হিন্দুস্থানী শেখকে, যিনি তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং যিনি বহিরঙ্গভাবে রাজ-অনুগত্যের অলংকারে নিজেকে সাজিয়েছিলেন, যদিও তিনি অতি উচ্চ মূল্যে নিজেকে আমার পিতার নিকট বিক্রি করেছিলেন, আমার পিতা দাক্ষিণাত্য থেকে পাঠান। তিনি আমার বন্ধু ছিলেন না, প্রকাশ্যে ও গোপনে তিনি আমার মর্যাদার হানি করেছিলেন। সে সময়ে দুষ্ট লোকেরা চক্রান্ত করে আমার পিতাকে আমার প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল এবং আমি বুঝতে পেরেছিলাম যদি এ সময় আবুল ফজল দরবারে হাজির হতে পারেন তাহলে আমার পিতার সাথে আমার পুনর্মিলনের আর কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। তাঁকে আসতে হলে বীর সিংহ বুন্দেলার এলাকা দিয়ে আসতে হবে। সে সময় এই বীর সিংহ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ফলে আমি তাকে বলে পাঠালাম যে যদি তিনি আবুল ফজলকে পথে আটকে হত্যা করতে পারেন, তাহলে আমি তাকে প্রভূতভাবে পুরস্কৃত করব। ভাগ্য তার সহায় হল এবং আবুল ফজল যখন তার এলাকা পার হতে গেলেন, তিনি তাকে পথে আটকালেন, অল্পক্ষণ যুদ্ধ করেই তাঁর লোকজনকে ছত্রবঙ্গ করে দিয়ে তাঁকে হত্যা করলেন এবং তাঁর মাথা আমার নিকট এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিলেন। যদিও এর ফলে প্রথমে পিতা আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু আবুল ফজলের মৃত্যুর একটা ভাল ফল দেখা গেল : আমি তখন অনায়াসে আমার পিতার নিকট যেতে পারলাম এবং কালক্রমে আমার সম্বন্ধে তাঁর খারাপ ধারণার নিরসন হল।

তাঁর জীবন স্মৃতিতে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আর এক জায়গায় তিনি যে পশ্চাৎ চিন্তা হিসাবেই বলেছেন যে যেহেতু আবুল ফজল পয়গম্বরের শত্রু ছিল সেইজন্য তিনি বীর সিংহ বুন্দেলাকে আবুল ফজলকে হত্যা করতে আদেশ দিয়েছিলেন।

আবুল ফজলের হত্যার সংবাদ যখন দরবারে এসে পৌঁছল তখন সম্রাটকে সে সংবাদ দেওয়ার সাহস কারও ছিল না। তৈমুরের বংশধরদের মধ্যে একটা প্রাচীন প্রথা প্রচলিত ছিল যে কোনো রাজপুত্রের মৃত্যু সংবাদ সাধারণ ভাষায় সম্রাটকে জানান হত না।

রাজপুত্রের উকিল তাঁর হাতের কবজিতে একটা নীল রুমাল বেঁধে সম্রাটের সম্মুখে হাজির হতেন। কেউই যখন সম্রাট আকবরকে আবুল ফজলের মৃত্যু সংবাদ জানাতে সাহস পেল না, তখন আবুল ফজলের উকিল কবজিতে নীল রুমাল বেঁধে আকবরের সামনে হাজির হলেন। আবুল ফজলের মৃত্যুতে আকবর পুত্রশোকের চেয়ে অধিক বিলাপ করেছিলেন। বেশ কয়েকদিন তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেননি এবং সংবাদ নিয়ে যখন আবুল ফজলের মৃত্যুর কার্যকারণ জানতে পারলেন তখন হাহুতাশ করে বললেন,

"সলিমের যদি সম্রাট হওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল তো সে আবুল ফজলকে না মেরে আমাকে মারলেই পারত" এবং তারপর তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন :

আমার শেখ অতি আগ্রহে আমার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে আসছিল সে আমার পদচুম্বন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে প্রাণ দিতে হল।

বীর সিংহকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আকবর পাত্র দাস ও রাজসিংহের অধীনে একদল সৈন্য উড়চাতে পাঠালেন। তাঁরা কয়েকটি যুদ্ধে বুন্দেলা প্রধানকে পরাজিত করে ডাত্তার থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং ইরিচে তাঁকে অবরোধ করলেন। অবরোধ যখন গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং প্রাচীরের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে তখন বীর সিংহ রাজসিংহের এক পরিখা দিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেন। পাত্র দাস তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন। যখন তাঁকে ধরার আর কোনো সম্ভাবনা নেই তখন আকবর দাসকে দরবারে ফিরিয়ে আনলেন ; কিন্তু উড়চার নিকটবর্তী স্থানসমূহে নিয়োজিত সমস্ত বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। আকবরের রাজত্বের শেষ বৎসরের প্রারম্ভে রাজা রাজসিংহ অতর্কিতে বীর সিংহকে আক্রমণ করে তাঁর বহু সংখ্যক অনুচরকে নিধন করেন। বীর সিংহ নিজেও আহত হন এবং অল্পের জন্যে পালিয়ে বাঁচেন। কিন্তু এর অল্প পরেই সম্রাটের মৃত্যু হওয়ায় বীর সিংহের সব ভয় দূর হয়। তিনি অবিলম্বে জাহাঙ্গীরের দরবারে নিজেকে উপস্থিত করেন এবং পুরস্কারস্বরূপ উড়চা ও তিন হাজার ঘোড়সওয়ারের সেনাপতিত্ব পান।

মাআসিরুল ও মারার লেখক বলেছেন, "অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে আবুল ফজল বিধর্মী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন তিনি ছিলেন হিন্দু বা অগ্নি উপাসক বা স্বাধীন চিন্তাশীল, আবার কেউ কেউ আর একটু এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নাস্তিক পর্যন্ত বলেন। আবার কেউ কেউ আর একটু সুবিচার করে তাঁকে সর্বেশ্বরবাদী বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে অন্যান্য সুফীদের মতো তিনিও নিজেকে হযরতের আইনের উর্ধ্বে বলে দাবি করতেন। তবে তিনি যে একজন মহৎ চরিত্রের লোক ছিলেন এবং সবার সাথে শান্তিতে বাস করতে চাইতেন তাতে

কোনো সন্দেহ নেই। তিনি কখনও কোনো অসঙ্গত কথা বলতেন না। তাঁর গৃহস্থালীতে গালমন্দ, বেতন কাটা, জরিমানা এবং চাকরদের কাজে গাফিলতী এসবের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তিনি কোনো চাকুরি দেবার পর যদি বুঝতে পারতেন যে লোকটা অকেজো, তা হলে তাঁকে বরখাস্ত না করে যতদিন পারতেন রেখে দিতেন ; কারণ তিনি বলতেন, তাকে বরখাস্ত করলে লোকে বলবে যে, উপযুক্ত লোক বাছাইয়ের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর নেই। যে দিন সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করত সেদিন তিনি তাঁর গৃহস্থালী পরিদর্শন করতেন এবং জিনিসপত্রের হিসাব নিতেন এবং মজুত জিনিসপত্রের তালিকা করে তা নিজের কাছে রাখতেন ও গত বৎসরের হিসাবের কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতেন। তিনি পাজামাগুলো নিজের সামনেই পুড়িয়ে ফেলতেন, আর তাঁর বাকি কাপড়চোপড় চাকরদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

"তাঁর অসাধারণ রকমের ক্ষুধা ছিল। কথিত আছে যে পানি ছাড়া তিনি দৈনিক ২২ সের খাবার খেতেন। তাঁর পুত্র আবদুর রহমান প্রধান পরিচারক হিসেবে টেবিলে বসতেন ; বাবুর্চিখানার মুসলমান পরিচারকও সেখানে উপস্থিত থাকতেন এবং উভয়ে লক্ষ্য করতেন কোনো বিশেষ খাবারের প্লেটে তাঁর আরো চাই কিনা। যদি সে রকম হত তা হলে ঐ খাবার পরদিন পুনরায় তৈরি করা হত। কোনো খাবার বিস্বাদ হলে আবুল ফজল তা তাঁর পুত্রকে তার স্বাদ গ্রহণের জন্য দিতেন, তাঁর পুত্র সেটা দিতেন বাবুর্চিখানার পরিচারককে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হত না। আবুল ফজল যখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন তখন তাঁর খাবার টেবিলের আয়োজন ও বিলাসিতা অবিশ্বাস্যরূপে বেড়ে গিয়েছিল। একটা বড় তাঁবুতে এক সহস্র উত্তম খাদ্যের পাত্র দৈনিক হাজির করা হত এবং তা আমীরদের মধ্যে বণ্টন করা হত। এর নিকটে আর একটা বড় তাঁবু ফেলা হত, যেখানে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে যে কেউ গিয়ে খানা খেতে পারত। সারাদিন খিচুড়ি পাকানো হত এবং যে চাইত তাকেই তা খেতে দেওয়া হত।

লেখক হিসেবে আবুল ফজল ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর লেখার ধরন ছিল অতি চমৎকার, কিন্তু অন্যান্য মুন্সিদের মতো তাঁর লেখার বেশি কায়দাকানুন বা বাহ্য সৌন্দর্য থাকত না।[২১] তা ছাড়া তাঁর লেখায় শব্দের তেজস্বিতা, পদের গঠনের কারুকার্য, উপযুক্ত যৌক্তিক শব্দ প্রয়োগের দক্ষতা এবং যতি ছেদ ব্যবহারের ঔজ্জ্বল্য এরূপ ছিল যে অন্য কোনো লেখকের পক্ষে তা নকল করা দুরূহ ছিল।

আবুল ফজলের লেখার এমনতর প্রশংসার পর আর কোনো কিছু যোগ করা নিরর্থক। বুখারার সুলতান আবদুল্লাহ বলেছিলেন যে তিনি সম্রাট আকবরের তীরের চেয়ে আবুল ফজলের কলমকে বেশি ভয় করেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র তিনি *'মহামহিম মুন্সি'* বলে পরিচিত ছিলেন। প্রত্যেক মাদ্রাসাতেই তাঁর পত্রাবলী পাঠ করা হয় ; নতুন ছাত্রদের পক্ষে খুব কঠিন ও দুর্বোধ্য বলে মনে হলেও এই পত্রাবলী আদর্শ হিসাবে নিখুঁত। কিন্তু শুধু ফারসি ভাষার বুৎপত্তি থাকলেই হবে না ; আবুল ফজলের যে কোনো গ্রন্থ উপভোগ করতে হলে তাঁর লেখার সাথে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর রচনাভঙ্গী দ্বিতীয়রহিত। ফলে সর্বত্র

---

২১. হাফ্ত ইকলিমের লেখকও এই মত প্রকাশ করেছেন।

পঠিত হলেও তাঁর লেখার অনুকরণ করা সম্ভব নয় এবং তার অনুকরণও হয়নি। তাঁর মতো করে যাঁরা লিখতে চান তাঁরা আসলে পাদশাহ্‌নামা, আলামারা সিকান্দরী, অথবা আরও শব্দাড়ম্বরপূর্ণ আলমগীরনামা, রোক্‌আত-ই বে-দিল ও অন্যান্য ইনশার মতো করে লেখেন।

আবুল ফজলের লেখার একটি প্রশংসনীয় দিক হচ্ছে তার বিষয়বস্তুর পবিত্রতা। প্রাচ্য সাহিত্যের সাথে যাঁরা পরিচিত তাঁরা বুঝবেন এ দ্বারা কি বুঝায়। আমি এমন একটি অনুচ্ছেদেও দেখিনি যেখানে মেয়েদের সম্বন্ধে হাল্কাভাবে কিছু বলা হয়েছে বা অসৎ চরিত্রের প্রতি নিরাসক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। তাঁর সত্যনিষ্ঠা এবং অনুভূতির মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমি আগেই ভূমিকাতে আমার মতামত লিপিবদ্ধ করেছি।[22]

সে যুগে আবুল ফজলের প্রভাব ছিল অসাধারণ। হতে পারে তিনি এবং ফয়েজী উভয়ে মিলে আকবরের মনকে ইসলাম এবং হজরতের প্রতি আনুগত্য থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন—প্রত্যেক মুসলমান লেখকই তাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন ; কিন্তু এও সত্য যে আবুল ফজল তাঁর সম্রাটকে তাঁর নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন রেখেছিলেন ; এবং যে মুহূর্ত থেকে তিনি দরবারে এসে সামিল হলেন তখন থেকেই বিভিন্ন মিশ্রিত জাতি ও গোষ্ঠীর শাসনের সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা ও বিবেচনা শুরু হল, যার ফলে সহনশীলতার নীতি গৃহীত হল। বলা বাহুল্য, ইসলামকে খুব কম দেশেই এ সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে। আকবর যদি এই নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকেন তবে আবুল ফজল এই নীতি সংগঠন করেছিলেন এবং তাঁর লেখনী দ্বারা এর প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছিলেন, আর খান খানানরা ওই যুদ্ধ জয় করেছিলেন, এই নতুন নীতি বিজিতদের বিদেশী শাসনের প্রতি অনুগত করে তুলেছিল। আজ আকবরের ইসলাম ত্যাগের বিষয়টি হয়তো সকলেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তিনি ছাড়া আর কোনো মোগল সম্রাট *'প্রজার পিতা'* এই আখ্যা লাভ করতে পারেন নি। অপরপক্ষে এই ধর্মের সহনশীলতার নীতি পরিত্যাগ করার ফলে মুসলমানদের চোখে সম্রাট আওরঙ্গজেব শ্রদ্ধা অর্জন করলেও এবং আজও ধর্মপরায়ণ মুসলমানরা তাঁর নাম উচ্চারণ করার সময় রহিমাল্লাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন) বললেও, এই সময় থেকেই শুরু হয় সাম্রাজ্যের পতন।

আকবরের সভাসদগণ যে মনে করতেন ফয়েজী এবং আবুল ফজলই আকবরের ধর্মত্যাগের কারণ এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র বাদায়ূনী থেকে অনেক অংশ উদ্ধৃত করে দেখিয়াছি। এ সম্বন্ধে অন্যান্য লেখা থেকে আর উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, তবে উরফীর হযরতের প্রশংসা সম্পর্কিত একটা কবিতা থেকে দু'লাইন তুলে দিচ্ছি :

হে নবী, আমার আত্মার অংশ য়ুসুফকে তার ভাইদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর ; কারণ তারা কূটিল ও হিংসুক এবং শয়তানের মতো তারা আমাকে প্রতাড়িত করে ও আমাকে নেকড়ের মতো (অবিশ্বাসের) কূপের দিকে টানতে থাকে।

---

২২ আবুল ফজলের আইনের চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকার গ্লাডউইনকৃত অনুবাদ পাঠক দেখতে পারেন। দ্র: গ্ল্যাডউইনের 'আইন', ২য়, পৃ. ১৮৫-৯১। এই রচনাংশ ইসলামী বিশ্বাসবিরোধী।

ব্যাখ্যাকারেরা এক বাক্যে বলেন যে এই কবিতাংশে ভাইরা বলতে ফয়েজী ও আবুল ফজলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে আবুল ফজলের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে খান-ই-আজম মীর্যা কোকা যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করছি :

আল্লার নবীর আশ্চর্য তরবারী বিদ্রোহী মাথা কেটে নিয়েছে।[২৩] কিন্তু আবুল ফজল স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দেন এবং বলেন, "আমার মৃত্যু-তারিখ এই শব্দগুলোতে আছে,

"সেবক আবুল ফজল"—এই শব্দগুলো থেকেও পাওয়া যায় ১০১১।

আবুল ফজলের গ্রন্থসমূহ নিম্নরূপ

১. **আকবরনামা** আইন-ই-আকবরী যার তৃতীয় খণ্ড। আইন-ই-আকবরী লেখা শেষ হয় আকবরের রাজত্বের ৪২-তম বৎসরে ; বেরার জয়ের ফলে ৪৩ তম বৎসরে এর স্যাথে সামান্য কিছু যোগ করা হয় (১৫৯৬-৯৭ খ্রি:)। ভূমিকায় আকবরনামায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের রাজত্বের প্রথম ৪৬ বৎসরের বিবরণ দেয়া আছে।[২৪] ইনায়েতউল্লাহ মুহিব আলী লিখিত আকবরের রাজত্বের ঘটনাবলীর একটি পূর্বানুবৃত্তি রয়েছে। আমি অন্তত দুটো পাণ্ডুলিপিতে অনুবর্তী লেখকের এই নাম দেখেছি। এলফিনস্টোন বলেছেন, অনুবর্তী লেখকের নাম মোহাম্মদ স্যালিয়া। এই নাম মোহাম্মদ সালিহ্-এর অপলিখন বলে মনে হয়।

২. **মক্তুবাত-ই-আল্লামী** ইনশা-ই আবুল ফজল নামেও পরিচিত। আবুল ফজল বিভিন্ন রাজা ও সর্দারদের যে সব চিঠি লিখেছিলেন তা এই গ্রন্থে সংকলিত। এর মধ্যে রয়েছে পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের নিকট এবং বুখারার আবদুল্লাহর নিকট লিখিত আগ্রহোদ্দীপক পত্রাবলী। আকবর ইসলাম ত্যাগ করেছেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে আবুল ফজল সংশ্লিষ্ট পত্রটি আবদুল্লাহকে লেখেন। এ ছাড়া আছে ভূমিকা ও সমালোচনা এবং হস্তলিপিবিদ্যার অগ্রগতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ, যার অংশবিশেষ আইনে উদ্ধৃত হয়েছে। আফজাল মুহম্মদের পুত্র আবদুস সামাদ আবুল ফজলের মৃত্যুর পরে এই পুস্তকটি সংকলন করেন। সংকলনে খিমেক আবুল ফজলের বোনের ছেলে এবং তাঁর জামাতা বলে উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থ প্রায়ই মাদ্রাসায় পঠিত হয় এবং এর বহু লিথো করা নকল আছে। এর সবগুলোতে বিষয়বস্তু তিন খণ্ডে বিভক্ত ; কিন্তু বিলগ্রামের আমীর হায়দার হুসাইনী তাঁর সওয়ানিহ্-ই আকবরী গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে তাঁর কাছে এই গ্রন্থের চারটি খণ্ড আছে, তবে এও বলেছেন যে চতুর্থ খণ্ডটির পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত দুর্লভ। মনে হয় আমীর হায়দরেরটা এর একমাত্র পাণ্ডুলিপি।

---

২৩. ...বিদ্রোহী শব্দটার সংখ্যা মূল্য ১০১৩ ; কিন্তু তার মাথা অর্থাৎ... অক্ষর কেটে নিলে দাঁড়ায় ১০১৩-২=১০১১। এই হিজরী সনে আবুল ফজল নিহত হন।

২৪. ৪৬-তম বৎসর হল ১৫ই রমজান ১০০৯ হিজরী থেকে ২৬শে রমজান ১০১০ পর্যন্ত, অর্থাৎ আবুল ফজলের মৃত্যুর প্রায় ৫ মাস পূর্ব পর্যন্ত।

৩. **আয়ার দানিশ**[২৫]। এই গ্রন্থের আলোচনা মূল গ্রন্থে করা হয়েছে।
এছাড়া আমি বিভিন্ন গ্রন্থে দেখেছি, আবুল ফজল রিসালা–ই মুনাজাত বা প্রার্থনা গ্রন্থ, একটি অভিধান জামিউল–লুগাত এবং একটি 'কৌশকল' লিখেছিলেন। 'কোশকল' শব্দের অর্থ 'ভিক্ষার পাত্র' বা প্রাচ্যে ভিক্ষুকরা যে ছোট পাত্রে চাল, খেজুর ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাই ; এই কারণে এ শব্দটি ছোট ছোট গল্প কাহিনীর সংগ্রহ সম্পর্কেও প্রায়শ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু আমি এসব পুস্তকের কোনো কপি দেখিনি। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে আবুল ফজলকে যখন প্রথম দরবারে হাজির করা হয় তখন তিনি দুটো ভাষ্য উপহার দিয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলোর কোনো পাণ্ডুলিপি আর বর্তমানে নেই। তা ছাড়া তিনি সংস্কৃত থেকে যে অনুবাদ করেছিলেন এবং তারিখ–ই–আলফীর সংকলনে যে অংশগ্রহণ করেছিলেন সে সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজনও আমি দেখিনা।

আবুল ফজলের রচনার ও তাঁর ধর্মবিশ্বাসের নমুনা দেখাবার জন্যে বিলগ্রামের মুহাম্মদ আসকারী তাঁর দুরারুল মনশুর গ্রন্থে কাশ্মীরের এক মন্দিরে খোদিত[২৬] আবুল ফজলের এই রচনাটি উদ্ধৃত করেছেন। এই রচনা অবশ্যই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং একে সহজেই আবুল ফজলের রচনা বলে চেনা যায়।

হে আল্লাহ, সব মন্দিরে আমি দেখি লোক তোমারই সন্ধান করছে, আর আমি যে ভাষাই শুনি তাতে লোকে তোমারই প্রশংসা করছে !

ইসলাম বা একেশ্বরবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদ উভয়ই তোমার অনুগামী।

প্রত্যেক ধর্মই বলে, "তুমি এক ও অদ্বিতীয়"।

মসজিদ হ'লে তাতে লোকে দরুদ ও মোনাজাত আওড়ায়, খ্রিষ্টানদের গীর্জা হলে লোকে তোমারই প্রেমে ঘণ্টা বাজায়।

তোমার দুঃখের তীরে লক্ষপ্রেমিক হৃদয়, জগৎ তোমাতে মগ্ন, কিন্তু তুমি লক্ষ্যের অগোচর।[২৭]

কখনও আমি খ্রিষ্টানদের মঠে যাই, কখনও যাই মসজিদে, কিন্তু আমি মন্দির থেকে মন্দিরে তোমাকেই খুঁজি।

---

২৫. প্রকৃত নাম ইয়োর–ই–দানিশ, কিন্তু ভারতে এভাবেই উচ্চারিত হয়, যার অর্থ 'জ্ঞানের পরীক্ষা'। হাকত ইললীমের লেখক সম্ভবত এই গ্রন্থটির কথাই উল্লেখ করেছেন। কারণ তিনি বলেছেন যে তিনি যখন ১০০০ হিজরীতে আবুল ফজলের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান তিনি তখন তাঁকে নওয়াদির–ই–হিকায়াত গ্রন্থের পুনর্লিখক নিযুক্ত দেখেন।

২৬. আইনের চতুর্থ খণ্ডে আবুল ফজল লিখেছেন, "কাশ্মীরের সবচেয়ে ভাল লোক হচ্ছেন ব্রাহ্মণগণ। যদিও তাঁরা এখনও নিজেদের অন্ধবিশ্বাস ও সামাজিক প্রথার বাঁধন কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, তবু তাঁরা কোনো ভণ্ডামী ছাড়াই ঈশ্বরের উপাসনা করেন। তাঁরা অন্য ধর্মের লোকদের ঘৃণা করেন না ; তাঁদের কোনো বাসনা নেই ; এবং তাঁরা আর্থিক লাভের পিছনে ছোটেন না। তাঁরা মাংস খান না এবং কৌমার্য পালন করেন। কাশ্মীরে তাঁদের সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। মনে হয় আকবর এই কাশ্মিরী ঋষীদের আদর্শ মানুষ বলে মনে করতেন।

২৭. এই দুই পংক্তি মূল ফারসি পাঠ থেকে অনুবাদ করা হল। ব্লকম্যান তাঁর ইংরেজি অনুবাদে এই দুটি পংক্তি বাদ দিয়ে গেছেন বা মুদ্রণ প্রমাদের ফলে এই অংশটি বাদ পড়েছে—বাংলা অনুবাদক।

বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী কারও সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই কারণ এদের কেউই তোমার সত্যের পর্দার বাইরে নয়।

অবিশ্বাসী থাক তার অবিশ্বাস নিয়ে, বিশ্বাসী থাক তার বিশ্বাস নিয়ে—

কিন্তু গোলাপের পুষ্পরেণুতে আতর ব্যবসায়ীরই অধিকার।[২৮]

হিন্দুস্থানের একেশ্বরবাদীদের বিশেষত কাশ্মীরে বসবাসকারী ঈশ্বর পূজারীদের হৃদয় একসূত্রে গ্রথিত করার জন্যেই এই মন্দির নির্মিত হল।

সিংহাসন ও মুকুটের অধিকারী, সৃষ্টির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শাহ আকবরের আদেশে, যাঁর মধ্যে সপ্ত ধাতু একাত্ম হয়ে গিয়েছে এবং যাঁর মধ্যে চার উপাদান সম্পূর্ণরূপে একীভূত হয়ে গিয়েছে।[২৯]

যদি কেহ অসৎ উদ্দেশ্যে এই মন্দির ধ্বংস করে, তা হলে প্রথমে সে তার নিজস্ব উপাসনাস্থান ধ্বংস করুক। কারণ যদি আমরা হৃদয়ের নির্দেশ মেনে চলি, তাহলে আমাদের সকল মানুষের সাথে ভাব রেখে চলতে হবে, কিন্তু যদি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করে চলি তা হলে সব কিছুই ধ্বংসের যোগ্য বলে মনে হবে।

হে আল্লাহ, তুমি ন্যায়পরায়ণ এবং তুমি উদ্দেশ্য বুঝে কাজের বিচার কর।

শুধু তুমিই জান কোন উদ্দেশ্য মহৎ কিনা এবং নপস্তিকে তুমিই বলে দাও তার কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আবুল ফজলের পরিবার সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, এবং তা দিয়েই আমি তাঁর এই জীবনীটা শেষ করব। আইন-এ শেখ মোবারকের ছেলেদের নিম্নলিখিত তালিকা আছে।

১. শেখ আবুল ফয়েজ। তিনি তাঁর কবি নাম ফয়জী দিয়েই পরিচিত। তিনি হিজরী ৯৫৪ সালে (১৫৪৭ খ্রি:) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মনে হয় তিনি নিঃসন্তান অবস্থায়ই মারা যান।

২. শেখ আবুল ফজল। জন্ম ১৪ই জানুয়ারি ১৫৫১ সাল, নিহত হন ১২ই আগষ্ট ১৬০২ খ্রি:।

৩. শেখ আবুল বরাকাত। জন্ম শাওয়াল ৯৬০ হিজরী (১৫৫২)। "যদিও তিনি বিদ্যা শিক্ষায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন নি, তবু তিনি ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক ছিলেন এবং তরবারি দ্বারা আক্রমণ করার কৌশল খুব ভাল জানতেন। তিনি খুব ভাল মানুষ ও দরবেশ ভক্ত ছিলেন।" তিনি খান্দেশে আবুল ফজলের অধীনে কাজ করেছিলেন।

৪. শেখ আবুল খায়ের। জন্ম ২২শে জামাদিয়াল আউওয়াল, ৯৬৭ হিজরী। "তিনি তরুণ ওয়াকিহাল লোক ছিলেন এবং তিনি বেশ সংযতমনা ছিলেন।" তিনিও খুব সম্ভব সম্রাটের চাকুরিতে ভর্তি হয়েছিলেন ; কারণ আকবরনামাতে তাঁর এই বলে উল্লেখ আছে যে সম্রাট রাজপুত্র দানিয়েলকে আনার জন্যে তাঁকে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়েছিলেন।

---

২৮. এই পদটি সুফী ভাবাত্মক। আল্লাহর জন্যে হৃদয়ের আকুলতাকে গোলাপের পাপড়ি থেকে যে সুগন্ধ নির্গত হয় তার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

২৯. অর্থাৎ আকবর ইনসান-ই-কামিল বা পূর্ণাঙ্গ পুরুষ।

৫. শেখ আবুল মাকারিম। জন্ম ২৩শে শাওয়াল ৯৬৭ হিজরী। প্রথমে তিনি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, কিন্তু পরে পিতার যত্নে তিনি ভাল শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি শাহ্ আবুল ফতহ্ শিরাজীর নিকটও বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন।

উপরোক্ত পাঁচটি সন্তান এক মায়ের গর্ভে জাত। এই মা ৯৯৮ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. শেখ আবু তোরাব। জন্ম ২৩শে জিলহজ্জ ৯৮৮ হিজরী। "যদিও তাঁর মা ভিন্ন ছিলেন[৩০] তবু তাঁকেও দরবারে নেয়া হয়েছিল এবং তিনি আত্মোন্নতিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। এঁরা ছাড়াও আবুল ফজল আরও দুইটি সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন যাঁরা শেখ মোবারকের মৃত্যুর পরে তাঁর দাসীদের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, শেখ আবুল হামিদ, জন্ম ৩রা রবিউস্সানী, ১০০২ হিজরী, এবং শেখ আবু রশিদ, জন্ম ১লা জামাদিয়াল আউওয়াল, ১০০২ হিজরী। "তারা দেখতে পিতার মতই হয়েছিলেন"।

মোবারকের কন্যাদের মধ্যে চারজনের নাম বিভিন্ন ইতিহাসে পাওয়া যায় :

১. একজনের খোদাবন্দ খান দক্ষিণীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। বাদায়ূনী তাঁর স্বামী রাফিজী বা শিয়া বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন তিনি গুজরাটের রাচীতে ইন্তেকাল করেন।

২. একজনের হুসামুদ্দিনের সঙ্গে বিবাহ হয়।

৩. একজনের খান্দেশের রাজা আলী খানের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁদের সন্তান সফদর খানকে আকবরের রাজত্বের ৪৫ বৎসরে এক হাজারী মনসবদার করা হয়।

৪. লাভলী বেগমের বিয়ে হয়েছিল ইসলাম খানের সাথে। মিফ্তাহুত—তাওয়ারিখের সুযোগ্য লেখক আগ্রার মি: টি, ডব্লিউ বীল আমাকে জানিয়েছেন যে লাভলী বেগম ১০১৭ হিজরীতে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর ৫ বৎসর পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর সমাধি সৌধ রওজায়ে লাভলী বেগম, আগ্রার নিকটে সেকেন্দ্রায় সম্রাট আকবরের সৌধের দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত। এর ভিতরটা মর্মর পাথরে তৈরি এবং সমগ্র সৌধ ফতেপুর সিক্রির লাল বেলে পাথরের দেয়ালে ঘেরা। ১০০৪ হিজরীতে এর নির্মাণ শেষ হয়।

১৮৪৩ সালে মি. বীল রওজাতে নামফলকবিহীন অনেকগুলো কবর দেখতে পান এবং তিনি দেখেন কয়েক বৎসর পূর্বে এ স্থানটা ব্রিটিশ সরকার একজন ধনী হিন্দুর নিকট বিক্রি করেছেন। এই নতুন মালিক মার্বেল পাথরগুলো খুঁড়ে তুলে সেগুলো বিক্রি করে দিয়েছেন এবং কবরগুলো ধ্বংস করে ফেলেছেন। ফলে পুরানো রওজার শুধু বাইরের দেয়াল ছাড়া আর কিছুই আজ অবশিষ্ট নাই। মি: বীল মনে করেন যে শেখ মোবারক ফয়জী ও আবুল ফজলের দেহও এখানে সমাধিস্থ ছিল, কারণ প্রবেশ পথের ওপরে তোগরা অক্ষরে নিম্নলিখিত লিপি আজও দেখা যায় :

সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু আল্লাহর নামে যাঁর প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস ! এই সৌধ শাশ্বত পণ্ডিত-ঋষি জ্ঞানান্বেষী শেখ মোবারক উল্লাহ্র (তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক) জন্যে

---

৩০. লখনউ সংস্করণ আকবরনামায় (৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৩০) তাঁকে সুন্দর খান বলা হয়েছে।

বাৎসল্যানুগত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জ্ঞানবিদ্যাজঋষি শেখ আবুল ফজল (মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন)-এর দ্বারা ন্যায়পরায়ণ সম্রাট যাঁকে ক্ষমতা, সৌভাগ্য ও মহানুভবতা অনুসরণ করে, সেই জালালুদ্দুনীয়া ওয়াদ্দীন পাদশা-ই গাজী-আকবর (সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্য অক্ষয় রাখুন) এর মহামহিম ছায়াতলে আবুল বরাকাতের তত্ত্বাবধানে ১০০৪ হিজরীতে (১৫৯৫-৯৬) নির্মিত হল।

এর থেকে মনে হয় রওজাটি যে বৎসর ফয়জী ইন্তেকাল করেন সেই বৎসরই নির্মিত হয়। আগেই বলা হয়েছে, শেখ মোবারক ১৫৯৩ সালে মারা যান। কিন্তু শেখ মোবারক ও ফয়জীকে আগ্রার বিপরীত দিকে যমুনার বাম তীরে যেখানে শেখ মোবারক ১৫৫১ সালে প্রথম স্থায়ী বসবাস স্থাপন করেছিলেন সেখানে কবর দেয়া হয়েছিল বলে মনে হয় ; কারণ আবুল ফজল আইনে[৩১] আগ্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "নদীর অপর পারে ফিরদৌস মাকানী (সম্রাট বাবর) কর্তৃক নির্মিত চারবাগ গ্রাম। গ্রন্থকার সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তাঁর পিতা ও ভ্রাতার চির-বিশ্রাম-স্থান। শেখ আলাউদ্দীন মাজযুব, মীর রফিউদ্দীন মাফাতী এবং অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিদেরও ওখানেই সমাহিত করা হয়েছে", যদিও আবুল ফজলের ফলকলিপি থেকে মনে হয় যে এঁদের দেহ যমুনার অপর পারে অপসারণ করাই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা যে করা হয়েছিল এরূপ কোন তথ্য আমাদের জানা নাই। তবে এটা অত্যন্ত পরিতাপের কথা যে রওজাটাকে বিক্রি করে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

আবুল ফজলের পুত্র হচ্ছেন খ্যাতনামা শেখ আবদুর রহমান আফজাল খান তিনি ৯৭৯ হিজরীর ১২৮ শাবান জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতামহ সুন্নী প্রথায় আবদুর রহমান নামকরণ করেন। আকবরের রাজত্বের ৩৫ বৎসরে তাঁর বয়স যখন বিশ বৎসর তখন আকবর সাদত ইয়ার কোকার ভ্রাতৃষ্পুত্রীর সাথে তাঁর বিবাহ দেন। আবদুর রহমানের একটি পুত্র হয় এবং সম্রাট আকবর তাঁর নামকরণ করেন বিশোতান।[৩২]

আবুল ফজল যখন দাক্ষিণাত্যের সেনাপতি ছিলেন, আবদুর রহমান তখন ফারসি প্রবচনের ভাষায়, 'তীর-ই, রু-ই তারকাশ-ই-উ, অর্থাৎ হাতে জ্যা-বন্ধ তীর-ধনুক নিয়ে প্রস্তুত পুরুষ। অন্যরা যে কাজে ভয় পেত, তিনি সে কাজ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সাহসের সাথে সম্পন্ন করতেন। তিনি বিশেষভাবে তেলেঙ্গানাতে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। রাজত্বের ৪৬ বৎসরে মালিক আমীর যখন আলী মর্দান বাহাদুরকে বন্দী করেন এবং সে স্থান দখল করেন, আবুল ফজল তখন শত্রুদের বিরুদ্ধে আবদুর রহমান ও শের খাজাকে প্রেরণ করেন। তাঁরা নান্দারের নিকটে গোদাবরী অতিক্রম করেন এবং মানজারাতে আম্বরকে পরাজিত করেন।

আবদুর রহমানের পিতার প্রতি জাহাঙ্গীরের যে ঘৃণা ছিল পুত্রকে তিনি তা থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে দু'হাজার ঘোড়সওয়ারের সেনাপতি নিযুক্ত করে আফজাল খান

---

৩১. মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এ ব্যাপারে এবং লাভলী বেগম প্রসঙ্গে Keen's Agra Guide, p. 47 দ্রষ্টব্য। হিন্দুস্তানী ভাষায় "লাভলী" শব্দের অর্থ প্রিয়।

৩২. ফিরদৌসির শাহনামাতে ইসফানদিয়ারের ভ্রাতার নাম ছিল বিশোতান এবং শাহনামায় বহু স্থানে এই নাম উল্লিখিত হয়েছে।

উপাধি দেন এবং তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ইসলাম খানের (আবুল ফজলের ভগ্নিপতি) পরিবর্তে তাঁকে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন। ইসলাম খানকে বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়। আবদুর রহমান জায়গীর স্বরূপ গোরখপুরও পান। বিহারের সুবাদার হিসেবে তাঁর রাজধানী ছিল পাটনাতে। একবার পাটনা থেকে তার অনুপস্থিতির সময় কুতুবদ্দীন নামে এক দরবেশ ভোজপুর জেলায় উপস্থিত হন। এই জেলাটা সেসময় গোলযোগকারী উজ্জয়িনীর রাজাদের দখলে ছিল। তিনি নিজেকে রাজপুত্র খসরু বলে প্রচার করেন। এই সময় রাজপুত্র খসরু বিদ্রোহ করার ও জাহাঙ্গীর তাঁকে বন্দী করার ফলে তিনি জনসাধারণের প্রিয় হয়েছিলেন। এই ব্যক্তি বহু অনুচর সংগ্রহ করেন এবং পাটনা আক্রমণ করেন। আবদুর রহমানের কর্মচারী শেখ বানারসী ও গিয়াসের কাপুরুষতার ফলে তিনি দুর্গ দখল করেন এবং আবদুর রহমানের সম্পত্তি ও সম্রাটের রাজকোষ লুট করেন। এই বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে আবদুর রহমান অবিলম্বে গোরখপুর থেকে ফিরে আসেন। কুতুব পাটনা সুরক্ষিত করে পুন: পুন: নদীর তীরে সৈন্য সমাবেশ করেন। আবদুর রহমান কালবিলম্ব না করে তাঁকে আক্রমণ করেন এবং স্বল্পকালের মধ্যেই পরাজিত করেন। কুতুব তখন দুর্গের দিকে পশ্চাদপসরণ করেন কিন্তু আবদুর রহমান তাঁকে অনুসরণ করে বন্দী করতে সক্ষম হন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হত্যা করে তাঁর মাথা দরবারে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁর ভীতু কর্মচারী দুজনকেও এই সাথে দরবারে পাঠিয়ে দেন। জাহাঙ্গীর সব সময় অতি সূক্ষ্ম শাস্তি দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তাঁদের মাথা মুড়িয়ে মুখে মেয়েদের ঘোমটা পরিয়ে দেন ; তারপর তাদের গাধার সাথে বেঁধে লেজের দিকে মুখ করে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরান যাতে অন্যরা হুঁশিয়ার হতে পারে।

এর অল্পদিন পরেই আবদুর রহমান অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি দরবারে প্রত্যাগমন করেন। সেখানে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। দরবারে কিছুকাল থাকার পর জাহাঙ্গীরের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে (১০২২ হিজরী) বা তাঁর পিতার হত্যার এগার বৎসর পর ফোঁড়ার প্রকোপে ইন্তেকাল করেন।

আবদুর রহমানের পুত্র বিশোতান

৯৯৯ হিজরীর ৩রা জিল্‌কাদ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের চতুর্দশ বৎসরে তিনি সাত শত সেনানীর সেনাপতি ছিলেন, তার মধ্যে তিন শত ঘোড়সওয়ার ছিল। শাহজাহানের রাজত্বের দশম বর্ষে তাঁকে পাঁচশত ঘোড়সওয়ারের সেনাপতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পদে থাকা অবস্থায়ই শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবুল ফজলের ভূমিকা

আল্লাহু আকবর

হে প্রভু তোমার রহস্য চির আচ্ছন্ন
তোমার পূর্ণতার নেই কোনো প্রারম্ভ
শুরু ও শেষ দুইই তোমার মধ্যে লীন
তোমার এই অনন্ত বিশ্বে তার নেই কোনো চিহ্ন
আমার কথা ভীরু, আমার জিহ্বা হয়েছে পাথর
আমার পদযুগল অনড়, কিন্তু অনাদি এই বিশ্ব।
আমার ভাব গেছে হারিয়ে ; কিন্তু এই তোমার শ্রেষ্ঠ প্রশান্তি।
শুধু ভূমানন্দে আমি তোমাকে দেখি মুখোমুখি।

সত্যিকারের জ্ঞানী লোকের পক্ষে শুধু বাক্যেই নয়, কার্যেও আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত এবং তার হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়ে সৃষ্টিকর্তার আশ্চর্য গুণাবলীর বর্ণনা লেখার দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী হওয়া উচিত। হয়তো সম্রাটের গৌরবচ্ছটা তার প্রতি বিকীর্ণ হবে এবং তারই আলোতে যে সমুদ্র করতে সক্ষম হবে। এইভাবে সে চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হবে এবং কথা ও কাজের এই নিয়ম জগৎকে রসসিক্ত করে তুলতে পারবে।

আমি মুবারকের পুত্র আবুল ফজল সম্রাটের প্রশংসা গান গেয়েই আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আর তাঁর অক্ষয় কীর্তির মুক্তাসমূহ বর্ণনার সূত্রে গেঁথে দিচ্ছি। কিন্তু এই অসাধারণ যে মানুষটি[৩৩] আমাদের এই পৃথিবীকে নতুন রূপ দিয়েছেন এবং যিনি আল্লাহর মহান সৃষ্টির ভূষণ তাঁর গৌরবময় কার্যাবলী ও মহৎ গুণাবলীর সাথে মানবজাতিকে প্রথমবারের মতো পরিচিত করানোই আমার উদ্দেশ্য নয়। সবাই যা জানেন আমার পক্ষে তার বিবরণ দেয়া নিষ্প্রয়োজন। যদি তা দিই তাহলে আমি পণ্ডিতদের উপহাসের পাত্র হব মাত্র। শুধু তাঁর সম্বন্ধে আমার যে ব্যক্তিগত জ্ঞান, যাকে আমি জগতের বাজারে প্রেরণ করব। আর নিজেকে এ কাজে নিয়োজিত করতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্ব অনুভব করছি। কিন্তু শুধু আত্মপ্রশংসার জন্যেই আমি এই কঠিন কাজে হাত দেইনি। এ কাজ এত কঠিন যে স্বর্গের ফেরেশতাদের পক্ষেও তা সহজসাধ্য নয়। তাই এমন প্রয়াস শুধু আমার অক্ষমতা ও অদূরদর্শিতারই পরিচয় দেবে। এই গ্রন্থ লেখার আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যাঁরা এই

---

৩৩. আকবর

গৌরবময় শতাব্দীর প্রতি আগ্রহশীল, তাঁদেরকে যিনি এই জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বর্গীয় ও পার্থিব ব্যাপার সহজেই বুঝাতে পারেন তাঁর গভীর জ্ঞান ; আর দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে এক মহান উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া। কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করা জীবনের ভূষণ ও শেষ যাত্রার পাথেয়। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ দ্বন্দ্বময় পৃথিবীর যেখানে মানুষের প্রকৃতির সামঞ্জস্য নেই, যেখানে আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, যেখানে সত্যিকার পথ নির্দেশকের একান্ত অভাব, সেখানে তাঁরা এই জ্ঞানের আধারের সাহায্য নিয়ে অভিজ্ঞতা ও কার্যের সীমাহীন অসংলগ্নতা থেকে রেহাই পেতে পারবেন। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি মহান সম্রাটের আইন–কানুন ও বিধি–ব্যবস্থাসমূহ লিপিবদ্ধ করছি, যাতে সকলের জন্যে একটা আদর্শ জ্ঞান ভাণ্ডার রেখে যেতে পারি। এই কাজ করতে গিয়ে আমাকে অবশ্যই একদিকে সম্রাটের উচ্চাসন সম্পর্কে এবং অন্যদিকে তার সাহায্যকারী অধঃস্তনদের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে হবে।

আল্লাহ চোখে রাজমর্যাদার চেয়ে উচ্চমর্যাদা আর কিছুই নেই ; এবং যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা এই কল্যাণকর ঝর্ণাধারার বারি পান করেন। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল, রাজপদ বিদ্রোহপ্রবণতার প্রতিষেধক এবং এরই জন্যে প্রজাগণ অনুগত হয়। এমনকি বাদশাহ শব্দটির অর্থ এই কথাই বোঝায় ; কারণ বাদ শব্দে বোঝায় স্থায়িত্ব ও অধিকার আর শাহ্ বলতে উৎপত্তি, প্রভু। ফলে রাজা স্থায়িত্ব ও অধিকারের মূল। রাজপদ না থাকলে কখনও দ্বন্দ্ব বিশৃঙ্খলার অবসান হত না বা স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হত না। মানবজাতি আইনশৃঙ্খলা হীনতা ও মোহ–প্রবৃত্তির চাপে পড়ে ধ্বংসের পথে নেমে যেত আর এই জগৎ এই সুবৃহৎ পণ্যশালা, সম্পদহীন হয়ে পড়ত এবং গোটা পৃথিবী ধূসর মরুভূমিতে পরিণত হত। কিন্তু সম্রাটের ন্যায়দণ্ডের ছত্রছায়ায় অনেকেই সানন্দে আদেশ পালন করে চলে, আবার অনেকে শাস্তির ভয়ে দ্বন্দ্ব কলহ থেকে দূরে থাকে এবং বাধ্য হয়ে সততার পথ অনুসরণ করে চলে। তাছাড়া শাহ্ নাম তাদেরও দেয়া হয়। যারা অন্যান্যদের অতিক্রম করে যায়, যেমন শাহ্ সাওয়ার, শাহ্ রাহ্ ইত্যাদি শব্দ থেকেই বোঝা যায়। আবার এই শব্দ বিয়ের বরদের জন্যও ব্যবহার করা হয় যেন পৃথিবী কনে হয়ে নিজেকে রাজার হাতে সমর্পণ করে ও তার বন্দনা করে।

বোকা ও অদূরদর্শী লোকেরা সত্যিকারের রাজা ও স্বার্থপর পালনকর্তার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এই পার্থক্য খুব প্রকট হয় না যেহেতু উভয়েই বড় রাজকোষ, বিরাট সেনাবাহিনী, বুদ্ধিমান কর্মচারী, অনুগত প্রজা, প্রচুর জ্ঞানী লোক, অসংখ্য দক্ষ কারিগর এবং অঢেল ভোগ সামগ্রী থাকে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা এর মধ্যেই দুয়ের পার্থক্য ধরতে পারে। প্রথমজনের বেলায় উপরে যে সব বিবরণ দেয়া হয়েছে সেগুলো স্থায়ী হয়, কিন্তু দ্বিতীয়ের বেলায় সেগুলো হয় সাময়িক। প্রথমোক্ত জন এ সবের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে না, কারণ তার উদ্দেশ্য অত্যাচার উৎপীড়নের অবসান করা এবং যা কিছু ভাল ও মঙ্গলজনক তার ব্যবস্থা করা। তারই পরিণাম নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধতা, ন্যায়পরায়ণতা, নম্র ব্যবহার, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা ও আন্তরিকতার বৃদ্ধি ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় জন অহংকার, মানুষের দাসত্ব আর ভোগের মোহ ইত্যাদি রাজকীয় ক্ষমতার বাহ্যিক আড়ম্বরে মগ্ন হয়ে পড়ে ; ফলে সর্বত্রই দেখা যায় নিরাপত্তার অভাব, অস্বাচ্ছন্দ, দ্বন্দ্ব, উৎপীড়ন, অবিশ্বাস ও দস্যুতা।

রাজমর্যাদা আল্লাহ নূর এবং পৃথিবী উজ্জ্বলকারী সূর্যের কিরণ[৩৪] আদর্শের পুস্তকের যুক্তি এবং যাবতীয় গুণের আধার। আধুনিক ভাষায় এ আলোকের নাম 'ফার-ই-ইজিদী' বা ঐশ্বরিক আলো আর আগেকার দিনে এর নাম ছিল 'কিরাণ খুরা' বা মহান জ্যোতির্মণ্ডল। এটা আল্লাহ কারো মধ্যবর্তী সহায়তা ছাড়াই নৃপতিদের উদ্দেশ্য ভক্তিতে মাথা নত করে। তাছাড়া এই আলোর অধিকারী হলে বহু অনবদ্য গুণ উৎসৃষ্ট হয়।

১. প্রজাদের প্রতি বাৎসল্য। হাজার হাজার লোক রাজার ভালবাসায় আশ্রয় পায় ; এবং গোষ্ঠীগত বিভেদের দ্বন্দ্ব মাথা তুলতে পারে না। সম্রাট তাঁর বিচার বুদ্ধি দিয়ে যুগের ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করবেন এবং তদনুযায়ী তাঁর নীতি নির্ধারণ করবেন।

২. উদার হৃদয়। কোনো কিছু তাঁর মনঃপুত না হলে তিনি তাতে বিচলিত হবেন না ; অথবা পার্থক্যের অভাব হলে তিনি হতাশ হবেন না। তখন তাঁর হৃদয় সাহসে উদ্বুদ্ধ হবে। তাঁর স্বর্গীয় দৃঢ়তা তাঁকে প্রতিশোধের ক্ষমতা দেয়, কোনো অন্যায়কারীর উচ্চপদও বাদ সাধতে পারে না। তিনি বড়ছোট সকলেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন এবং তাঁর হাতে সকলের দাবিই অচিরে পূর্ণ হয়।

৩. আল্লাহ প্রতিনিয়ত বর্তমানে বিশ্বাস। তিনি যখন কোনো কাজ করেন তখন তিনি আল্লাহকে তার প্রকৃত কর্তা বলে মনে করেন (এবং নিজের মাধ্যমে মাত্র)। ফলে উদ্দেশ্যের দ্বন্দ্ব কোনো বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে না।

৪. প্রার্থনা ও নিষ্ঠা : পরিকল্পনার সাফল্য তাঁকে কোনো কিছু উপেক্ষা করতে দেবে না। আবার প্রতিকূল অবস্থায় তিনি আল্লাহকে বিস্মৃত হবেন না এবং মানুষ আত্যন্তিক বিশ্বাস ন্যাস্ত করবেন না। তিনি যুক্তি দিয়ে আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রিত করেন ; তাঁর ইচ্ছার ব্যাপক পরিধি সত্ত্বেও তিনি অস্থির হন না, অথবা অন্যায় কাজের পিছনে মূল্যবান সময় নষ্ট করেন না। ক্রোধকে তিনি যুক্তি দিয়ে বশ করেন, যাতে অন্ধ রোশ প্রাধান্য না পেতে পারে এবং যাতে অবিবেচনা সীমা লঙ্ঘন না করে যায়। তিনি ন্যায়ের মহান আসনে অধিষ্ঠিত। ফলে যাঁরা ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তাঁদের পক্ষে জনসাধারণের কাছে তাঁদের দুষ্কর্ম প্রকাশ হওয়ার আগেই ফিরে আসা সম্ভব হয়। তিনি যখন বিচারাসনে বসেন তখন তাঁর কোমল স্বভাবের জন্যে আবেদনকারীকেই মনে হয় বিচারকর্তা আর তাঁকে মনে হয় বিচারপ্রার্থী ; তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসভাজনদের মঙ্গলের জন্যে চেষ্টা করেন, কিন্তু অবোধদের কখনও খুশি করতে চেষ্টা করেন না। তিনি সর্বদা সত্যবাদীদের সন্ধান করেন এবং সত্য কথা অপ্রিয় হলেও তিনি কখনো অসন্তুষ্ট হন না, কারণ তিনি জানেন প্রকৃতপক্ষে এটাই মধুর। তিনি কথার রকম ও বক্তার পদ বিচার করেন। তিনি বল প্রয়োগ না করেই তুষ্ট থাকেন না, তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন যাতে তাঁর সাম্রাজ্যে কোনো অবিচার না হতে পারে।

---

৩৪. আকবর সূর্যকে আল্লাহ লক্ষ্যগোচর প্রতিনিধি হিসাবে ও জীবনের অব্যবহিত উৎস হিসাবে পূজা করতেন। তাঁর উপাসনারীতি সম্পর্কে পরে দ্রষ্টব্য।

তিনি সর্বদা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং তা সুস্থ রাখার জন্যে তিনি কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং যেভাবে প্রাণীর দেহে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সমতার ফলে তার দেহ সুস্থ থাকে,[৩৫] তেমনি দেশের রাজনৈতিক সুস্থতাও নির্ভর করে বিভিন্ন সামরিক পদাধিকারী লোকের ভারসাম্যর উপর এবং ঐক্য ও মতের মিলের আলোকবর্তিকার তাপে বহু লোক একসাথে মিশে যায়।

পৃথিবীর লোকদের চারভাগে ভাগ করা যায় :

১. যোদ্ধা দেশের মধ্যে যাদের রূপ হল অগ্নির মতো। তাদের দাহশক্তি যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিদ্রোহ ও কলহ দ্বন্দ্বের মতো খড় ও আবর্জনা পুড়িয়ে ছাই করে দেয় এবং এই বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে শান্তির আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করে।

২. কারিগর ও ব্যবসায়ী : তারা বাতাসের মতো। তাদের শ্রম ও ভ্রমণের ফলে আল্লাহর নেয়ামত সর্বত্র পৌঁছে এবং জীবন কুসুম বৃক্ষে সন্তোষ বারি সঞ্চার হয়।

৩. পণ্ডিতগণ যেমন দার্শনিক, চিকিৎসক, পাটিগণিতের পণ্ডিত, জ্যামিতির পণ্ডিত, জ্যোতির্বিদ, তারা পানির মতো। তাদের কলম ও জ্ঞান থেকে এই শুষ্ক পৃথিবীতে প্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং এই মানব বাগানে বারিসিঞ্চন দ্বারা প্রাণস্পর্শ জাগায়।

৪. কৃষক ও শ্রমিক যাদের মাটির সাথে তুলনা করা যায়। তাদের শ্রম দ্বারাই জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং তাদের কাজ থেকেই শক্তি ও সুখের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং এদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধিকারের গণ্ডির মধ্যে এবং নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতার সাথে অন্যের প্রতি সহানুভূতি মিশিয়ে পৃথিবীতে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ আনয়ন করাই যে কোনো সম্রাটের কর্তব্য।

উল্লিখিত চারটি শ্রেণীর জনসাধারণ তার ভারসাম্য রক্ষা করে, সম্রাটও তাঁর ভারসাম্য রক্ষা করেন তেমনি চারটি শ্রেণীর দ্বারা।

১. রাজ্যের আমীরগণ যারা তাদের পদের প্রতি আনুগত্যে সব কিছুকেই পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা নিজের জীবনের পরোয়া না করে, তাদের আনুগত্যের দ্বারা উজ্জ্বল করে তোলে। এই সৌভাগ্যশালী সভাসদগণ আগুনের মতো, তারা আনুগত্যে উত্তপ্ত কিন্তু শত্রুদের বেলায় নির্মম। এই শ্রেণীর পুরাভাগে হল উকিল, যিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা চার স্তরের পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন,[৩৬] তিনি হলেন সাম্রাজ্যের ও সম্রাটের গৃহস্থালীর সব ব্যাপারেই সম্রাটের প্রতিনিধি। তিনি তার জ্ঞান দ্বারা মন্ত্রিসভাকে পরিচালিত করেন এবং অত্যন্ত বিচার বিবেচনার সাথে সম্রাটের জটিল বিষয়সমূহ সম্পন্ন করেন। ফলে এ কাজের জন্য অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোকের যিনি হবেন জ্ঞানী, মহৎ, অমায়িক, দৃঢ়চেতা, উদারচেতা,

---

৩৫. মধ্যেযুগীয় ডাক্তারী শাস্ত্র মতে।

৩৬. আকবর বলতেন যে পরিপূর্ণ আনুগত্য থাকতে হলে চারটি জিনিস ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকে হবে : জান, মাল, দীন, নামুছ বা ব্যক্তিগত মানসম্মান।

যিনি সবার সাথেই তাল রেখে চলতে পারবেন, যিনি হবেন সরল, আত্মীয় ও অনাত্মীয়, বন্ধু ও শত্রুর প্রতি সমান, তিনি সংযত বাক, কাজে কুশলী, উচ্চবংশসম্ভূত, সম্মানীয়, বিশ্বাসী বলে খ্যাত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদর্শী, রাজসভার আচার ব্যবহারের সাথে পরিচিত। সাম্রাজ্যের গুপ্ত ব্যাপারসমূহের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত। অবিলম্বে কার্য সম্পাদনে তৎপর এবং বিভিন্ন রকমের কার্যে অবিচলিত। তিনি অন্যের ইচ্ছা পূর্ণ করা নিজের কর্তব্য বলে মনে করবেন, এবং বিভিন্ন স্তরের লোকের প্রতি সমীহ করে তার কাজের ভিত্তি স্থাপন করবেন ও সবার হৃদয় জয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে অধীনস্থ লোকদেরও সম্মানের চোখে দেখবেন। তিনি কথাবর্তায় বেসামাল না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং অন্যদের কাজ করা থেকে সাবধান থাকবেন। অর্থ সম্বন্ধীয় অফিসগুলো তার অধীনে না হলেও তিনি সে সব অফিসের প্রধানদের কাছ থেকে লিখিত হিসাব পান তার সারমর্ম লিখে রাখেন। মীর মাল,[৩৭] মিল রক্ষক, মীর বকসী,[৩৮] বারবেগী,[৩৯] কুরবেগী,[৪০] মীর তোজাক,[৪১] মীর বহর,[৪২] মীর বার,[৪৩] মীর মান্জুল,[৪৪] খোয়ার সালার,[৪৫] মুন্সী[৪৬] কুশবেগী,[৪৭] আখতাবেগী,[৪৮] ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। এদের প্রত্যেককেই অন্যান্যদের কাজ সম্বন্ধে অবহিত থাকার প্রয়োজন।

২. জয়ে সাহায্যকারীগণ, কালেক্টরগণ ও যারা আয়-ব্যয়ের ভারপ্রাপ্ত, তারা বায়ুর মতো, কখনও হৃদয় স্নিগ্ধকারী দক্ষিণ হাওয়া, আবার কখনও বা প্রখর উষ্ণ মহামারীর মতো। তাদের পুরোভাগে হলেন উজির, তিনি দেওয়ান নামেও পরিচিত। তিনি অর্থনৈতিক ব্যাপারে সম্রাটের প্রতিনিধি, সম্রাটের টাকশাল তদারক করেন এবং সমস্ত হিসাবপত্র পরীক্ষা করেন। তিনি সম্রাটের রাজস্ব সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন এবং সমস্ত অনাবাদী ভূমি চাষ করান। তাঁকে পবিত্র ধর্মের সভ্য ও চতুর গণিতজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। আর তাঁর পক্ষে খেয়ালি না হওয়া, সতর্ক, হৃদয়বান, সংযমী, কার্যক্ষম, অমায়িক, লেখায় সরস, সত্যবাদী, সৎ সৌজন্যশীল ও কার্যে আগ্রহশীল হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন হিসাবরক্ষক। মোস্তফী যা না বুঝতে পারেন, তিনি তা বুঝিয়ে দেন, আর তিনি নিজেও না বুঝতে পারলে উকিলের কাছ থেকে বুঝে নেন। মোস্তফী, শাহের-ই তৌজী—অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর হিসাবরক্ষক,

---

৩৭. সম্ভবত তিনি সম্রাটের ব্যক্তিগত টাকা পয়সার রক্ষক।
৩৮. রাজসভার খাজাঞ্চী।
৩৯. যিনি রাজসভার লোকজন হাজির করেন ও তাদের দরখাস্ত পেশ করেন, তিনি মীর আরজ নামেও পরিচিত।
৪০. রাজকীয় পরিচয়বৃন্দের বাহক।
৪১. উৎসবাদির আয়োজনকারী।
৪২. নৌবাহিনীর প্রধান বা এডমিরাল।
৪৩. সম্রাটের বন বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেন্ট।
৪৪. রাজসভার কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল।
৪৫. প্রাইভেট সেক্রেটারী।
৪৬. পক্ষীশালার সুপারিনটেন্ট।
৪৭. অশ্বশালার সুপারিনটেন্ট।
৪৮. সহকারী দেওয়ান।

আওয়ারজা নবীশ অর্থাৎ রাজসভায় দৈনন্দিন খরচের হিসাবরক্ষক, মীর সামান বা রাজসভায় আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসের তত্ত্বাবধায়ক, নাজির-ই বুয়োতাত অর্থাৎ সম্রাটের কারখানাসমূহের তত্ত্বাবধায়ক, দেওয়ান-ই বুয়োতাত সম্রাটের কারখানাসমূহের হিসাবরক্ষক টাকশালের মুশরিক বা কেরানী, ওয়াফিসা নবীশ ও সাম্রাজ্যের আমীন তারা তাঁর আদেশ পালন করে এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চলে।

কোনো কোনো রাজপুত্র মনে করতেন যে উজির পদটা উকিল পদেরই অংশ এবং সাম্রাজ্য এই দুই পদের যোগ্য লোকের সন্ধান করে। কিন্তু তারা সব সময় উকিল পদের উপযুক্ত লোক পান না।

তখন সে পদের কিছু যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে মুসরিফ-ই দেওয়ান পদে নিয়োগ করেন, এ পদটা দেওয়ান পদের উপরে কিন্তু উকিলের নিচে।

৩. সম্রাটের সহচরগণ যাঁরা তাঁদের জ্ঞানের রশ্মি দিয়ে, তাঁদের তীক্ষ্ণদৃষ্টির আলো দিয়ে, কালের সম্যক উপলব্ধি দিয়ে, মানব মনের বিচিত্রতা সম্বন্ধে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আন্তরিকতা এবং অমায়িক কথাবার্তা দিয়ে রাজদরবার অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁদের ধর্ম বিশ্বাস ও আন্তরিকতার চরম উৎকর্ষ সাধন দ্বারা তাঁরা জগতের পাণ্যশালায় সৎগুণের পসারী খুলেছেন। জগতের যুদ্ধশালায় উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জ্ঞানের নিগড়ে বেঁধে তাঁরা তাঁদের জ্ঞানের বারিধারা দ্বারা ক্রোধের অগ্নিশিখা নির্বাপিত করেন। তাই তাঁরা সাম্রাজ্যের কার্যাবলীতে পানির মতো কাজ করেন। তাঁরা যখন নরম মেজাজে থাকেন তখন তাঁরা মানুষের হৃদয়ের ক্লেশ দূর করেন এবং জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে সজীবতা আনয়ন করেন ; কিন্তু তাঁরা যদি এই ভাব থেকে বিচ্যুত হন তাহলে তাঁরা পৃথিবীকে দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন করে দেন, যাতে বহু লোক দুর্ভাগ্যের বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই শ্রেণীর পুরোভাগে হলেন দার্শনিক, যিনি তাঁর জ্ঞান ও কার্যাবলী দ্বারা জাতির নৈতিক উন্নতি সাধন করেন এবং মানবজাতির কল্যাণকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে প্রস্তুত হন। সদর,[৪৯] মীর আদিল, কাজী,[৫০] চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ, কবি গণৎকার ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত।

৪. ভৃত্যগণ যারা রাজসভায় সম্রাটের পরিচর্যা করে। সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় তারা হল মাটির মতো তাই তারা আনুগত্যের উচ্চ পথে সম্রাটের পদতলে ধুলোর মতো। ময়লা ও আবর্জনা বর্জিত হলে তারা শরীরে জীবনীশক্তির মতো কাজ করে। আর তা না হলে কৃতকার্যতার সুখে তারা ময়লা আবর্জনার মতো। টেবিল ভৃত্য, বর্মবাহক, শরবৎ ও পানির তত্ত্বাবধায়ক ভৃত্য, মাদুর ও পোশাক পরিচ্ছদের তত্ত্বাবধায়ক এই শ্রেণীভুক্ত।

সৌভাগ্যক্রমে প্রদত্ত গুণাবলীসম্পন্ন চাকর যদি সম্রাটের পরিচর্যা করে তাহলে কখনও কখনও এমন সমঝোতা হয় যেন আনুকূল্যের বাগান থেকে এক তোড়া সুগন্ধি ফুল সুবাস ছড়াচ্ছে।

---

৪৯. তিনি সদর-ই জাহান বলেও পরিচিত। তিনি সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারক ও মহাতত্ত্বাবধায়ক।

৫০. কাজী বিচার করেন ; মীর আদল শাস্তি দেন।

সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ যেমন উপরের চার শ্রেণীর সাফল্যজনক কার্যের উপর নির্ভর করে, তেমনি সাম্রাজ্যের ভালমন্দ নির্ভর করে শেষোক্ত চার শ্রেণীর সুষ্ঠু ব্যবস্থার উপর।

প্রাচীন কালের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলে গেছেন যে নিম্নলিখিত চার ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রধান নির্ভর :

১. একজন ন্যায়পরায়ণ কালেক্টর, যিনি কৃষকদের রক্ষা করেন, প্রজাদের উপর নজর রাখেন, দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন এবং কর বৃদ্ধি করেন।

২. একজন বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন কর্মঠ ও কঠোর সেনাপতি।

৩. একজন প্রধান বিচারক যিনি খামখেয়ালি স্বার্থপরায়ণ হবেন না, যিনি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হবেন, যিনি নানা রকম প্রশ্ন করে সত্য উদ্ধার করবেন, শুধু সাক্ষীদের জবানবন্দীর উপরই নির্ভর করবেন না।

৪. একজন সংবাদজ্ঞাপক যিনি কোনো রূপ অতিরঞ্জিত না করে বা বাদ না দিয়ে সঠিক সময় সত্য ও সঠিক সংবাদের প্রতি নজর রাখবেন।

ন্যায়পরায়ণ রাজাদের পক্ষে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারের মানুষ যাদের দ্বারা পৃথিবী গঠিত, তাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া ও সে মতে কাজ করা একান্ত কর্তব্য।

১. পণ্ডিত ব্যক্তি হলেন সবচেয়ে প্রশংসনীয় যিনি বুদ্ধিমানের মতো যা কিছু উচিত ও যা একান্ত প্রয়োজন শুধু তাই করেন। তার গুণাবলীর ঝর্ণাধারা শুধু তাকেই অনুপ্রাণিত করে না, অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও উর্বর করে। রাজার পক্ষে সাম্রাজ্যের ব্যাপারে পরামর্শ নেবার এরূপ লোকই সবচেয়ে উপযুক্ত। এর পরে আসে সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত লোক। এর সদগুণের স্রোতধারা কুল ছাড়িয়ে যায় না। ফলে তা অন্যের বিরক্তি উৎপাদনও করে না। যদিও তাকে দয়া ও সম্মান দেখান উচিত, কিন্তু তার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না। এর পরে আগে তৃতীয় ব্যক্তি সরল মানুষ, যার কার্যাবলীতে প্রকৃষ্টতার ছাপ না থাকলেও তার গায়ে বদ কাজের গন্ধ নেই। তিনি উচ্চ প্রশংসার উপযুক্ত নন ; কিন্তু তাকে সহজ জীবন নির্বাহ করতে দেয়া উচিত। এর চেয়ে খারাপ হল চতুর্থ ধরনের অবিবেচক লোক যিনি অন্যের অপকার না করেও নিজের গৃহকে দুষ্কর্মের আধার করে রাখেন। রাজার পক্ষে তাকে নিরাশ আধারে রাখাই সঙ্গত এবং তাকে সৎ উপদেশ ও ভর্ৎসনা দ্বারা সৎ পথে আনয়ন করা উচিত।

সবশেষে হল দুষ্টলোক, যার দুষ্কর্ম অন্যদের আতঙ্কিত করে তোলে এবং সে সব বদ কাজের ফলে সর্বত্র শোকের ছায়া পড়ে। উক্ত শ্রেণীর লোকের প্রতি প্রযুক্ত সংশোধনী দ্বারা এর কোনো রূপ উন্নতি না হয় তাহলে সম্রাটের উচিত কুষ্ঠ রোগীর মতো তাকে সমাজ থেকে স্বতন্ত্র করে রাখা। কিন্তু এই কঠোর সাজাও যদি তাকে সংশোধন না করতে পারে তাহলে তাকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করে দিয়ে শোকের বেদনা ভোগ করতে দেয়া উচিত ; আর এতেও কাজ না হলে তাকে সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসন দেয়া উচিত ; আর যদি এতেও তার সদগুণ না জাগে তা হলে তার অসৎ কাজের অঙ্গগুলো নষ্ট করে দেয়া উচিত যেমন চোখ, হাত ও পা ইত্যাদি। কিন্তু সম্রাটের পক্ষে একেবারে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত নয়। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন যে মানুষের দেহ আল্লাহর তৈরি বেদী, তা বিনষ্ট করা উচিত নয়।

ন্যায়বান রাজাদের পক্ষে মানুষের শ্রেণী ও তাদের স্বভাব সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে সেভাবে কার্য পরিচালনা করা বিধেয়। এই জন্যেই প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণ বলে গেছেন যে জ্ঞানে মণি ভূষিত রাজপুত্রগণ যে কোনো নিচ জাতির লোককে চাকুরিতে নেন না আর যাদের চাকুরি দেন তাদের সকলকেই প্রতিদিন তার সম্মুখে আসার যোগ্য মনে করেন না ; আর সম্মুখে আসার যোগ্য বলেই তারা সম্রাটের সাথে আলাপ-আলোচনা করার যোগ্য বলে মনে করেন না। আর এর যোগ্য বলেই তারা সম্রাটকে ঘনিষ্টভাবে সম্বোধন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হন না। আবার যারা এই সুবিধা পেয়েছেন বলেই সম্রাটের সাথে আসন গ্রহণ করার যোগ্য নন, আর এ যোগ্যতা যাদের আছে তারাই সম্রাটের মন্ত্রীসভার সভ্য হবার যোগ্য নয়। আল্লাহ্ প্রশংসনীয়, তিনি সব কিছুর মালিক। আমাদের সময়ের মহান সম্রাট এ সব প্রশংসনীয় গুণাবলীতে ভূষিত যে তাকে এ সবের ভূমিকা বলা অতিরঞ্জিত হবে না। তার জ্ঞানের আলোকে তিনি মানুষের মূল্য নির্ণয় করেন এবং তাদের উদ্যমের বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি কোনোরূপ প্রচেষ্টা ছাড়াই তিনি তার জ্ঞানকে কার্যে পর্যবসিত করেন। বক্তৃতা দিয়ে কি কেউ ধর্মীয় গুরু হিসেবে তার ক্ষমতার, বা তার পবিত্র কার্যাবলীর পরিমাপ করতে পারবে? আর তা বর্ণনা করা সম্ভব হলেও কেউ কি তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে? আমার পক্ষে সবচেয়ে উত্তম হবে সে সম্বন্ধে কিছুই না বলা এবং শুধু সে সব কাজের বর্ণনা দেওয়া যা তার বাইরের প্রকৃতির এবং সম্রাট হিসেবে তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেবে, সে সবের বর্ণনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা।

আমি বলব প্রথম তার গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী, দ্বিতীয় সামরিক বাহিনী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী, তৃতীয় : সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী, কারণ এই তিনটিতেই সম্রাটের কর্তব্য সীমাবদ্ধ। এই কাজ আমি বাস্তব জ্ঞানানুসন্ধানীদের জন্য একটা উপহার রেখে যাব, যা যদিও বুঝতে শক্ত বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা খুব সোজা ; বা খুব সোজা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা খুব শক্ত।

সে সব অভিজ্ঞ ব্যক্তি শাসনকার্য সম্বন্ধে অবহিত এবং পশ্চাতের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ, তাঁরা এ সব জ্ঞানগর্ভ আইনসমূহ ছাড়া বুঝতেই পারবে না কি করে পূর্বের নৃপতিগণ শাসনকার্য চালিয়ে গেছেন। অথবা এই জ্ঞান প্রস্রবণ ছাড়া তাঁরা বুঝতেই পারবে না রাজ-রাজরা কি করে সদা সর্বদা সজীব ও কর্মক্ষম থাকে।

তাই এই মহান পুস্তকটি তিন খণ্ডে লিখিত : আমি যে অনুগ্রহ পেয়েছি তা আমাকে তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিঞ্চিৎ সুযোগ দিয়েছে।

সম্রাটের গৃহস্থালী

আইন-১

গার্হস্থ্য

যিনি অন্যের সাহায্য ছাড়াই পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বস্তুকে আল্লাহর অনুগ্রহের আলোকণা দেখতে পায় তিনি অতি সমঝদার ও মহৎ চিন্তাধারার লোক। তিনি তাঁর অন্তরের ও বাইরের চরিত্র সেভাবে গঠন করেন এবং যেমন নিজেকে তেমনি অন্যকেও সমীহ করেন। এ সব গুণের যিনি অধিকারী নন তার পক্ষে এই পৃথিবীর সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করে, নীরব দর্শক হয়ে থাকাই উচিত। প্রথমোক্ত ব্যক্তি যদি আসন গ্রহণ করেন তা হলে তিনি সৎ গুণাবলীর বিকাশ সাধন করবেন ; আর যদি তার পদ অন্যের অধীনে হয় তাহলে তিনি সর্বান্তকরণে নিজের কাজ সম্পন্ন করবেন এবং নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন করবেন।

আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ব্যাপারে যারা মহৎ তারা কার্যের খুঁটিনাটি থেকে দূরে থাকে না। অপর পক্ষে তাঁরা নিজের কার্য সম্পাদনকে আল্লাহ্‌র এবাদত বলে মনে করেন।[৫১]

সব কাজ যদি তিনি নিজে না করতে পারেন, তাহলে তাঁর উচিত নিজের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বা দুজন এমন লোক নির্বাচন করা যারা হবেন জ্ঞানী, সমঝদার, ধর্মীয় গোড়ামি বর্জিত, উদ্যমশীল এবং মানব মন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, এবং তিনি তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলবেন।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাকে শুধু বৃহৎ কাজেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে এরূপ নৃপতি বলেই সম্মান করেন না : যদিও কিছু কিছু নিরপেক্ষ বিবেচক তাঁকে সেজন্যে কোনোরূপ দোষারোপ করেন না, কারণ এমন কতিপয় স্বার্থপর চাটুকার আছেন যারা ধার্মিক লোকের ভান করে প্রায়ই তাকে তার উচুঁস্থান সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে সব নৃপতি বাইরের প্রশংসার ভক্ত তাদের ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারে তাদের একমাত্র অভিপ্রায় হল রাজাকে এভাবে ঘুমে রেখে দেশের রাজস্ব লুটতরাজ করা ও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা। কিন্তু উত্তম রাজপুরুষগণ ছোট ও বড় কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। তাঁরা আল্লাহ্‌র সহায়তায় এই পৃথিবীর ভার স্কন্ধে নেন এবং পরকালের দায়িত্ব সম্বন্ধেও সজাগ থাকেন এবং এতদসত্ত্বেও তাঁরা থাকেন উদার ও স্বাধীন। যেমন আমাদের বর্তমান সম্রাট। তিনি নিজের প্রভাববলে প্রত্যেক বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকেন ; পূর্বের নৃপতিগণ

---

৫১. এ কথাটি আকবর প্রায়ই বলতেন।

এ কাজকে সম্মানহানিকর মনে করতেন, যদিও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা গঠনে এটা অপরিহার্য। শাসনকার্যে প্রত্যেক বিভাগের জন্যই তিনি নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন এবং নিজের কর্তব্য সম্পাদন দ্বারাই তিনি আল্লাহর অনুগ্রহ পেতে চান।

এই বিরাট ব্যবস্থা পরিচালনার সাফল্য দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে ; প্রথমত, উপযুক্ত বিধান প্রণয়নের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি ; দ্বিতীয়ত, সে সব বিধান যাতে ঠিকমত কার্যে পরিণত হয় তা দেখার জন্য সর্তক দৃষ্টি।

যদিও সম্রাটের গৃহস্থালীর বহু কর্মচারী সামরিক বিভাগ থেকে বেতন পায়, তা পবিত্র অব্দের ৩৯ বৎসরে এই গৃহস্থালী ব্যয়ের জন্য ৩০৯১৮৬৭৯৫ ড্রাম[৫২] দেওয়া হয়েছিল। এর ব্যয় এবং রামশ প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। প্রায় এক শতাধিক অফিস ও কারখানা আছে যাদের প্রত্যেকটি একটা শহরের অথবা ছোট ছোট রাজ্যের সমান ; এবং সম্রাটের নিয়ত সতর্ক তত্ত্বাবধানের ফলে তাদের সবগুলোই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে ও সেই অনুপাতে সম্রাটের তত্ত্বাবধানও বেড়ে যাচ্ছে।

আমি যে সব বিধানের কিছু ভবিষ্যৎ জ্ঞানপিপাসুদের জন্য উপহার হিসেবে লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি, যাতে এগুলো অন্যের উপর আলোকবর্তিকা ও জীবনীশক্তির সঞ্চার করে।

যে সব বিধান সাধারণ ধরনের এবং যেগুলো বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কার্যের তিন অংশের অন্তর্ভুক্ত সেগুলোকে আমি গৃহস্থালীর বিধানের সামিল করেছি।

---

৫২. অর্থাৎ ৭৭২৯৬১৯ $\frac{৭}{৮}$ টাকা। আকবরের ১ টাকা ছিল ৪০ দামের সমান। পবিত্র অব্দ অর্থাৎ তারিখ-ই-ইলাহী ১৫৫৬ সনের ১৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু। ফলে ৩৯ সাল হল ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দ।

আইন-২

সাম্রাজ্যের কোষাগার

জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক লোকই জানে যে আল্লার এবাদত করার প্রকৃষ্ট পথ হল সাময়িক দুঃখ-কষ্ট দূর করা ও আগে অবস্থার উন্নতি সাধন করা। এ কাজ কিন্তু নির্ভর করে কৃষিকার্যের উন্নতিবিধান, সম্রাটের গৃহস্থালীর শৃঙ্খলা রক্ষা, সাম্রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদের আগ্রহ ও সামরিক বাহিনীর নিয়মানুবর্তিতার উপর। এসব আবার নির্ভর করে সম্রাট কর্তৃক যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান, জনসাধারণের প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং সাম্রাজ্যের রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা। শহরের ও গ্রামের লোকদের প্রতি যখন যথেষ্ট যত্ন নেয়া হয় শুধু তখনই তাদের অভাব মোচন হয় ও তাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। ফলে, ন্যায়বান রাজাদের শহরবাসীদের প্রতি যত্ন নেয়া আর গ্রামবাসীদের রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। যদি কেউ বলে যে সম্পদ আহরণ তার একান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সম্পদ কামনা করা অবসরগ্রহণকারী ও নির্জনবাসী লোকেরা ঘৃণা করে। অপর পক্ষে শহরবাসীগণ ঠিক তার বিপরীত, যেহেতু তারা পরমুখাপেক্ষী। আমি শুধু এই মন্তব্য করব যে অবিবেচক লোকেরাই এরূপ ধারণা পোষণ করে মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে উভয় শ্রেণীর লোকেরাই যতদূর প্রয়োজন মনে করে ততটুকু সংগ্রহ করার চেষ্টা করে।

দরিদ্র ও মিতচারী লোকেরা নিজেদের কার্যক্ষম রাখার ও মোসুম হাওয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করার মতো উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ ও পোশাক ব্যবহার করে। অপরপক্ষে অপর শ্রেণীর লোকেরা যখন তাদের কোষাগার পূর্ণ করে, সৈন্য সংগ্রহ করে এবং তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যান্য উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করে তখনই মনে করে তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে।

সম্রাট যখন এ সব ব্যাপারে নজর দিয়ে শুরু করেন তখন তিনি ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ হয়েই রাজা সারা ইতিমাদ খানের[৫৩] কাছে নিজের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করেন। তার যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ সম্রাটই তাকে এ নামে ভূষিত করেছিলেন। খাজা সাহেবের অভিজ্ঞতার ফলে সম্রাটের চিন্তাধারা বাস্তবমুখী হয় এবং ক্রমে ক্রমে তার শ্রীবৃদ্ধি হয়ে অবশেষে তা আইনের বিধানে পরিণত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমির আয় নির্ণয় করার জন্যে অনুসন্ধানকার্য চালান হয় এবং ন্যায়পরায়ণ ও অভিজ্ঞ লোকদের চেষ্টার ফলে সাফল্যজনকভাবে শেষ হয়। কারও প্রতি কোনোরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ না করেই যে সমস্তভূমি

---

৫৩. ইতিমাদের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্যতা।

থেকে রাজস্ব আদায়ের কার্যে নিয়োগ করা হয়, প্রত্যেক এক কোটি দামের জন্যে একজন করে কর্মচারী নিযুক্ত হয়। এদের সাহায্যের জন্য সম্পূর্ণ সৎ লেখক নিয়োগ করা হয় এবং প্রত্যেকের জন্য একজন করে বুদ্ধিমান কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়। কৃষক শ্রেণীর প্রতি সম্রাটের দয়া ও অনুগ্রহের ফলে তিনি নির্দেশ দেন রাজস্ব আদায়কারীগণ যেন কৃষকদের থেকে পূর্ণ ওজনের মুদ্রা যারা রাজস্ব আদায়ে পীড়াপাড়ি না করে তারা যে কোনো মুদ্রা আনয়ন করে গ্রহণ করে। এই প্রশংসনীয় বিধানটির ফলে রাজস্ব আদায়কারীদের মন থেকে সবরকম অনিশ্চয়তা দূর হয় এবং কৃষকগণ নানারূপ উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পায় অপরদিকে সাম্রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হয় ও রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। এভাবে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা সংশোধন করে একজন উদ্যমশীল ও সৎ লোককে মহাকোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয় আর তাকে সাহায্য করার জন্যে একজন দারোগা ও একজন কেরানী নিযুক্ত করা হয়। এই বিভাগের জন্য বাঁধাধরা নিয়মের প্রবর্তন করা হয় এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা হয়। যখনই কোনো প্রাদেশিক কোষাধ্যক্ষ দুই লক্ষ দাম মুদ্রা আদায় করতেন, তখনই তাকে তা দরবারে মহাকোষাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হত আর সাথে মুদ্রাগুলোর মান নির্ধারণ করে বিবরণ পাঠাতে হতো।

পেশকার বা কর গ্রহণের জন্যে স্বতন্ত্র কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়। উত্তরাধিকারহীন সম্পত্তি নজর বা উপহার গ্রহণের জন্যে, সম্রাটের দানখয়রাতের টাকার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কোষাগার নিযুক্ত হয়। টাকা খরচের জন্যেও উপযুক্ত বিধি প্রণয়ন করা হয় ; এ কাজের জন্য সৎ তত্ত্বাবধায়ক, দারোগা ও কেরানী নিয়োগ করা হয়। বাৎসরিক খরচের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাধারণ কোষাগার থেকে বিভিন্ন খরচের কোষাধ্যক্ষের নিকট থেকে রশিদ নিয়ে তাদের কাছে দেওয়া হতো। এইভাবে হিসাবপত্র রাখার সূক্ষ্ম বিধান তৈরি হওয়ায় সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সূচনা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কোষাগারসমূহ পূর্ণ হয়ে যায়, সেনাবাহিনীর উন্নতি হয় এবং অবাধ্য বিদ্রোহীগণকে বশে আনা হয়।

ইরান এবং তুরানে মাত্র একজন কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের ফলে হিসাবপত্র অতি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু এখানে রাজস্বের পরিমাণ এত বেশি এবং কাজকর্ম এত বিভিন্ন রকমের যে টাকা রাখার জন্যে দরকার হয় বার জন কোষাধ্যক্ষের। বিভিন্ন নগদ টাকা দেওয়ার জন্যে দরকার হয় নয় জন কোষাধ্যক্ষ। আর তিনজন দরকার হয় মূল্যবান পাথর, সোনা ও মূল্যবান পাথর বসান অলঙ্কারাদি রাখার জন্যে। কোষাগারগুলোর পরিমাণ এত বেশি যে তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয় যেহেতু অনেক কিছু লেখার আছে। সম্রাট এ ব্যাপারে এত অভিজ্ঞ এবং শ্রমের পুরস্কারস্বরূপ তিনি ওগুলোর কাজের ভালমন্দ সহজেই বুঝতে পারেন এবং অনেক সময় কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন, আবার কখনও বা তিরস্কার করেন। ফলে সব কিছুই সন্তোষজনকভাবে চলছে।

সাম্রাজ্যের প্রায় একশত কারখানার জন্যেও স্বতন্ত্র কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। এগুলোতে দৈনিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক আদান–প্রদানের হিসাব রাখা হয়। ফলে পৃথিবীর এই পণ্যশালারও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে।

আবার সম্রাটের আদেশে একজন খ্যাতনামা সৎ ব্যক্তি সাধারণকে দর্শন দেবার স্থানে কিছু স্বর্ণ ও রৌপ্য রাখেন যাতে দরিদ্রদের অভাব সঙ্গে সঙ্গে দূর করা যায়। তাছাড়া সর্বদা এক কোটি দাম মুদ্রা প্রাসাদে মওজুদ রাখা হয়। আবার প্রত্যেক হাজার মুদ্রা এক একটা থলেতে রাখা হয়। এ থলেগুলো এক প্রকার কর্কশ জিনিস দিয়ে তৈরি করা হয়। এই থলেগুলোকে হিন্দিতে বলা হয় শাশা, আর যখন অনেকগুলো একত্র রাখা হয় তখন সেগুলোকে বলা হয় গনাদ। সম্রাট একজন ওমরাহের কাছে একটা মোটা রকমের অর্থ গচ্ছিত রাখেন। এর একটা অংশ থলিতে[৫৪] করে বহন করা হয়। এই জন্যেই এ সব খরচকে এদেশের ভাষায় বলা হয় 'খাবার ই বাহালা।' সম্রাটের অসাধারণ উদারতা এবং সাম্রাজ্যের প্রজাদের জন্যে তাঁর অশেষ যত্নের জন্যেই এসব সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর কাছে মোনাজাত করছি যেন তিনি এক সহস্র বৎসর বেঁচে থাকেন।

৫৪. হিন্দিতে থলেকে বলা হয় বাহলা।

মূল্যবান পাথরের কোষাগার

আমি যদি পাথরের পরিমাণ ও তাদের গুণাবলী বর্ণনা দিতে যাই তা হলে আমার এক যুগ লেগে যাবে। তাই আমি শুধু সামান্য কিছু বর্ণনা দেব। প্রত্যেক গাছ থেকে একটি করে শীষ নেবার মতো করে।

এই পদের জন্য সম্রাট এক বুদ্ধিমান বিশ্বাসী ও চতুর কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করলেন এবং তাকে সাহায্য করার জন্যে নিযুক্ত হল একজন কেরানী, একজন উদ্যমী দারোগা আর কুশলী মণিকার। ফলে এই উল্লেখযোগ্য বিভাগের ভিত্তি এই চার থাম্বার উপর নির্ভর করে। তারা মূল্যবান পাথরগুলোর শ্রেণীবিভাগ করে রাখে। ফলে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

রুবি—প্রথম শ্রেণীর রুবির দাম এক হাজার মোহরের কম নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর রুবির দাম হয় ৯৯৯ থেকে ৫০০ মোহর। তৃতীয় শ্রেণীর ৪৯৯ থেকে ৩০০ মোহর। চতুর্থ শ্রেণীর ২৯৯ থেকে ২০০ মোহর। পঞ্চম শ্রেণীর ১৯৯ থেকে ১০০ ; ষষ্ঠ শ্রেণীর ৯৯ থেকে ৬০ ; সপ্তম শ্রেণীর ৫৯ থেকে ৪০ ; ৮ম শ্রেণীর ৩৯ থেকে ৩০ ; নবম শ্রেণীর ২৯ থেকে ১০ ; দশম শ্রেণীর ৯$\frac{৩}{৪}$ থেকে ৫, একাদশ শ্রেণীর ৪$\frac{৩}{৪}$ থেকে ১ মোহর ; দ্বাদশ শ্রেণীর $\frac{৩}{৪}$ মোহর থেকে $\frac{২}{৪}$ টাকা। এর চেয়ে কম দামের রুবির কোনো হিসাব রাখা হয় না।

হীরা—পান্না এবং লাল ও নীল ইয়াফুতের নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হয় ; ১ম শ্রেণী ৩০ মোহরের উর্ধে ; ২য় শ্রেণী ২৯$\frac{৩}{৪}$ থেকে ১৫ মোহর ; ৩য় শ্রেণী ১৪$\frac{৩}{৪}$ থেকে ১২ ; ৪র্থ শ্রেণী ১১$\frac{৩}{৪}$ থেকে ১০ ; ৫ম শ্রেণী ৯$\frac{৩}{৪}$ থেকে ৭ ; ৬ষ্ঠ শ্রেণী ৬$\frac{৩}{৪}$ থেকে ৫ ; ৭ম শ্রেণী ৪$\frac{৩}{৪}$ থেকে ৩ ; ৮ম শ্রেণী ২$\frac{৩}{৪}$ থেকে ২ ; ৯ম শ্রেণী ১$\frac{৩}{৪}$ থেকে ১ মোহর ; ১০ শ্রেণী মুক্তাগুলোকে ১৬ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল এবং সেগুলোকে কুড়িটি কুড়িটি করে ছড়া বেঁধে রাখা হয়েছিল। প্রথম ছড়াতে ছিল বিশটি মুক্তা প্রত্যেকটার দাম ৩০ মোহর বা তার উর্ধ্বে ; দ্বিতীয় শ্রেণীর মুক্তার দাম ছিল ২৯$\frac{৩}{৪}$ থেকে ১৫ মোহর পর্যন্ত ; তৃতীয় শ্রেণীর ১৪$\frac{৩}{৪}$ থেকে ১২ ; ৪র্থ শ্রেণীর ১১$\frac{৩}{৪}$ থেকে ১০ ; ৫ম শ্রেণীর ৯$\frac{৩}{৪}$ থেকে ৭ ; ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ৬$\frac{৩}{৪}$ থেকে ৫ ; ৭ম শ্রেণী ৪$\frac{৩}{৪}$ থেকে ৩ ৮ম শ্রেণী ২$\frac{৩}{৪}$ থেকে ২ ; ৯ম শ্রেণী ১$\frac{৩}{৪}$ থেকে ১ মোহর ; র ৮$\frac{৩}{৪}$ টাকা থেকে ৫ টাকা ; ১১ শ্রেণী ৪$\frac{৩}{৪}$ থেকে ২ টাকা ; ১২ শ্রেণী ১$\frac{৩}{৪}$ থেকে $\frac{৩}{৪}$ টাকা।

১ম শ্রেণীর এক মোহরের কম থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত ; ১১শ শ্রেণী ৫ টাকার কম থেকে ২ টাকা পর্যন্ত ; ১২শ শ্রেণীর ২ টাকার কম থেকে ১$\frac{১}{৪}$ টাকা পর্যন্ত ; ১৩শ শ্রেণীর ১$\frac{১}{৪}$ টাকার কম থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত ; ১৪শ শ্রেণীর ৩০ দামের কম থেকে ২০ দাম পর্যন্ত ; ১৫শ শ্রেণীর ২০ দামের কম থেকে ১০ দাম পর্যন্ত ১৬শ শ্রেণী ১০ দামের কম থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত। মুক্তাগুলোকে শ্রেণী অনুযায়ী সংখ্যার সুতোয় গাঁথা হয়, অর্থাৎ ১৬শ শ্রেণীর মুক্তাগুলো ১৬ সুতোয় গাঁথা হতো। প্রত্যেক সুতোর গুচ্ছের শেষে সম্রাটের সীলমোহর করা হত যাতে শ্রেণীবিভাগ করা থেকে বাদ পড়ে গিয়ে ক্ষতি না হয়ে যায়। তা বন্ধ করতে এবং প্রত্যেক মুক্তার সাথে তার একটা বর্ণনা লাগিয়ে রাখা হতো যাতে কোনোরূপ অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।

মুক্তা ফুটো করার জন্যে শ্রমিকদের দৈনিক এবং মাসিক বেতন ছাড়াও নিম্নলিখিত রূপ পারিশ্রমিক দিতে হতো। ১ম শ্রেণীর মুক্তার জন্যে $\frac{১}{৪}$ টাকা ; ২য় শ্রেণীর $\frac{১}{৮}$; ৩য় শ্রেণীর $\frac{১}{১০}$ টাকা ; ৪র্থ শ্রেণীর ৩ দাম ; ৫ম শ্রেণীর ১ সুকি ; ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১ দাম ; ৭ম শ্রেণী $\frac{৩}{৪}$ দাম ; ৮ম শ্রেণী $\frac{১}{২}$ দাম ; ৯ম শ্রেণী $\frac{১}{৪}$ দাম ; ১০ম শ্রেণী $\frac{১}{৫}$ দাম ; ১১শ শ্রেণী $\frac{১}{৬}$ দাম ; ১২শ শ্রেণী ; ১৩শ শ্রেণী $\frac{১}{৮}$ দাম ; ১৪শ শ্রেণী $\frac{১}{৯}$ দাম ; ১৫শ শ্রেণী $\frac{১}{১০}$ দাম ; ১৬শ শ্রেণী $\frac{১}{১১}$ দাম এবং কম।

মণিমুক্তার দাম সর্বজনবিদিত যে সে সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া নিরর্থক ; কিন্তু যে সব বর্তমানে সম্রাটের কোষাগারে আছে তাদের মূল্য নিম্নরূপ :

১১ তওক[৫৫] ২০ মুখ[৫৬] ওজনের রুবি ও ৫$\frac{১}{৪}$ তওক ৪ মুখ ১ ওজনের হীরার প্রত্যেকটির দাম এক লক্ষ টাকা করে ; ১৭ $\frac{৩}{৪}$ তওক ৩ মুখ ওজনের পান্নার দাম ৫২,০০০ টাকা ; ৪ তওক ৭$\frac{৩}{৪}$ মুখ ওজনের ইয়াকুত এবং ৫ তওক মুক্তার প্রত্যেকটির দাম ৫০,০০০ টাকা।

---

৫৫. তওক= ৪ মাস

৫৬. মুখ অর্থ লাল ; আর কাল ফোটাওয়ালা লাল দানা, যাকে আমরা কুচ বলি। এখানে আবুল ফজল বুঝাচ্ছেন রতি। ৮ মুখ বা ৮ রতি = ১ মাসা ; ১২ মাসা = ১ তোলা এবং ৮০ তোলা = ১ সের। এক সত্রর ৪ মাসার সমান ; তবে মনে হয় তত্তেকর ওজন সামান্য কিছু বেশি ; কারণ আইন নং ১০–এ আবুল ফজল বলেছেন যে ১ দামের ওজন ৫ তত্তক বা ১ তোলা, ৮ মাসা ৭ মুখ অর্থাৎ ১ তত্তক = $\frac{১৬৭}{৪০}$ = ৪ মাসা ১ মুখ।

আইন-৪

সম্রাটের টাকশাল

যেহেতু টাকশালের কাজ সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন হলে তা সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং তা সব বিভাগের কাজই ত্বরান্বিত করে তাই আমি তার কিছু বিস্তারিত আলোচনা করব।

শহর এবং গ্রামের লোকেরা টাকার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য করে। প্রত্যেকেই প্রয়োজনানুযায়ী তা ব্যবহার করে, যার দুনিয়ার ভোগের বাসনা নেই ; সে এর দ্বারা শুধু জীবন ধারণের প্রয়োজন মিটায়, আর যাদের পৃথিবীতে ভোগ সম্ভোগের বাসনা, সে তাকে তার সব কিছু ইচ্ছা পূরণের উপায় হিসাবে মনে করে। তার সব বাসনা এর দ্বারা চরিতার্থ হয়। জ্ঞানী লোকেরা একে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় প্রয়োজন চরিতার্থ করার ভিত্তি বলে মনে করে। মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এ একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ অর্থ দ্বারাই মানুষ খাদ্য ও পোশাক সংগ্রহ করে। যদিও ইচ্ছা করলে নানারূপ কায়িক পরিশ্রম যেমন বপন করে, পালন করে, ফসল কেটে, পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করে, ময়দা মেখে, পাক করে, সূতা কেটে, সূতা পাকিয়ে, কাপড় বুনে ইত্যাদি করে এই দুটি জিনিস সংগ্রহ করতে পার, কিন্তু এসব কাজ আরও কতিপয় লোকের সাহায্য ছাড়া এসব কাজ সম্পন্ন করা যায় না ; কারণ একজন লোকের শক্তি এসব কাজের পক্ষে যথেষ্ট নয় আর তাছাড়া দিনের পর দিন একজনের পক্ষে এসব কাজ করা একেবারে অসম্ভব না হলেও বিশেষ কষ্টসাধ্য। আবার তার রসদপত্র রাখার জন্যে মানুষের একটা আবাসস্থল দরকার। এটাকে সে বলে তার বাড়ি, তা তাবুই হোক বা গুহাই হোক। মানুষের অস্তিত্ব এবং তার জীবনধারণ পাঁচটি জিনিসের ওপর নির্ভর করে— বাপ, মা, সন্তান, চাকর ও খাদ্য—শেষটা সবারই প্রয়োজন। আর তাছাড়া আমাদের আসবাবপত্র ও তৈজসাদি ভেঙে গেলেও অর্থের প্রয়োজন ; এগুলো কখনই বেশিদিন টেকে না। কিন্তু অর্থ দৃঢ় সংবদ্ধ হওয়ায় এবং তা যে জিনিস দিয়ে তৈরি তা শক্ত হওয়ায় তা অনেকদিন স্থায়ী হয় এবং তার সামান্য কিছুই অনেক জিনিস কিনতে পারে। এটা মানুষের ভ্রমণেও সাহায্য করে। অনেক মাস বা বৎসর বাদ দিলেও কয়েক দিনের রসদ সাথে নেয়াও শক্ত ব্যাপার।

আল্লাহর মেহেরবাণীতে এই চমৎকার দামি ধাতু স্বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে এবং মানুষের বিশেষ পরিশ্রম ছাড়াই তা জীবনযাত্রার সাহায্যে এসেছে। স্বর্ণের দ্বারাই মানুষ মহৎ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করে এবং উপযুক্তভাবে আল্লাহর এবাদত করতে সক্ষম হয়। স্বর্ণের অনেকগুলো মূল্যবান গুণ আছে। এ মোলায়েম রুচিসম্মত ও সুগন্ধী। এ যে জিনিস দ্বারা গঠিত সেগুলো সমান ওজনের এবং এর গুণাবলীতে চারটি মৌলিক পদার্থেরই ছাপ আছে ; এর রং আগুনের মতো, এর পবিত্রতা বাতাসের মতো, এর কোমলতা পানির মতো, আর এর

ওজন মাটির মতো ; ফলে স্বর্ণের অনেকগুলো জীবনদানকারী রশ্মি আছে। চার মৌলিক পদার্থের কোনোটাই আবার এর ক্ষতিসাধন করতে পারেনা। কারণ এটা আগুনে পোড়ে না ; বাতাসে এর কোনো ক্ষতি করতে পারে না, পানিতে যুগ যুগান্তর ধরে রেখে দিলেও এর আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না আর মাটিতে পুতে রাখলেও এর কোনো রূপান্তর সাধিত হয় না—এ সবের দ্বারাই স্বর্ণ অন্যান্য ধাতু থেকে ভিন্ন। এই জন্যই প্রবীণ দার্শনিক পুস্তকসমূহে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে বলা হয়েছে বৃহত্তর আদর্শ, এবং স্বর্ণকে বলা হয়েছে ক্ষুদ্রতর আদর্শ, যেহেতু জীবনধারণের জিনিসপত্র এর উপরই নির্ভর করে। এর উপাধিসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য "ন্যায় রক্ষক", সার্বজনীন সমন্বয় সাধক—প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণের উপরই জিনিসপত্রের সমন্বয় সাধন নির্ভর করে এবং ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিক হল এটাই। এর সাহায্যের জন্যেই আল্লাহতায়ালা রূপা ও তামাকে কাজে লাগিয়েছেন। এইভাবে মানুষের উপকারের অতিরিক্ত ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে ন্যায়পরায়ণ রাজা উদ্যমশীল শাসনকর্তাগণ এই সব ধাতুর প্রতি বিশেষভাবে নজর রেখেছেন এবং এদের গুণাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করার জন্যে টাকশাল স্থাপন করেছেন। এই বিভাগের সফলতা নির্ভর করে বুদ্ধিমান, কর্মক্ষম ও ন্যায়বান কারিগর নিযুক্ত করার উপর এবং তাদের যত্ন ও মনোযোগের উপরই পৃথিবীর প্রাসাদ নির্মিত হয়।

আইন-৫

টাকশালের কারিগরগণ

১. **দারোগা :** তাকে অবশ্যই অতি সতর্ক, বুদ্ধিমান ও উদারপন্থী হতে হবে যাতে তিনি তার সহকর্মীদের ঝঞ্ঝাটপূর্ণ দায়িত্ব লাঘব করতে পারেন। প্রত্যেকে যাতে ঠিকমত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে তাকে তা দেখতে হবে এবং তাকে উদ্যমশীল সৎ হতে হবে।

২. **সায়রাফী :** এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সাফল্য এরই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। কারণ তিনিই মুদ্রার বিশুদ্ধতার পরিমাণ নির্ণয় করেন। বর্তমান যুগের সমৃদ্ধির জন্যে এখন অনেকগুলো দক্ষ সরীফ আছে এবং সম্রাটের এদিকে চোখ থাকার ফলে স্বর্ণ এবং রৌপ্য সর্বোত্তমরূপে বিশুদ্ধ করে শোধন করা হয়। এই পূর্ণরূপ বিশুদ্ধতাকে পারস্য দেশে বলা হয় দাহদাহী, কিন্তু তারা ১০ মানের উপরের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অবহিত নয়; ভারতে একে বলা হয় বারহবানী যেহেতু এখানে ১২ মানের বিশুদ্ধতা বর্তমান। পূর্বে হূন নাম দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা বিশুদ্ধ বলে মনে করা হত এবং তাকে দশ মানের বলে ধরা হত। কিন্তু বর্তমানে সম্রাট একে ১/২ মানের বলে নির্ণয় করেছেন এবং আলাউদ্দীনের আমলের গোলাকার ক্ষুদ্র দানাগুলোকে আগে মনে করা হত ১২ মানের, কিন্তু সেগুলো দেখা যাচ্ছে ১/২ মানের। এই ব্যবসায়ে যারা অভিজ্ঞ তারা বর্তমান সময়ের স্বর্ণের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে চমৎকার গল্প বলেন এবং যাদুবিদ্যা ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন ; কারণ তারা বলেন যে কাঁচা স্বর্ণ খনি থেকে এত বিশুদ্ধরূপে পাওয়া যায় না। কিন্তু সম্রাটের ব্যবস্থার ফলেই স্বর্ণ এত বিশুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। তাই এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকেরা এত অবাক হন। কিন্তু ইহা অবধারিত যে স্বর্ণকে এর চেয়ে অধিকতর বিশুদ্ধ করা যায় না, বা আরও উচ্চমানের করা যায় না। সত্যবাদী লোকেরা এবং সৎ ভ্রমণকারীগণ কখনও এর মান সম্বন্ধে কখনও কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই; কিন্তু যখন স্বর্ণ জমান হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা এর থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং ছাইয়ের সাথে মিশে যায়, যা অনভিজ্ঞ লোকেরা একে গাছ বলে মনে করে, কিন্তু দক্ষ কারিগরগণ এর থেকে ধাতু উদ্ধার করে নেয়। যদিও নরম আশোধিত স্বর্ণকে চূর্ণ করে ছাইয়ে পরিণত করতে হয় তবু বিশেষ এক প্রক্রিয়া দ্বারা তাকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় কিন্তু এতে তার কিয়ংদংশ নষ্ট হয়ে যায়। সম্রাটের বিচক্ষণতার ফলে এই স্বর্ণ নষ্ট হওয়ার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে এবং এর ফলে কারিগরদের প্রতারণার অবসান হয়েছে।

আইন-৬

বনওয়ারী[৫৭]

এটা বানওয়ারীরই সংক্ষেপ। যদিও এই দেশে চতুর সরাফীগণ তাদের অভিজ্ঞতার ফলে স্বর্ণের রং এবং উজ্জ্বলতা দেখেই তার বিশুদ্ধতার মান বলে দিতে পারে, তবু এই জন্যে সর্ব সাধারণের সন্তোষ বিধানের জন্যে নিম্নলিখিত চমৎকার নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে।

পিতল অথবা অন্য কোনো ধাতুর তৈরি কতগুলো লম্বা নূরের প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণের টুকরা লাগান হয় আর সেগুলোর কোনোটার বিশুদ্ধতা কত মানের তা লিখে রাখা থাকে। কারিগরগণ যখন কোনো নতুন সোনার টুকরার বিশুদ্ধতার মান নির্ণয় করতে চায় তখন তারা কষ্টিপাথরে কয়েকটি দাগ কাটে, আর নূরের মোক দ্বারা তেমনি আর কয়েকটি দাগ কাটে। এই দুই শ্রেণীর দাগের তুলনা করে স্বর্ণখণ্ডের বিশুদ্ধতার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। কিন্তু লাইনগুলো যাতে একই রকম করে দেয়া হয় এবং দাগ দেবার সময় একই রকম জোর প্রয়োগ করা হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার নতুবা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার জন্যে বিভিন্ন মানের বিশুদ্ধ স্বর্ণ থাকা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত রূপে তাই পাওয়া যায়। তারা এক মাসা খাঁটি রূপার সাথে সমপরিমাণ সর্বোৎকৃষ্ট তামা মিশ্রিত করে এবং তাকে শক্ত হতে দেয়। এই মিশ্রিত ধাতুতে তারা ১০ মানের বিশুদ্ধ ৬ মাসা সোনার সাথে মিশ্রিত করে। তারপর এ থেকে এক মাসা[৫৮] নিয়ে তাকে ১ অধ মুর্কের ১৬টি ভাগ করা হয়। তখন যদি $\frac{১}{২}$ মুখ খাঁটি সোনা ($১০\frac{১}{২}$ মানের) এই ষোলভাগের এক ভাগের সহিত মিশান হয় তাহলে এর মান হবে মাত্র $১\frac{১}{৪}$ বান[৫৯] সেরূপ ৭ মুখ খাটি সোনার সাথে দুই ভাগ মিশ্রিত ধাতু মিলালে ১০ মানের স্বর্ণ পাওয়া যাবে ; ৬ মুখ খাঁটি সোনা আর তিনভাগ মিশ্রিত ধাতু মিশে হবে $৯\frac{৩}{৪}$ বান ; মুখ সোনা আর ৪ ভাগ মিশ্রিত ধাতু নিয়ে হবে $৯\frac{১}{২}$ বান ; $৫\frac{১}{২}$ মুখ সোনা আর ৫ ভাগ মিশ্রিত ধাতু মিলালে তার মান হবে $৯\frac{১}{৪}$ বান ; ৫ মুখ সোনার সাথে ৬ ভাগ মিশ্রিত ধাতু মিলালে তার মান হবে ৯ বান ; $৪\frac{১}{২}$ মুখ সোনা আর সাত ভাগ মিশ্রিত ধাতু মিলালে হবে $৮\frac{৩}{৪}$ বান ; ৪ মুখ সোনা আর ৮ ভাগ মিশ্রিত ধাতু মিলালে বিশুদ্ধতার পরিমাণ

---

৫৭. এই হিন্দী শব্দের অর্থ হল স্বর্ণের পরীক্ষা

৫৮. এক মাসাতে ৬ ভাগ স্বর্ণ ২ ভাগ রৌপ্য ও ১ ভাগ তাম্র থাকে অর্থাৎ $\frac{৩}{৪}$ ভাগ স্বর্ণ $\frac{১}{৪}$ অন্য ধাতু।

৫৯. হিন্দি শব্দ বান অর্থ মান বা স্তর।

হবে ৮$\frac{১}{২}$ বান ; ৩$\frac{১}{২}$ মুখ সোনা আর ৯ ভাগ মিশ্রিত ধাতু মিলালে তা হবে ৮$\frac{১}{৪}$ বান ; ৩ মুখ সোনা আর দশভাগ মিশ্রিত ধাতু মিলালে পরিমাণ হবে ৮ বান ; ২$\frac{১}{২}$ মুখ সোনা আর এগার ভাগ মিশ্রিত ধাতু মিলালে হবে ৭$\frac{১}{২}$ বান ; $\frac{১}{২}$ মুখ সোনা আর তের ভাগ মিশ্রিত ধাতু মিলালে হবে ৭$\frac{১}{৪}$ বান ; ১ মুখ সোনা এবং চৌদ্দ ভাগ মিশ্রিত ধাতু মিলালে হবে ৭ বান ; আর সব শেষে $\frac{১}{২}$ মুখ বা ১ ভাগ মিশ্রিত ধাতুর যোগ করলে সোনার মান $\frac{১}{৪}$ করে কমে যাবে, যদি মিশ্রিত ধাতুর বিশুদ্ধতা ৬$\frac{১}{২}$ বান হয়।

যদি ৬$\frac{১}{২}$ বানেরও কম বিশুদ্ধতার স্বর্ণ পেতে হয় তাহলে তারা প্রথম মিশ্রিত ধাতুর $\frac{১}{২}$ মুখ যা রূপা ও তামায় মিলিয়ে করা হয় তার সাথে দ্বিতীয় মিশ্রিত ধাতুর ৭$\frac{১}{২}$ মুখ (যা সোনা, তামা ও রূপার সমন্বয়ে গঠিত) একত্র করে গলিয়ে নিলে স্বর্ণের বিশুদ্ধতা হবে ৬$\frac{১}{৪}$ বান ; আর যদি প্রথম মিশ্রিত ধাতুর ১ মুখের সাথে দ্বিতীয় মিশ্রিত ধাতুর ৮৭ মুখ পরিমাণ মিশান হয় তাহলে বল দাঁড়াবে ৬ বান ; এর পরেও যদি আরও নিকৃষ্টতর স্বর্ণের প্রয়োজন হয় তা হলে তারা মিশ্রিত ধাতুগুলো $\frac{১}{২}$ মুখ করে বাড়িয়ে নেয়। কিন্তু বানওয়ারীতে তারা ৬ বান পর্যন্তই পরিমাপ করে এর নিকৃষ্টতর স্বর্ণ বাতিল করে দেয়।

এগুলো এমন লোককে করতে হবে যিনি পরীক্ষাগুলো বুঝতে পারবেন।

৩. **আমিন**। তাঁকে নিরপেক্ষ এবং সৎ হওয়া একান্ত প্রয়োজন যাতে শত্রুমিত্র সবাই তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকতে পারে। যদি কোথায়ও কোনো মতানৈক্য হয়, তাহলে তিনি দারোগা এবং কারিগরদের সাহায্য করেন এবং যা ন্যায় তাই সমর্থন করে ঝগড়া বিবাদ বন্ধ করেন।

৪. **মুশরিফ**। তিনি সততার সাথে কার্যকর পদ্ধতিতে দৈনন্দিন খরচের হিসাব লিখেন এবং সুসম্বদ্ধরূপে দৈনন্দিন খাতা রক্ষা করেন।

৫. **ব্যবসায়ী**। তিনি সোনা, রূপা ও তামা ক্রয় করেন এবং এতে নিজের কিছু লাভ করে এই বিভাগকে সাহায্য করেন এবং রাষ্ট্রের রাজস্বের শ্রীবৃদ্ধি করেন। সর্বত্র যখন ন্যায়পরায়ণতা বিরাজ করলে আর শাসনকর্তাদের অর্থলিপ্সা না থাকলেই ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

৬. **কোষাধ্যক্ষ**। তিনি লাভের দিকে নজর রাখেন এবং সব কার্যে সততা রক্ষা করেন। প্রথম চারজন ও শেষ কর্মাচারীদের প্রত্যেকের বেতন বিভিন্ন এবং তাদের সর্বনিম্ন কর্মচারীর আহাদী[৬০] পর্যায়ের।

---

৬০. আহাদীগণ বর্তমানের ওয়ারেন্ট অফিসারদের সমান। সম্রাটের অফিসের অধিকাংশ কেরানী, দরবারের চিত্রকরগণ, আকবরের কারখানাসমূহের ফোরম্যানগণ এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। এদের বলা হত আহাদী অর্থাৎ এক ব্যক্তি। কারণ তারা সরাসরি আকবরের হুকুম তামিল করত।

৭. **ওজনকারী**। মুদ্রা ওজন করেন। ১০০ জালালী স্বর্ণমুদ্রা ওজন করলে সে ১$\frac{১}{৩}$ দাম পায় ; ১০০০ টাকা ওজন করার জন্যে সে পায় ৬$\frac{১৯}{২৫}$ দাম ; আর ১০০০ তামার দাম ওজন করার জন্যে সে পায় এক দামের $\frac{১১}{২৫}$ এবং এর পরেরগুলোতে পরিমাণ অনুযায়ী।

৮. **কাচা ধাতু গালানকারী**। তিনি মাটি দিয়ে ছোট বড় কতগুলো গর্ত করে তারপর সেগুলোকে গ্রীজ মাখিয়ে দেন এবং সেগুলোতে গলান সোনা ও রূপা ফেলে দেন ও ঘটে পরিণত করেন। তামার বেলায় গ্রীজ না লাগালেও চলে, ছাই ছিটিয়ে দিলেই কাজ হয়। পূর্বে উল্লিখিত সোনার জন্যে তিনি মজুরী পান $\frac{৩}{৪}$ দাম ; এর পরিমাণ নিরূপণের জন্যে তিনি পান ৫ দাম ১৩$\frac{১}{৪}$ জিতল[৬১] একই পরিমাণ তামার জন্যে তার মজুরী হয় ৪ দাম ও ২১$\frac{১}{২}$ জিতাল।

৯. **চাকতি নির্মাণকারক**। ভেজাল মিশ্রিত স্বর্ণগুলোকে তিনি চাকতিয়ে পরিণত করেন। এক এক চাকতির ওজন হয় ছয় বা সাত মাসা, তা ছয় আঙুল লম্বা ও চওড়া হয়। এগুলো তিনি ওজনকারকের নিকট নিয়ে যান, যিনি এগুলোকে তামার ছাঁচে মেপে নিয়ে সেগুলো উপযুক্ত সেগুলোতে সিলমোহর করে দেয়, যাতে আর কোনো পরিবর্তন করা না যায় এবং কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে বুঝা যায়। উপরোক্ত পরিমাণ স্বর্ণের জন্য তিনি মজুরী পান ৪২$\frac{১}{৩}$ দাম।

৬১. ২৪ জিতল এক দাম হয়।

আইন-৭

সোনা পরিশোধন করার পদ্ধতি

পূর্ব বর্ণিত চাকতিগুলোতে সিলমোহর করা হয়ে গেলে সোনার মালিককে প্রতি ১০০ জালালী সোনার মোহরের জন্যে চার সের শোরা ও চার সের কাঁচা ইটের সুরকী দিতে হবে। চাকতিগুলোকে পরিষ্কার পানিতে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে উল্লিখিত শোরা ও সুরকীর মিশ্রণ দ্বারা একটার পর একটা সাজিয়ে স্তরীভূত করা হয় এবং তারপর সম্পূর্ণ স্তরটাকে গোবর দিয়ে লেপে দেয়া হয়—গোবরকে হিন্দীতে বলা হয় উপলা। এ হলো উদাম গরুর গোবর। এরপর তারা এতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং তা ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে যতক্ষণ না গোবরটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তারপর তা ঠাণ্ডা হতে থাকে ; এরপর ছাইগুলোকে ধার থেকে সরিয়ে নিয়ে ভাসিয়ে রাখা হয়। এগুলোকে ফারসিতে বলা হয় খাক-ই-খালিস আর হিন্দীতে বলা হয় সালোনী। কোনো এক পদ্ধতিতে যা পরে বর্ণনা করা হবে, তারা এ থেকে রূপা উদ্ধার করে। চাকতিগুলো এবং তাদের নিচের ছাইগুলো তেমনি রেখে দেয়া হয়। গোবরে আগুন দেয়া ও ধারের ছাই সরিয়ে রাখা আরও দুবার করে করা হয়। তিনবার আগুন দিলে চাকতিগুলোকে বলা হয় সিতাই। তারপর সেগুলো আবার পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নেয়া হয় এবং তিনবার আগের মতো মিশ্রণ দিয়ে স্তরীভূত করা হয় এবং ধারের ছাই সরিয়ে জমিয়ে রাখা হয়।

এই পন্থা যতক্ষণ না ছয়বার মিশ্রণ দেয়া হয় এবং আঠার বার আগুন দেয়া না হয় ততক্ষণ চলতে থাকে। তারপর চাকতিগুলোকে আবার ধুয়ে নেয়া হয়। তারপর বিশুদ্ধতা পরীক্ষক এর একটা ভেঙে দেখে ; তখন যদি নরম ও মৃদু আওয়াজ হয় তা হলে বুঝতে হবে যে তা যথেষ্ট বিশুদ্ধ হয়েছে ; কিন্তু যদি আওয়াজ কর্কশ হয় তা হলে চাকতিগুলোকে আরও তিনবার আগুনে পোড়ান হয়। তারপর প্রত্যেক কলকা থেকে এক মাসা করে নিয়ে নেয়া হয় যার সমষ্টি মিলে একটা চাকতির সমান হয়। এটা কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয় ; যদি দেখা যায় সোনা তখনও পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ হয়নি তা হলে তাকে আরও দুএকবার পুড়িয়ে নেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু তিন চার বার আগুন দিলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

সোনার বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় নিম্নলিখিত পদ্ধতিটাও ব্যবহার করা হয়। তারা দুই তোলা খাঁটি সোনা নেয়, আর দুই তোলা আগুনে পোড়ান সোনা এবং প্রত্যেকটার সম ওজনের বিশটা চাকতি করা হয়, তারপর তা ছড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে ধুয়ে নেয় নিক্তির ওজনের মাপে। যদি উভয় ধরনের চাকতি ওজনে সমান হয় তা হলে সোনা বিশুদ্ধ বলে বুঝতে হবে।

১০. **পরিশোধিত সোনা গালানকারী** : যে পরিশোধিত সোনা গলিয়ে সেগুলোকে আগে বর্ণিত পদ্ধতিতে ছাঁচে ঢালাই করে বাটে পরিণত করে তার মজুরি হল ১০০ সোনার মোহরের জন্যে তিন দাম।

১১. **জাররাব :** যে সোনা রূপা ও তামার বাট যত সমান করে সম্ভব গোল করে কেটে মুদ্রায় পরিণত করে। তার মজুরি প্রতি ১০০ সোনার মোহরের জন্যে ২১ দাম ১$\frac{১}{৪}$ জিতাল ; টাকা তৈরি করলে প্রতি ১০০০ টাকা ওজনের জন্যে তার মজুরি হল ৫৩ দাম ৮$\frac{৩}{৪}$ জিতাল ; কিন্তু যদি এই একই পরিমাণ রূপা কেটে সিকি তৈরি করে তাহলে আরও ২৮ দাম বেশি মজুরি পাবে। এক হাজার তামার দাম তৈরির জন্যে তার মজুরি হল ২৩ দাম ; দাম ওজনের তামা থেকে অর্ধ ও সিকি দাম তৈরি করলে মজুরি পাবে ২৫ দাম আর অর্ধ সিকি দাম যার নাম হয় দামরিন, তার মজুরি হবে ৬৯ দাম।

ইরান ও তুরানে কামারেরা উপযুক্ত নেহাই ছাড়া এরূপ সমান করে কাটাতে পারে না। কিন্তু হিন্দুস্থানের কারিগরগণ এরূপ কোনো যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই এত সমান করে এগুলো কাটতে পারে যে এদের মধ্যে চুল পরিমাণ পার্থক্যও থাকে না—এ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

১২. **খোদাইকারী :** যে ইস্পাত বা তেমনি ধাতুর মধ্যে মুদ্রার ছাচ খোদাই করে। তারপর এসব ছাচে মুদ্রা ছাপ দেওয়া হয়। বর্তমানে দিল্লীর মাওলানা আলী আহমদ, কোনো দেশেই যার সমতুল্য লোক নাই, ইস্পাতের ওপর বিভিন্ন অক্ষর এমন সুন্দর করে খোদাই করেন, যা যে কোনো সুদক্ষ হস্তাক্ষর বিশারদের লেখার সমতুল্য। সে ইয়ুজবাশী[৬২] (Yuzbashi) পদের অধিকারী ; তার দুজন লোক টাকশালে কাজ করে। দুজনেরই মাসিক বেতন ৬০০ দাম।

১৩. **শিককাচী :** সে গোলাকার ধাতুর টুকরাগুলোকে দুইটা ছাঁচের মধ্যে রেখে হাঁতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে উভয় দিকে ছাল দেয়। তার মজুরি হল প্রতি ১০০ সোনার মোহরের জন্যে ১$\frac{২}{৫}$ দাম ; ১০০০ টাকার জন্যে ৫ দাম ৯$\frac{১}{২}$ জিতাল ; আর ১০০০ টাকা ওজনের ছোট ছোট রৌপ্য মুদ্রার জন্য অতিরিক্ত ১ দাম ৩ জিতাল। ১০০ তামার দামের জন্যে ৩ দাম ; ২০০০ অর্ধ দামের এবং ৪০০০ সিকি দামের জন্যে ৩ দাম ১৮$\frac{৩}{৪}$ জিতাল ; এবং ৮০০০ অর্ধ সিকি দামের জন্যে ১০$\frac{১}{২}$ দাম। এইসব মজুরি থেকে শিককাচীকে $\frac{১}{৬}$ ভাগ দিতে হয় হাঁতুড়ি মারার লোককে কারণ তার জন্যে আর কোনো স্বতন্ত্র মজুরি দেয়া হয় না।

১৪. **সাববাক :** পরিশুদ্ধ রূপাকে গোলাকার চাকতাতে পরিণত করে। প্রত্যেক ১০০০ টাকা ওজনের জন্যে সে পায় ৫৪ দাম। রৌপ্য খাদ আবিষ্কার। রূপার সাথে সীসা, টিন ও তামা মিশ্রিত থাকতে পারে। ইরান ও তুরানে সর্বোচ্চ মানের বিশুদ্ধ রূপাকে দাহদাহিও বলা হয়ে থাকে ; হিন্দুস্থানে সরারীরা তাকে বিশ্ব বলে অভিহিত করে। যাদের পরিমাণ অনুযায়ী এর মান নামতে থাকে ; কিন্তু পাঁচ স্তরের নিচে তৈরি করা হয় না এবং দশ স্তরের নিচের রূপা কেউ স্পর্শও করবে না। অভিজ্ঞ লোকেরা মিশ্রণের রং দেখেই বলে দিতে পারবে কোন ধাতুর

---

৬২ এই তুর্কি শব্দটার দ্বারা একশত সৈন্যের অধিনায়ক বুঝায়। বিশিষ্ট আহাদীদের এই সামরিক পদে উন্নীত করা হত। একজন ইয়ুজবাসীর মাসিক বেতন ছিল পাঁচশত থেকে সাতশত টাকা—২য় খণ্ডের তৃতীয় আইন দ্রষ্টব্য।

খাদ মিশ্রিত আছে, কিন্তু পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে উখা দিয়ে কেটে ও গর্ত করে ভিতরের খাদ নির্ণয় করা হয়। আবার তপ্ত অবস্থায় পিটিয়ে পানিতে ফেলে দিয়েও তা নির্ণয় করা যায়। তখন সীসা হলে কাল রং হবে, তামা হলে লাল হবে, টিন হলে ইসৎ সাদা হবে আর বেশির ভাগ রূপা হলে একেবারে সাদা হবে।

রৌপ্য পরিশোধনের পদ্ধতি

তারা একটি গর্ত করে তার মধ্যে সামান্য পরিমাণ বন্য গরুর গোবর ছিটিয়ে দেয়। তারপর তা মুঘিলান কাঠের ছাই দিয়ে পূর্ণ করে নেয় ; তারপর তাকে ভিজিয়ে একটা পাত্রের মতো আকারের করে নেয় ; এর মধ্যে তারা মিশ্রিত রৌপ্য রাখে আর তার সাথে দেয় নির্ধারিত পরিমাণ সীসা। প্রথমে তারা সীসার এক—চতুর্থাংশ রৌপ্যের ওপরে রেখে মাটাকে কালা দিয়ে ঢেকে নিয়ে একজেরা চোঙ্কা দিয়ে ফু দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়—এমনি করে এই প্রক্রিয়া চারবার করা হয়। বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল হলেই ধাতুটা বিশুদ্ধ বলে যায় এবং তখন ধারগুলো শক্ত হতে থাকে। যখনই মাঝখানটা শক্ত হয়ে যায়, তখন তাতে পানি ছিটিয়ে দেয়া হয়, তখন তা থেকে বন্য ছাগলের শিং এর আকৃতির অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে। তখন তা একটা চাকতিতে পরিণত হয় এবং তা স্পূর্ণ পরিশুদ্ধ বলে ধরে নেয়া যায়। এই চাকতিটাকে যদি পুনর্বার পোড়ানো হয় তাহলে প্রত্যেক তোলায় আধ মুখ পরিমাণ জ্বলে বিনষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রতি ১০০ তোলা ৬ মাসা ২ মুখ নষ্ট হবে। চাকতির যে ছাইটুকুতে রূপা ও সীসা মিশ্রিত থাকে তা এক প্রকার মুদ্রায় পরিণত হয়, একে হিন্দিতে বলা হয় খারাল আর ফারর্সি ভাষায় বল হয় কুহনা[৬৩] ইহা কি কাজে লাগে তা পরে বর্ণনা করা হবে। এই পরিশুদ্ধ রৌপ্য জাবরাবের কাছে দেবার আগে প্রত্যেক ১০০ তোলা থেকে ৫ মাসা ৫ মুখ সম্রাটের কোষাগারের জন্য নিয়ে নেয়া হয় এর পর ধাতু পরীক্ষা তাতে নির্ধারিত সীলমোহর বসিয়ে দেয় যাতে এরপর তাতে কোনো রূপ পরিবর্তন বা রদবদল করা না যেতে পারে।

আগে রূপার বিশুদ্ধতা শেয়ারী পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হত ; বর্তমানে যা নিম্নলিখিত রূপে পরিমাপ করা হয় : যদি ইরাক ও খোরাসানে প্রচলিত শাহী রূপা বা তুরানে প্রচলিত লারী ও মিনকালীকে রূপার ১০০ তোলা পরিশোধন করলে তিন তোলা এক মুর্ক নষ্ট হয় ; আর সমপরিমাণ ইউরোপীয় ও তুরস্কের মারজিল বা গুজরাট ও মালয়ের মাহমুদি ও মুজাফরা পরিশোধন করলে ১৩ তোলা ৬$\frac{১}{২}$ মাসা হলে তবে তা সম্রাটের নির্ধারিত বিশুদ্ধ রৌপ্যের তুল্য হবে।

১৫. **কুরহুফুর :** বিশুদ্ধ রৌপ্যটাকে গরম করে তা পিটিয়ে তা থেকে সীসার গন্ধ সম্পূর্ণ দূর করে দেয়া। ১০০০ মুদ্রার জন্যে তার পারিশ্রমিক হল ৪$\frac{১}{২}$ দাম।

১৬. **চাশনিগির :** পরিশুদ্ধ সোনা ও রূপা পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত রূপে তার বিশুদ্ধতার পরিমাণ নির্ধারণ করে : দুই তোলা পরিশুদ্ধ সোনা দিয়ে আটটা চাকতি তৈরি করে সে পূর্বে

---

৬৩. কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে কাতাহ

বর্ণিত মিশ্রণ মেখে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, যাতে কোনোরূপ হাওয়া না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয় ও তারপর সে চাকতিগুলোকে ধুয়ে নিয়ে সেগুলো গলিয়ে ফেলে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যদি সোনার পরিমাণ না কমে তা হলে বুঝতে হবে যে সেগুলো খাঁটি। বিশুদ্ধতা পরীক্ষক এরপর তার নিজের ও অন্যান্যদের সন্তোষের জন্যে তা কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখে। এই পরিমাণ পরীক্ষার জন্যে তার মজুরি হল ১$\frac{২}{৩}$ দাম। রূপার বেলায় সে রক তোলা রূপার সাথে সমপরিমাণ সীসা নিয়ে একত্র করে তা একটা ধাতু গলাবার পাত্রে রাখে এবং যতক্ষণ না সবটা সীসা পুড়ে যায় ততক্ষণ তা আগুনে রাখে। অতঃপর রূপাটাতে পানি ছিটিয়ে সে তা হাঁতুড়ি পিটিয়ে তা থেকে সীসার গন্ধ সম্পূর্ণ শেষ করে দেয়। এরপর একটা নতুন পাত্রে তা গলিয়ে ওজন করা হয় : তখন যদি দেখা যায় যে এর ওজন তিন বিরিন (biring) বা তিন ধান পরিমাণ কমে গেছে তাহলে তাকে যথেষ্ট বিশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয় : আর না হলে সে পুনরায় এই প্রক্রিয়ায় তাকে বিশুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না এই পরিমাপে আসে। এই পরিমাণ ওজনের রূপার বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্যে তার মজুরি হল ৩ দাম ৪$\frac{১}{২}$ জিতাল।

১৭. **নিয়ারিয়া :** —তিনি খাক-ই-খালিস সংগ্রহ করে এবং তা ধৌত করে, আর সে সময় দু সের নিজে নিয়ে নেয় ; তাতে যে পরিমাণ সোনাই থাকুক তা তার ওজনের ফলে নিচে জমা হবে। এভাবে ধোয়া যাকে হিন্দিতে বলা হয় কুকরাহ এবং তাতে তখনও সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ থেকে যায় তা থেকে এই সোনা উদ্ধার করার পদ্ধতি পরে বর্ণনা করা হবে। পূর্ববর্ণিত মিশ্রিত তলানি পারদ দিয়ে ঘষা হয়। এক সের তলানির জন্যে ৬ মাসা পারদ ব্যবহার করা হয়। পারদের আকর্ষণ শক্তির গুণে সোনাটা একত্র হয়ে একটা তালে পরিণত হয় ; তখন তাকে আগুনের ওপর রাখা হয় যতক্ষণ না পারদটা সোনা থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই পরিমাণ খাল থেকে সোনা বের করার জন্যে নিয়ারিয়া ২০ দাম ২ জিতাল মজুরি পায়।

কুকরাহ-এর পদ্ধতি

তারা কুকরাহের সাথে সমপরিমাণ পানাহার মিশ্রিত করে এবং রাশি ও গোবর দিয়ে একটা নরম পদার্থ তৈরি করে। এরপর তারা প্রথম মিশ্রিত জিনিসটাকে চূর্ণ করে তারপর তারা তরল পদার্থটার সাথে মিশায় এবং তা দুই সের ওজনের পর গোলাকার বলে পরিণত করে। এগুলো তখন কাপড়ে রেখে শুকিয়ে নেয়া হয়।

নিম্নলিখিতরূপে পানহার তৈরি করা হয়

মাটিতে একটা গর্ত করে তাতে বাবুল কাঠের ছাই দিয়ে পূর্ণ করে নেয়। ছাইএর পরিমাণ হল প্রতি মণ সীসার জন্যে ছয় আঙ্গুল উঁচু ছাই। গর্তটাকে সমান করে কেটে সীসাটাকে দেয়া হয় গর্তের একেবারে নিচের দিকে। তারপর তাকে কাঠ কয়লা দিয়ে ঢেকে সীসাটাকে গলান হয়। এরপর কয়লা সরিয়ে সীসার ওপরে দুইটা মাটির চাকতি রাখা হয়, আর ওগুলোকে কাটা

দিয়ে গেঁথে দেয়া হয়, ফলে মুখটা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু বায়ু চলাচলের একটা ফাঁক রাখা হয়। এই ফাঁকটা ইট দিয়ে ঢেকে রাখা হয় যতক্ষণ না ছাইটা সম্পূর্ণভাবে সীসার সাথে মিশে না যায়। মাঝে মাঝে ইটটা সরিয়ে সীসার অবস্থা দেখে নেয়া হয়। আগে বর্ণিত পরিমাণ সীসার জন্যে ৪ মাসা করে রূপা ছাইয়ের সাথে মিশান থাকে। এই ছাই পানিতে ঠাণ্ডা করে নেয় এবং একেই বলা হয় পানহার। প্রত্যেক মণ সীসার থেকে দুই সের পোড়ান হয়। সবটা মিলে ৪ সের ছাই হয়। ফলে সবটা জিনিসের ওপর দাঁড়ায় একমণ দুই সের। রশি হল এক প্রকারের এসিড, ক্ষার ও সোরা থেকে তৈরি করা হয়।

পানহার ও রশি কি জিনিস বর্ণনা করার পর আমি কুকরাহ-এর পদ্ধতি বর্ণনায় ফিরে যাচ্ছি। তারা চুলার মতো দু' প্রান্ত সরু একপ্রকার পাত্র তৈরি করে যার নিচে একটা ফুটো করা হয়। তারপর এই পাত্রটাকে উপর থেকে চার আঙ্গুল নিচে পর্যন্ত কয়লা দিয়ে তা মাটিতে একটা গর্ত করে পাত্রটা তাতে রাখে এবং দুটো হাঁপর দিয়ে তাতে আগুন জ্বালান হয়। এরপর পূর্ব বর্ণিত চাকতিগুলো ভেঙ্গে টুকরা করে এর মধ্যে ফেলে গলান হয় আর তখন সোনা, রূপা, তামা ও সীসা পাত্রটির নিচের ফুটো দিয়ে গর্তে গিয়ে পড়ে। যেটুকু পাত্রে পড়ে থাকে তা নরম করে ধুয়ে নেয়া হয় এবং তা থেকে সীসা আলাদা করে ফেলা হয়। এভাবে তারা ছাইটুকুও সংগ্রহ করে যা থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় লাভ করা যায়। এরপর ধাতুগুলো গর্ত থেকে এনে পানহারা পদ্ধতিতে গলান হয়। ছাইয়ের সাথে সীসা মিশে যাবে, যা থেকে তিরিশ সের উদ্ধার করা হবে আর দশ সের পুড়িয়ে ফেলা হবে। সোনা, রূপা ও তামা একসাথে মিশে পিণ্ড হয়ে থাকে যাকে বলে বুগাওয়াতি (bugrawati) আবার কেউ কেউ বলে গুবরাওয়াতি (gubrawati)।

বুগরাওয়াতি পদ্ধতি

একটা গর্ত করে তা বাবুল কাঠের ছাই দিয়ে পূর্ণ করে—প্রত্যেক ১০০ তোলা বুগরাওয়াতির জন্যে আধসের ছাই দেয়। এই ছাইগুলোকে একটা খাবার পাত্রের মতো করে বুগরাওয়াতির সাথে মিশিয়ে তার সাথে মিশায় এক তোলা তামা আর পঁচিশ তোলা সীসা। এরপর পাত্রটি কয়লা দিয়ে পূর্ণ করে এবং তা ইট দিয়ে ঢেকে দেয়। সবটা যখন গলে যায় তখন তারা কয়লা ও ইটগুলো সরিয়ে নেয় এবং বাবুল কাঠের আগুন জ্বালে যতক্ষণ না সীসা ও তামা, সোনা ও রূপাটুকুকে একত্র রেখে ছাইএর সাথে মিশে যায়। এই ছাইগুলোকেও ঘারাল বলা হয় এবং এ থেকে সীসা ও তামা এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় উদ্ধার করা যায় যা পরে বর্ণনা করা হবে।

আইন-৮

সোনা থেকে রূপা আলাদা করার পদ্ধতি

এই মিশ্রিত ধাতু তারা ছয়বার গলায় ; তিনবার তামা দিয়ে আর তিনবার গন্ধক দিয়ে যাকে হিন্দিতে বলা হয় ছাছিয়া। প্রতি তোলা মিশ্রিত ধাতুর জন্যে তারা এক মাসা তামা আর দুই মাসা দুই মুর্ক গন্ধক মিশায়। প্রথমে তারা ধাতুটাকে তামার সাথে গলায়, তারপর গন্ধকের সাথে। মিশ্রিত ধাতুটুকু যদি ১০০ তোলা ওজনের হয় ১০০ মাসা তামা নিম্নলিখিত রূপে প্রয়োগ করা হয়—প্রথমে এর সাথে তারা ৫০ মাসা গলায়, তারপর দুবার ২৫ মাসা করে। গন্ধকটাও এমনিভাবে মিশান হয়। সোনা ও রূপার মিশ্রিত ধাতুটুকুকে ছোট ছোট টুকরায় ভাগ করে তারা তার সাথে ৫০ মাসা তামা মিশায় এবং তা ধাতু গলাবার মাটির পাত্রে দিয়ে গলান হয়। হাতের কাচে তারা একমাত্র ঠাণ্ডা পানি রাখে আর তার ওপরে খণ্ডের একটা ঝাড়ু রাখা হয়। গলিত ধাতুটা তারা এর মধ্যে ঢেলে দেয় এবং তা যাতে একত্র হয়ে তাল পাকাতে না পারে সেজন্যে ঝাড়ুর কাঠি দিয়ে তা নাড়তে থাকে। এই টুকরাগুলোকে পুনরায় মাটির পাত্রে বাকি তামাটুকু মিশিয়ে গলান হয় এবং তা ছায়াতে রেখে ঠাণ্ডা করা হয়। এই মিশ্রিত ধাতুর প্রত্যেক তোলার জন্যে দুই মাসা, দুই মুর্ক গন্ধক মিশান হয় অর্থাৎ প্রতি একশত তোলার জন্যে ১$\frac{৩}{৮}$ সের। আগের মতো করে যখন আবার এটাকে তিনবার গলান হয়, তখন তার ওপরে সাদা এক রকম পদার্থ জমা হয়। এটাই হল রূপা। এটাকে তুলে নিয়ে আলাদা করে রাখা হয়। এর পদ্ধতি পরে বর্ণনা করা হবে। সোনা ও রূপার মিশ্রিত ধাতুটুকু যখন তিন বার তামা দিয়ে আর তিন বার গন্ধক দিয়ে গলান হয় তখন যে শক্ত পদার্থটা থাকে তাই হল সোনা। পাঞ্জাবের ভাষায় এই সোনাটুকুকে বলা হয় কাইল (Kail), আবার দিল্লীর দিকে একে বলা হয় পিনজার (pinjar)। এতে যদি বেশি পরিমাণ সোনা থাকে তাহলে তার সাধারণত ৬$\frac{১}{২}$ বানের হয়।

এই সোনা পরিশুদ্ধ করতে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলোর একটা প্রয়োগ করতে হয়। সোনার পঞ্চাশ তোলা ৪০০ তোলা বিশুদ্ধ সোনার সাথে মিশিয়ে সালনী প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করবে ; নতুবা আলনী প্রক্রিয়া অবলম্বন করবে। শেষের প্রক্রিয়ায় তারা ২ ভাগ দেবে বন্য গরুর গোবর ও একভাগ শোরা মিশ্রিত করবে। এরপর তারা পূর্বের পিঞ্জরগুলোকে বাট করে নিয়ে সেগুলোকে পাতে পরিণত করবে, যার কোনোটার ওজনেই ১$\frac{১}{২}$ তোলার কম হবে না ; তবে মালবী প্রক্রিয়ায় যেরূপ করা হয় তার চেয়ে কিছুটা চওড়া হবে। তারপর এগুলোতে তিসির তেল মেখে আগের মিশ্রিত জিনিসটা এর ওপর ছড়িয়ে দেবে। প্রত্যেক ছিটানিতে দুবার আগুন দেবে। এই প্রক্রিয়া তিন চার বার করা হবে। যদি তারা সোনাটাকে বেশি রকম বিশুদ্ধ করতে চায় তাহলে সোনা নয় বানের না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ছাইগুলোও এক রকমের খাগনরূপে সংগ্রহ করা হয়।

ছাই থেকে রূপা বের করার পদ্ধতি

আলোনীর আগে ও পরে যেসব ছাই ও তলানী সংগ্রহ করা হয় তাকে তারা তার দ্বিগুণ পরিমাণ বিশুদ্ধ সীসার সাথে মিশায়। যেগুলোকে মাটির ধাতু গলাবার পাত্রে রাখে এবং সেটা এক প্রহর আগুনের ওপর রাখে। ধাতুরা ঠাণ্ডা হলে তারা তা সাবাক পদ্ধতিতে পরিশোধন করে। এর ছাইও খারাল।

আলোনী প্রক্রিয়া অন্যান্য রকমেও করা যায়। যারা এ ব্যবসায় পাকা তারা সেসব পদ্ধতি জানে।

১৮। পানিওয়ার খারাল গলিতে তামা থেকে রূপা আলাদা করে। প্রত্যেক তোলা রূপার জন্যে তার মজুরি হল ১ ১/২ দাম। সে যে লাভ করে তার জন্যে সে মাসিক ৩০০ দাম দেওয়ারকে দেয়। খারালকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে সে তার প্রত্যেক মণের সাথে ১ ১/২ সের মোহানী ও তিন সের গুড়া ন্যাট্রন (natron) মিশিয়ে সেগুলোকে পিষে একত্রে মিশায়। এই মিশ্রিত জিনিসটা সে এক সের করে পূর্বে বর্ণিত পাত্রে রেখে গলায়। ফলে সীসা ও রূপা নিচের গর্তে গিয়ে জমা হয়। এরপরে সাব্বাক পদ্ধতিতে পরিশোধন করা হয় এবং যে সীসা এ থেকে আলাদা হয়ে ছাইয়ের সাথে মিশে যায় তা পানহারে পরিণত হয়।

১৯। পাইকার শহরের স্বর্ণকারদের কাছ থেকে সালোনি ও খারাল কিনে নেয় এবং তা টাকশালে নিয়ে গলায় এবং এর সোনা ও রূপা থেকে লাভ করে। প্রত্যেক মণ সালোনীর জন্যে সে রাজস্ব দেয় ১৭ দাম এবং একই পরিমাণ খারালের জন্যে দেয় ১৪ দাম।

২০। নিকোহইওয়ালা রূপা মিশ্রিত পুরাতন তামার মুদ্রা গলাবার জন্যে নিয়ে আসে এবং ১০০ তোলা রূপা থেকে ৩ ১/২ দেওয়ান পায় এবং সে যদি রূপাটাকে মুদ্রায় পরিণত করতে চায় তখন তাকে নির্ধারিত হারে রাজস্ব দিতে হয়।

২১। খাক্‌শয়। ধাতুর মালিকগণ যখন পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের সোনা ও রূপা বের করে নেয় তখন খাকশয় টাকশাল ঝাড়ু দিয়ে ময়লা তার বাড়িতে নিয়ে যায় এবং সেগুলোকে ধুয়ে তার থেকে কিছু লাভ করে। কোনো কোনো ঝাড়ুদার বেশ ভাল ব্যবসা করে। সরকার এর কাছ থেকে মাসিক রাজস্ব পায় ১২ ১/২ টাকা।

এইভাবে টাকশালের সমস্ত কর্মচারীই সরকারের মাসিক প্রতি ১০০ দামের জন্যে ৩ দাম হারে রাজস্ব দেয়।

মহান সাম্রাজ্যের মুদ্রাসমূহ

যেভাবে সম্রাটের তীক্ষ্মদৃষ্টির ফলে সোনা ও রূপার বিশুদ্ধতার মান সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, তেমনি সাম্রাজ্যের মুদ্রা ব্যবস্থারও উন্নতি সাধিত হয়েছে। মুদ্রাসমূহ বর্তমান কোষাগারের অলঙ্কার স্বরূপ এবং জনসাধারণের অতি প্রিয়। এখানে কিছু বিবরণ দেওয়া হলো।

ক. স্বর্ণ মুদ্রাসমূহ

১. শাহানশাহ হল গোলাকার মুদ্রা। এর ওজন ১০১ তোলা ৯ মাসা ৭ মুখ। এর মূল্য ১০০ লাল-ই-জাললী মোহরের সমান। এর এক দিকের পিঠে সম্রাটের নাম খোদাই করা আর ধারের পাঁচ খিলানে লেখা :

আস-সুলতানুল আজম-উল-খাকান-উল-মুয়াজ্জ-খাল্লাদ আল্লাহ মূলকাহু ওয়া সুলতানাহু দোরতুদার-ইল কিলাফত-ই-আগ্রা অর্থাৎ মহান সুলতান, প্রসিদ্ধ সম্রাট, আল্লাহ তার সাম্রাজ্য ও রাজত্বকে চিরস্থায়ী করুন ! রাজধানী আগ্রায় মুদ্রিত।" বিপরীত দিকে আছে কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ও পাক্ কোরানের নিম্নলিখিত আয়াত : "আল্লাহ্ ইয়াজরাকু মান ইয়াশা-৬-বি খায়রিন হিসাবিন," অর্থাৎ যার প্রতি আল্লাহ্ প্রসন্ন হন তার প্রতি তাঁর দয়া অপরিসীম।" এর চারধারে আছে প্রথম চার খলিফার নাম।

খোদাইকারী মৌলানা মাকসুদ প্রথমে এই মোল্লা আলী আহমদ অতি নিপুণতার সাথে নিম্নলিখিত রূপ সংযোগ করেন। একদিকে আফজালু দিনারিন ইয়ানফুকুহ্ আরবাজুলু দিনারুন ইয়ানফুফুহ আলা আশনিহি ফিসাবিলিল্লাহ্) অর্থাৎ মানুষ সর্বোত্তম মুদ্রা খরচ করে তখনই যখন তা সে তার সম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে আল্লার নামে খরচ করে।"

আর বিপরীত দিকে লেখা, আস—সুলতানুল আলি আল্ খালিকাতু আল মুতাআলি খাল্লাদ আল্লাহ্ তা-আলা মুলকাহু ওয়া সুলতানাহু ওয়া আব্বাদা আব্দলাহ্ ওয়া ইহসানাহু অর্থাৎ সার্বভৌম সুলতান, মহিমান্বিত খলিফা, প্রার্থনা করি যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তার সাম্রাজ্য ও তার রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন এবং তার ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতাকে চিরস্থায়ীত্ব দান করুন।

পরে কিন্তু সবকিছুই অপসারণ করা হয় এবং সভাকবি ও দার্শনিক শেক ফৈজী লিখিত নিম্নলিখিত দুটি চতুষ্পদী কবিতা খোদাই করা হয়। একদিকে থাকে,

খুবশিদ কি হাকত বাহর আজু গওহর ইয়াকত্
সঙ্গই সিরাহ আজ পারতাভই আন্ কওহর ইয়াকত্

কান আজ নজরই তারবিখাতই উপার ইয়াকত্
ওয়ান জার সারাক আজ মিক্কা–ই আকবর ইয়াকত্।
“সূর্য থেকেই সপ্ত সমুদ্র তাদের মুক্তা আহ্বান করে
তার কিরণ থেকেই সৃষ্টি হয় কাল পাথরের উজ্জ্বল রত্ন
খনি তার সোনা পায় তারই করুণা সম্পাতে
আর সে সোনা মহিমান্বিত হয় আকবরের সীলমোহরে।”

এবং মাঝখানে আল্লাহ্ আকবর জাল্লা জাল্লালাহ্। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তার মহিমা চতুর্দিকে বিস্তৃত হোক।”

আর অপরটিকে,

ইন সিককা কি পিরায়া–ই উম্মিদ বুভাদ
ব্য নাকস্–ই দাভান উ–নাম–ই জাভিদ বুভাদ
সিমা–ই সা’আদত আশা হাসিন বাস কি কি দাহর
ইয়াক জাররা নজর কারদা–ই খুরসিদ বুভাদ।

“এই মুদ্রা যা আশার অলঙ্কার
এতে অঙ্কিত আছে চিরস্থায়ী সীলমোহর, আর অক্ষর এবং নাম
এর সৌভাগ্য সূচনার প্রতীকরূপে, এই–ই যথেষ্ট
যে একবার চিরকালের জন্যে সূর্য এর উপর নজর দিয়েছিল।”
এর মাঝখানে পবিত্র সাল অনুযায়ী তারিখ লেখা।

২. এই নাম ও এই আকৃতির আর একটি স্বর্ণমুদ্রা আছে যার ওজন ৯১ তোলা, ৮ মাসা ও এর মূল্য প্রতিটি ১১ মাসা ওজনের ১০০ গোল মোহরের সমান। এর উভয় পিঠে আগের মুদ্রাটার মতোই লেখা।

৩. রাহাস হল আগের দুটি মুদ্রার প্রত্যেকটিরই অর্ধেক। কখনও কখনও এটা চতুষ্কোণ করেও তৈরি করা হয়। এর এক পিঠে শাহানশাহ–এর মতই লেখা আর ওপর পিঠে ফৈজীর লিখিত নিম্নলিখিত চতুষ্পদাবলি কবিতাটি :

ইন নাকদ–ই রাভান–ই–গানজ–ই শাহিনশাহী
বা কাউকাব–ই ইকবাল কুনাদ হামরাহি
খুরসিদ বি পারভার আশ আজ আনরু ফি বিদাহর
ইয়াবাদ শারাক আজ মিককা–ই আকবরশাহী।
“সম্রাটের কোষাগারের এই চলতি মুদ্রা
সৌভাগ্য তারার অনুসরণ করে
হে সূর্য একে উৎসাহিত করে কারণ সর্বকালের জন্যে
এটা আকবরের সীলমোহর মহিমান্বিত।”

৪. আত্মা হল শাহানশাহ-এর এক—চতুর্থাংশ, গোলাকার ও চতুষ্কোণ উভয় প্রকারের। কোনো কোনোটাতে শাহানশাহর মতো একই জিনিস খোদাই করা আবার কোনো কোনোটায় এক দিকে ফৈজীর নিম্নলিখিত চতুষ্পদাবলি কবিতা লেখা :

ইন সিককা কি দাসত-ই বাখত রা জেওয়ার বাদ
পিরায়া-ই-নূহ সিপিহর উ হাকত আখতার বাদ
জারিরন নাক দিমত কার আজ-উ-ছুন জার বাদ
দার দাহর রাঙান বি-নাম-ই শাহ আকবর বাদ।

এই মুদ্রা সৌভাগ্যবানের হস্ত অলঙ্কৃত করুন এ যেন নয় স্বর্গের ও সাত তারকার অলঙ্কারে পরিণত হয়। ইহা প্রচলিত থেকে আকবর শাহের গৌরব প্রকাশ করে।

আর এর বিপরীত দিকে পূর্ব বর্ণিত রুবাইয়া।

৫. বিনসাত আতনার মতো এটাও দুই আকারের। এর মূল্য ১ম মুদ্রার এক-পঞ্চমাংশ। শাহানশাহ-এর একই আকৃতির ও একইরূপ লেখাযুক্ত। এর এক—অষ্টমাংশ, এক-দশমাংশ, এক-দ্বাদশাংশ এবং পঞ্চবিংশতি ভাগের এক ভাগ মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা আছে।

বা জুগুল (আবুল ফজলের পাণ্ডুলিপিতে পরিষ্কার বুঝা যায় না ইহা চুগুল না জুগুল)।

৬. চুগুল (Chugul)—এটা আকারে চতুষ্কোণ, এটা শাহানশার $\frac{১}{৫০}$ অংশ এবং এটার মূল্য দুই মোহরের সমান।

৭. গোলকৃতি লাল-ই-জালালী ওজন এবং মূল্যে দুইটি গোল মোহরের সমান। এর একদিকে আল্লাহ্ আকবর ও অপর দিকে ইয়া মুইনু (সাহায্যকারী) লিখা।

৮. আফতাবী গোলাকৃতি-এর ওজন ১ তোলা, ২ মাসা ও ৪$\frac{৩}{৪}$ মুর্ক, এর মূল্য ১২ টাকার সমান। এর একদিকে আল্লাহ্ আকবর, জাল্লা জালালুহ্ এবং অপরদিকে পবিত্র সালের (Dininc Eva) তারিখ দেয়া ও যেখানে এটা মুদ্রিত হয়েছে তার নাম লেখা।

৯. ইলাহী গোলাকার, ওজন ১২ মাসা ১$\frac{৩}{৪}$ মুর্ক আফতাবীর মতই এর লেখা এবং-এর দাম ১০ টাকা।

১০. চতুষ্কোণ লাল-ই জালালী একই ওজনের একই মূল্যের। এর একদিকে আল্লাহ্ আকবর আর অপর দিকে জাল্লা জালালুহু লেখা।

১১. আদম গুতকা গোলাকার। এর ওজন ১১ মাসা ও মূল্য নয় টাকা। এর একদিকে আল্লাহ আকবর এবং অপরদিকে ইয়া মুইনু লেখা।

১২. গোলমোহর—ওজন ও মূল্যে আদম গুতকার সমান কিন্তু এর ছাপ অন্য রকম।

১৩. মিহরাবি। ওজন ও দামে গোলমোহরের সমান এবং একই রকমের ছাপ।

১৪. মুইনি চতুষ্কোণ ও গোলাকার উভয় রকমের। ওজন ও দামে এটা লাল–ই জালালী ও গোলমোহরের সমান। এর ছাপ হল ইয়া মুইনু।

১৫. চাহারগোসা ওজন ও ছাপে আফতারীর মত

১৬. গারদ ইলাহীর অর্ধেক এবং একই ছাপের

১৭. ধান লাল–ই জালালীর অর্ধেক

১৮. সালিমি আদম গুতকার অর্ধেক

১৯. বারী আফতাবীর এক—চতুর্থাংশ

২০. মান ইলাহী ও জালালীর এক—চতুর্থাংশ

২১. অর্ধ সালিমি আদম গুতকার এক—চতুর্থাংশ

২২. পানদাউ লাল–ই জালালীর এক–পঞ্চমাংশ। এর একদিকে একটা লিলি, আর অপর দিকে বন্য গোলাপ।

২৪. সামনি বা অষ্টসিদ। ইলাহী এক–অষ্টমাংশ। এর একদিকে আল্লাহ আকবর, আর অপর দিকে জাল্লা জালালাহু।

২৫. কালা ইলাহীর ষোলভাগের এক ভাগ। এর উভয় দিকে বন্য গোলাপ আঁকা।

২৬. জারা ইলাহীর বত্রিশ ভাগের এক ভাগ এবং কালার মতো একই ছাপের।

স্বর্ণমুদ্রা সম্বন্ধে রাজকীয় টাকশালে প্রথা ছিল যে লাল–ই জালালী, ধান ও মান এই তিন রকম মুদ্রা এক এক মাস ধরে মুদ্রিত হত। অন্যান্য স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ আদেশ ছাড়া কখনও মুদ্রিত হত না।

খ–রৌপ্যমুদ্রা

১. রুপাইয়া গোল এবং এর ওজন সাড়ে এগার আনা। এটা শের শাহের আমলে সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে একে নিখুঁত করা হয় এবং এতে নতুন ছাপ দেয়া হয়। একদিকে আল্লাহ্ আকবর—জাল্লা জালালহু আর অপর দিকে তারিখ। যদিও এর বাজার দর চল্লিশ দামের কখনও বেশি এবং কখনও কম থাকে। এর মূল্য বেতন দেবার বেলায় সব সময়ই চল্লিশ দাম নির্ধারিত হয়।

২. জালাল চতুষ্কোণ। এটা এই রাজত্বকালে প্রচলিত হয়। মূল্য ও ছাপ ১নং মুদ্রার অনুরূপ।

৩. দাবর জালালার অর্ধেক।

৪. চার্ণ জালালার এক–চতুর্থাংশ।

৫. পানদাউ জালালার এক–পঞ্চমাংশ

৬. অষ্ট জালালর এক–অষ্টমাংশ

৭. দশ জালালার এক-দশমাংশ।

৮. কালা জালালার ষোল ভাগের এক ভাগ।

৯. সুকি জালালার বিশ ভাগের এক ভাগ।

গোল রুবাইয়ায় ও অনুরূপ অংশের মুদ্রা প্রচলিত আছে তবে সেগুলো ভিন্ন আকারের।

গ-তাম্র মুদ্রা

১. **দাম**-এর ওজন ৫ তাক অর্থাৎ ১ তোলা, ৮ আনা, ৭ মুর্ক। এটা রুবাইয়ার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। প্রথমে এই মুদ্রার নাম ছিল পসা আর বাহলুলি ; কিন্তু বর্তমানে এটা দাম নামে পরিচিত। এর একদিকে মুদ্রিত সে স্থানের নাম অপরদিকে তারিখ দেয়া।

হিসাব রাখার প্রয়োজনে দাম ২৫ ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগ জিতাল নামে পরিচিত। এই কাল্পনিক ভাগ শুধু হিসাবরক্ষকগণ ব্যবহার করে।

২. আঠেলা দামের অর্ধেক।

৩. পাওলা দামের এক-চতুর্থাংশ।

৪. আমির দামের এক-অষ্টমাংশ।

সম্রাটের রাজত্বের শুরুতে সম্রাটের গৌরব প্রকাশের জন্যে সাম্রাজ্যের বহু স্থানে স্বর্ণমুদ্রা মুদ্রিত হত কিন্তু বর্তমানে স্বর্ণমুদ্রা শুধু চারস্থানে মুদ্রিত হয়। যথা রাজধানীতে, বাংলায়, আহমদবাদে (গুজরাট) ও কাবুলে। রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা এই চার স্থান ছাড়াও নিম্নলিখিত দশটি স্থানে মুদ্রিত হয় : ইলাহাবাদ আগ্রা, উজ্জয়িনী, সুরাট, দিল্লী, পাটনা, কাশ্মীর, লাহোর, সুলতান, টাণ্ডা। আটাশটি শহরে শুধু তাম্র মুদ্রিত হয়, যথা : আজমির, অযোধ্যা, আটক আলওয়ার, বাদাগুন, বানারস, ভাককার, বামিরা, পাডান, জৈনপুর, জলন্ধর, হরিদ্বার, হিসাব, ফিরোজা, কালপি, গোয়ালিয়র, গোরখপুর, কালানুর, লক্ষ্ণৌ, মানদু, নাজোর, সারাহিন্দ, শিয়ালকোট, সারোন্ধ শাহারানপুর, সারাদপুর, সাম্বাল, কনৌজ, রণথম্ভুর।

এদেশে বাণিজ্য সংক্রান্ত লেনদেন সাধারণত গোলমোহর, রুপিয়া ও দাম এই তিন মুদ্রায় চলে। নীতিহীন লোকের মুদ্রা ঘষে বা অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বন করে এর ক্ষয় সাধন করে। ফলে জাতীয় ক্ষতি সাধিত হয়। এ সম্বন্ধে সম্রাট অভিজ্ঞ লোকজনের সাথে পরামর্শ করে এবং যুগের ভাবধারা সম্বন্ধে তার জ্ঞানের ফলে এরূপ ক্ষতিকর কাজ বন্ধ করার জন্যে নতুন নতুন নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেন। মুদ্রা ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রথমে যখন (২৭ বৎসর সময়ে) শাসন ব্যবস্থার রাজা টোডরমলের হাতে ন্যস্ত ছিল। চার রকমের মোহর প্রচলিত হতে দেয়া হয়েছিল ; (ক) একটা ছিল লাল-ই জালালী, যাতে সম্রাটের নাম মুদ্রিত ছিল এবং এর ওজন ছিল ১ তোলা ১$\frac{১}{৮}$ মুর্ক। এটা বেশ বিশুদ্ধ ছিল এবং এর মূল্য ৪০০ দাম। রাজত্বের শুরু থেকে সম্রাটের নামাঙ্কিত আর একটা মোহর চালু ছিল যা তিনমানেই প্রচলিত ছিল-যেমন : (খ) এই মোহর যখন তা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হত এবং এর পূর্ণ ওজন ১১ মাসা হত।

এর মূল্য ছিল ২৬০ দাম। ব্যবহারের ফলে কমে গিয়ে তিন ধান পর্যন্ত ওজন হলেও তাকে এই মানের বলেই ধরা হত এবং কোনরূপ কম ধরা হত না। (গ) একই মোহর যখন চার থেকে ছয় ধান কম হত ; তখন এর মূল্য হত ২৫৫ দাম। (ঘ) একই মোহর যখন ওজনে ছয় থেকে নয় ধান কম হত ; এর তখন মূল্য হত ৩৫০ দাম। এর কম ওজনের মোহরকে তাল সোনা হিসেবে গণ্য করা হত।

সে সময় তিনরকমের রুপিয়া চালু ছিল যথা : (ক) একটি ছিল চতুষ্কোণ, খাঁটি রূপার তৈরি এবং এর ওজন ছিল ১১$\frac{১}{২}$ মাসা। এটা জালালা নামে পরিচিত ছিল এবং এর মূল্য ছিল ৪০ দাম। (খ) গোল পুরাতন আকবর শাহী রুপিয়া যখন পুরা ওজনের ২৩ বা এক মুর্ক কম হত, তখন এর মূল্য হত ৩৯ দাম। (গ) একই রুপিয়া যখন ওজনে দুই মুখ কম হত তখন মূল্য হত ৩৮ দাম। এর কম ওজনের রুপিয়া ধাতু হিসেবে পরিগণিত হত।

দ্বিতীয়ত পবিত্র সালের ২৯ বৎসরের ১৮ই সিহর তারিখে সিরাজের আসাদুদৌলা আমীর ফাতেউল্লাহ[৬৪] যখন ক্ষমতায় আসীন হন তখন এক রাজকীয় পরোয়ানা বের হয় যে মোহরের বেলায় তিন গ্রেন আর রুপিয়ার বেলায় ছয় গ্রেন পর্যন্ত কম হলে তা ধর্তব্যে আনা হবে না। সেগুলো পূর্ণ ওজনের বলেই ধরে নেয়া হবে। যদি মোহরের ওজন এর চেয়েও কম

---

৬৪. সিরানের আমীর ফতেউল্লাহ, খাজা জামালুদ্দীন মাহমুদ শিরওয়ানের কামালুদ্দীন ও সিরাজের মীর গিয়াসুদ্দীন মনসুরের ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রাকৃতিক দর্শনের বিশেষত বলবিদ্যায় এত বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যে আবুল ফজল তার সম্বন্ধে বলেছিলেন, "যদি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায়, আমীর সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করে ফেলবে।" জিয়রপুরের আদীল শাহের বিশেষ অনুরোধে তিনি সিরাজ ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে যান। আদীল সাহেবের মৃত্যুর পর হিজরী ৯৯১ সালে আকবর তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনেন এবং তাঁকে সদর পদে উন্নীত করেন এবং তিন বৎসর পরে তাঁকে আমিন উল মূলক উপাধিতে ভূষিত করেন। তোস্তর মলকে সাহায্য করার জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা হলে তিনি পুরাতন রাজত্ব সংক্রান্ত বইগুলো সংশোধন করে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁর উপাধি আমির উল মূলক সেই বৎসরেই পরিবর্তন করে আসাদুদৌলা বা সাম্রাজ্যের বাহ এই উপাধি দেয়া হয়। এর পর আমীর খান্দেশে যান, এরপর তিনি ৯৯৭ হিজরীতে সেখান থেকে তিনি যখন আকবরের কাছে ফিরে আসেন সে সময় সম্রাট আকবর কাশ্মীরে ছিলেন। আমীর তখন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মনে করতেন চিকিৎসা বিদ্যা জানেন, তাই খ্যাতনামা চিকিৎসক হাকিম আলীর উপদেশ না মেনে হারিসা খেয়ে জ্বর ভাল করতে চেয়েছিলেন। তারই ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

আবুল ফজল ফৈজী ও বীরবলের পরেই সম্রাট আকবর আমীরকে বেশি ভালবাসতেন। আমীরের আবুল ফজলের সাথে খুব সদ্ভাব ছিল। তিনি আবুল ফজলের ছেলেকে পড়াতেন। মীর আতুল আলম পুস্তকের লেখকের মতে আমীর একজন বৈষয়িক লোক ছিলেন এবং প্রায়ই শিকারে সম্রাটের অনুগম করতেন কাঁধে বন্দুক ও কোমরে বারুদের থলি নিয়ে এবং বিজ্ঞানকে পদদলিত করে তিনি এমন সব দুঃসাহসিক কাজ করতেন যা রুস্তমও করতে পারতেন না।

মা-সির-উল ওমাবার লেখক বিবৃতি করেছেন যে কারও কারও মতে আমীর তিন হাজারী মনসদার ছিলেন ; কিন্তু তাবাকাইত আকবরীতে এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে যে সব মনসদারের নাম দেয়া হয়েছে তাতে আমীরের নাম নেই। আমীরের ফতেহউল্লাহর স্থানে বিশেষ করে বাদায়ুনীতে দেখা যায় লেখা আছে শাম পথেউল্লাহ। তাকত-এ সুলায়মান তাঁকে কবর দেয়া হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে বনু ফৈজী যে শোক গাথা লিখেছিলেন তা ভারি চমৎকার।

হয় তা যতদূর কম হবে, তা ততটুকু কম বলেই নেয়া হবে। কিন্তু এরূপ কোন বিধান দেয়া হল না যে ৯ গ্রেন পর্যন্ত কম ওজনের মোহরকেই মোহর বলে ধরা হবে না। আবার এই আদেশানুযায়ী এক মুর্ক কম ওজনের মোহরের মূল্য ধার্য করা হল ৩৫৫ দাম ও এক-ভগ্নাংশ। ফলে তারা এক মুর্ক ওজনের জন্য ৫ দাম বাদ দেয়া হত। আর যদি মোহরের ওজন তিন গ্রেনের চেয়ে বেশি কম হত ; এবং ১$\frac{১}{২}$ মুর্ক কম ওজনের জন্যে তিনি ১০ দাম কেটে নিতেন, কমতিটা ১$\frac{১}{২}$ কিছু কম থাকলেও তা করা হত। আসাদুদৌলার প্রচলিত নতুন বিধান অনুযায়ী মোহরের মূল্য ৬ দাম ও এক-ভগ্নাংশ কম করে ধার্য করা হয় এবং এর সোনার দাম ধার্য হল ২৫৩ দামও এক-ভগ্নাংশ।

যে বিধান অনুযায়ী গোল রুপিয়ার মূল্য তার বিশুদ্ধতা ও ওজন ঠিক থাকা সত্ত্বেও চতুষ্কোণ রুপিয়া থেকে এক দাম করে ধার্য করা হয়, আসাদুদৌলা তা পরিবর্তন করে গোল রুপিয়ার মূল্য যখন তার পূর্ণ ওজন থাকবে বা এক মুর্ক পর্যন্ত কম হবে, ৪০ দাম ধার্য করেন। আবার আগে যেখানে দুই মুর্ক কম ওজনের জন্য দুই দাম কম মূল্য ধরা হত সেখানে দাম পরিমাণ কম ওজনের জন্য এক দাম ও এক-ভগ্নাংশ কম মূল্য ধার্য করা হয়।

তৃতীয়ত আসাদুদৌলা যখন খান্দেশে যান তখন রাজা জালালী রুপিয়াতে যে মোহরের মূল্য ধার্য করা হত তা গোল মোহরে ধার্য করেন এবং তার গোয়ার্তুমির ও ঝগড়াটে স্বভাবের ফলে তিনি মোহর ও রুপিয়ার কম ওজনের জন্য মূল্যের হার পুনরায় পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী ধার্য করেন।

চতুর্থ যখন কুলিজ খান[৬৫] সরকারের দেওয়ান প্রাপ্ত হন তিনি রাজার নিয়মানুযায়ী মোহরের মূল্য ধার্য করার প্রথা প্রবর্তন করেন কিন্তু যেখানে মোহরের কম ওজনের জন্য রাজ্য পাঁচ দাম

---

৬৫. কুলিজ খানের নাম প্রথম পাওয়া যায় আকবরের রাজত্বের ১৭ বৎসরে, যখন সম্রাট আকবর ৪৭ দিন অবরোধের পর সুরাটা দুর্গ দখল করে তাঁকে তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রাজত্বের ২০ বৎসরে তাঁকে গুজরাটে পাঠানো হয় এবং দুই বৎসর পরে শাহ মনসুরের মৃত্যুর পর তাঁকে দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। রাজত্বের ২৮ বৎসরে তিনি সেনাবাহিনীর সাথে গুজরাট বিজয়ে যান। রাজত্বের ৩৪ বৎসরে তিনি সম্বল জায়গীর হিসেবে পান। টোডরমলের মৃত্যুর পর পুনরায় তাঁকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করা হয়। আবুল ফজল ৪ খানে এই সময়ের কথাই বলেছেন। ১০০২ সাল তাকে কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু সেখানে তিনি কৃতকার্য হতে পারেন নি। সেখান থেকে তিনি তাঁর জামাতা রাজপুত্র দানিয়েলের শিক্ষক হিসেবে তার অনুগমন করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পুনরায় আকবরের নিকট ফিরে আসেন। ১০০৭ সনে সম্রাট যখন খান্দেশে ছিলেন, তখন তিনি আগ্রার শাসনকর্তা ছিলেন। দুই বৎসর পরে তাঁকে পাঞ্জাব ও কাবুলের শাসনকর্তার পদ উন্নীত করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁকে গুজরাটে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু পর বৎসরই তিনি পাঞ্জাবে ফিরে আসেন এবং সেখানে তাঁকে রওসোনিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। তিনি হিজরী ১০তম সন (১৫২৫-২৬ খ্রিঃ) অধিক বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবুল ফজল এই বইয়ের দ্বিতীয় ভাগের শেষ আইনে তাঁকে চার হাজারী মনসবদার বলেছেন। সম্ভবত এই উচ্চ পদ তিনি তাঁর নিজাম-ই হারাবী ও দেওয়ান থাকাকালীন সময়ে অধিকার করেছিলেন। রাজপুত্র দানিয়েলের শিক্ষক থাকাকালীন সময়ে তিনি সাড়ে চার হাজারী মনসবাদের উন্নীত হন। কুলিজ খান একজন অতি ধার্মিক ও গোড়া সুন্নী

কম করতেন সেখানে তিনি দশ দাম কম ধার্য করেন। আর আগে যেখানে দশ দাম কম ধরা হত সেখানে তিনি বিশ দাম কম ধার্য করেন। আবার কোন মোহর ওজনে দেড় মুর্কের কম হলেই তিনি সেটাকে তাল সোনা বলে ধরে নিতেন ; এমনি করে যে রুপিয়ার ওজন এক মুর্কের বেশি কম তা তাল রূপা বলে ধরতেন। সবশেষে সম্রাট স্বয়ং নানাবিধ জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকায় তার পরামর্শদাতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে প্রথমে এই বিষয়ের বিশেষ নজর দিতে পারেন নি। কিন্তু শেষ যখন এই ব্যাপারে নানাবিধ গণ্ডগোলের সংবাদ পেলেন তখন তিনি আর একটা আদেশ জারি করে রাষ্ট্রের অনেক ক্ষতি বাঁচিয়ে দিলেন এবং চতুর্দিকে সকলেই এই বিধানের ভূয়সী প্রশংসা করল। পবিত্র সালের ৩৬ সৎসরের ২৬শে বাহমান তারিখে (খ্রিষ্টীয় ১৫৯২ সালে) যে দ্বিতীয় (আজুদী) প্রথা প্রয়োগ করলেন, শুধু একটি মাত্র ব্যতিক্রম হল, অর্থাৎ যদি কোনো মোহরের খাদ তিন মুর্কের কম না হয় এবং কোনো টাকার খাদ ছয় মুর্কের বেশি না হয় তাহলে সেগুলোকে খাঁটি বলে ধরে নিতে হবে। এই বিধান তিনি অনুমোদন করলেন না। আর এই বিধানটিই হল অসাধু লোক প্রতারণামূলক কার্যাবলী বন্ধ করার একমাত্র কার্যকর বিধান। কারণ আগের বিধানগুলোতে টাকশালগুলোর কর্মচারীদের উপরোক্ত খাঁদ মিশানোর অথবা যখন খাজাঞ্চীর নিখাদ মুদ্রাতে উপরোক্ত রূপ খাদ মিশাত তা রোধ করার কোনো পথ ছিল না। তাছাড়া নির্লজ্জ চোর প্রকৃতির লোকেরা কম ওজনের মুদ্রা তৈরি করত এবং তিন গ্রেন খাদের মোহরকে ছয় গ্রেন খাদের মোহর বলে ধরত। এইভাবে মুদ্রার খাদ বাড়ানো চলতে থাকার ফলে প্রচুর স্বর্ণ চুরি হত এবং এই ক্ষতির কোনো পরিসীমা ছিল না। সম্রাটের আদেশে বাবাঘোরী গ্রেনের মাপ প্রচলিত হয়, এবং তাতে মাপ নেবার ব্যবস্থা হয়। সেই একই দিন আরও কতিপয় কঠোর বিধান জারি করা হয় যেমন খাঞ্চী ও তহশিলদারগণ খাজনাদাতাদের কাছ থেকে কোনো বিশেষ ধরনের মুদ্রা দাবি করতে পারবে না। যে মুদ্রাই তারা দেয় না কেন তাই গ্রহণ করতে হয় এবং বর্তমান বিধান অনুযায়ী মুদ্রার মান নির্ণয় করে তা গ্রহণ করতে হবে। সম্রাটের এই আদেশ অসাধু লোকদের হতাশা করল, লোভী লোকদের সংযমী করল জাতিকে শোষকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করল।

মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যে সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করতেন। কবি হিসেবে তিনি উলকাতী নামে পরিচিত ছিলেন। সিরাতুন আলমের যে অধ্যায় তাঁর কিছু কবিতা পাওয়া যাবে। তিনি যে উচ্চ পদ অধিকার করেছিলেন তা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলেই সম্ভব হয়েছিলে। তাঁর দুই ছেলে মীর্জা শায় পূল্লাহ ও মীর্জা হোসেন কুলিজ এর মধ্যে দ্বিতীয় জনই সমধিক পরিচিত।

আইন-১১
দিরহাম ও দিনার

সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রার একটা বিবরণ দেওয়া হল। এবার আমি দিরহাম ও দিনার এই প্রাচীন মুদ্রার সামান্য বিবরণ দেব এবং তাদের মান নির্ণয় করব।

দিরহাম একটি রৌপ্য মুদ্রা। আকার অনেকটা নাম ফলকের মতো। খলিফা ওমরের খিলাফতের সময় এর আকার পরিবর্তন করে গোলাকৃতি করা হয় এবং জোবায়ের এতে আল্লাহ বরাকত শব্দটি খোদাই করা হয়।

হাজ্জায পরে কোরানের ইখলাছ নামক অনুচ্ছেদটি মুদ্রিত করেন এবং লোকে বলে যে সে এতে তার নামও খোদাই করেছিল। কেউ কেউ আবার বলেন যে খলিফা ওমরই সর্বপ্রথম দিরহামে ছাপ দেয় ; আবার কারও মতে গ্রীক খুসরীয় ও হিসাবীয় দিরহাম সারওয়ানের পুত্র খলিফা আব্দুল মালেকের সময় চালু ছিল এবং তাঁরই আদেশে ইউসুফের পুত্র হাজ্জায দিরহাম মুদ্রিত করেন। কেউ কেউ আবার বলেন যে হাজ্জাজ খাদযুক্ত দিরহামগুলোকে পরিশোধন করে সেগুলোতে আল্লাহ আহাদ (আল্লাহ এক) এবং আল্লাহ সামাদ (আল্লাহ অসীম) এই কথাগুলো মুদ্রিত করেন। এই দিরহামগুলোকে মাকরুহ (মূর্খ) বলা হয় ; কারণ এতে আল্লাহর পবিত্র নামের অসম্মান করা হয়েছে তবে যদি এটা অন্য কোনো নামের অপভ্রংশ হয় সে আলাদা কথা। হাজ্জাযের পরে ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালেকের খিলাফতের সময় ইরাকে ওমর বিন সুবায়রাহ হাজ্জাযের চেয়ে ভাল দিরহাম মুদ্রিত করেন এবং এরও পরে খালিদ বিন আবদুল্লাহ কাছরি ইরাকের শাসনকর্তা থাকাকালে এগুলোকে আরও উন্নত করেন ; কিন্তু এগুলোকে সর্বোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধতায় পরিণত করেন ওমরের পুত্র উইসুফ। আবার কেউ কেউ বলেন যে মুসাবিন জোবায়েরই সর্বপ্রথম দিরহাম মুদ্রণ করেন। এগুলোর ওজন সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের বিবরণ দেয়া হয়েছে। কেউ বলেন এগুলো দশ বা নয় অথবা ছয় বা পাঁচ মিশকাল ওজনের। আবার কেউ কেউ বলেন এগুলো বিশ, বারো ও দশ কিবরত ওজনের, তারা আরও বলেন যে ওমর এর প্রত্যেকটি দিরহাম নিয়ে চৌদ্দ কিরাতের একটি দিরহাম তৈরি করেন। এটা সবগুলোর মোট পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ। এমনি আরও বলা হয় যে ওমরের সময় নানা রকমের দিরহাম প্রচলিত ছিল। প্রথমত কতগুলো ছিল আট দাংগের। এগুলোকে ধাতুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষক রাস বাখলের নামানুসারে বাখলি বলা হত। তিনি ওমরের আদেশানুযায়ী দিরহাম মুদ্রণ করেছিলেন ; কেউ কেউ আবার এগুলোকে বাখাল নামে এক গ্রামের নামানুসারে এগুলোকে বাখাল্লি বলত। দ্বিতীয়ত, কতকগুলো ছিল দাংগের এগুলোকে বলা হত তাব্রি। তৃতীয়ত, কতকগুলো ছিল তিন দাংগের এগুলো মাগরিবী নামে

পরিচিত ছিল। কিছু ছিল এক দাংগের, সেগুলোর নাম ছিল ইয়ামানি। এই চার রকম মুদ্রার অর্ধেক নিয়ে ওমর আনুপাতিক এক ওজনের মুদ্রার প্রচলন করেন। খুজান্দের সাজিল বলেন যে আগের দিনে দিরহাম দুরকমের হত। প্রথমত, আট ও ছয় দাংগের বিশুদ্ধ দিরহাম (তার ১ দাংগ = ২ কিরাত ; ১ কিরাত = ২ তাসুজ (Tassuj) ; ১ তাসু–২ হাব্বাহ ; আর দ্বিতীয়ত, চার দাংগের কিছু বেশি ওজনের কিন্তু খাদ মিশ্রিত। অনেকে এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

দিনার হল এক মিশকাল ওজনের স্বর্ণমুদ্রা অর্থাৎ এর ওজন হল ১$\frac{৩}{৭}$ দিরহাম, কারণ তাদের মতে ১ মিশকাল = ৬ দাংগ = ৪ তাসুজ ; ১ তাসুজ = ২ হাব্বাব ; ১ হাব্বাব = ২ পব (বার্লিজব) ; ১ পব = ৬ খারদল (সরিয়া) ; ১ খারদল = ১২ ফসল ; ১ ফসল = ৬ কার্তিল ; ১ কার্তিল = ৬ নাকির ; ১ নাকির = ৬ কিতাসির ; ১ কিতাসির = ১২ জারা। এই হিসাব মতে এক মিশকাল ৯৬ জবের সমান। মিশকাল হল স্বর্ণ ওজন করার মান এবং এটা স্বর্ণ মুদ্রারও মান। কোনো কোনো প্রাচীন লেখা থেকে মনে হয় যে গ্রীক মিশকাল এখন আর ব্যবহৃত হয় না এবং তা এই ওজন থেকে দুই কিরাত কম। তেমনি গ্রীক দিরহাম ও অন্যান্য দিরহামের চেয়ে কম ওজনের—এক মিশকালের $\frac{১}{৬}$ বা $\frac{১}{৪}$ কম।

আইন-১২

স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবসায়ীদের মুনাফার হার

১১ মাসার একটা মোহর দিয়ে দশ বানের এক তোলা স্বর্ণ কেনা যায় ; অথবা ৯$\frac{৩}{৪}$ বানের ১ তোলা ২ মুর্ক সোনা বা ৯$\frac{১}{২}$ বানের ১ তোলা ৪ মুর্ক ; ৯$\frac{১}{৪}$ বানের ১ তোলা ৬ মুর্ক, ৯ বানের এক তোলা এক মাসা সোনা পাওয়া যায়। এইরূপে একই হারে একটা মোহর প্রতি বান কম বিশুদ্ধতার জন্যে এক মাসা পরিমাণ ওজনের স্বর্ণ বেশি কিনতে পারে।

ব্যবসায়ীগণ ১০০টা লাল-ই-জালালী মোহর দিয়ে ১৩০ সোনা ২ মা $\frac{৫}{৮}$ সু ৮$\frac{১}{৪}$ বানের গুণ সোনা কিনতে পারে। এর মধ্যে ২২ তোঃ মাঃ ৯ মাঃ ৭$\frac{১}{২}$ সু গলানোর সময় পুড়ে যায় এবং থাকাই খালাসের সাথে মিশে যায়। ফলে ১০৭ তোঃ ৪ মাস ১$\frac{১}{৮}$ মুঃ বিশুদ্ধ সোনা থাকে। আর তা দিয়ে তারা ১০৫টি মোহর তৈরি করার পরও আধ তোলা স্বর্ণ অবশিষ্ট থাকে। যার দাম প্রায় ৪ কাটা। তাছাড়া খাক-ই-খালাস থেকে ২ তোঃ ১১ মাঃ ৪ মু সোনা, ১১ তোঃ ১১ মাঃ ৪$\frac{১}{২}$ মু রূপা যার মোট দাম ৩৫ টাকা ১২$\frac{১}{২}$ তংগা তা উদ্ধার করা হয়। ফলে উপরোক্ত পরিমাণ গুণ সোনা থেকে সর্বমোট ১০৫টি মোহর ও ৩৯ টাকা ২৫ দাম পাওয়া যায়।

এই অর্থ নিম্নলিখিত হারে ভাগ হয়। প্রথমত পূর্বে বর্ণিত হার মতে ২ টাকা, ১৮ দাম ১২$\frac{১}{২}$ জিঃ শ্রমিকগণ পায়। দ্বিতীয়ত, ৫ টাকা ৮ দাম ৪ জিঃ খরচ হয় উপকরণের দাম হিসেবে- এর মধ্যে ১টা, ৪দা ১$\frac{১}{২}$ জিঃ হল সোনা বিশুদ্ধকরণে যে সব জিনিসপত্র লাগে তার দাম অর্থাৎ ২১ দাঃ ১৬$\frac{১}{২}$ জিঃ এর গোবর, ৪ দাম ২০ জিঃ এর সালোনী ; ১ দাম ১০ জি এর পানি ; ১১ দাঃ ৫ জিঃ এর পারদ আর ৪টা দাঃ ৬$\frac{১}{৪}$ জিঃ মূল্যের খাক-ই খালাসের (অর্থাৎ ২১ দাঃ ৭$\frac{১}{২}$ জিঃ এর কাঠ কয়লা ও ৩টাঃ ২২দাঃ ২৪ জিঃ সীসা) ; তৃতীয়ত, ৬টা ৩৭$\frac{১}{২}$ দাঃ সোনার মালিক ব্যবসায়ী থেকে সোনা ধার দেওয়ার জন্যে পায় ; সোনা যদি সরকারি কোষাগার থেকে আসে তা হলে এই টাকাটা দেওয়ান পায় ; চতুর্থত, ব্যবসায়ী সে যে সোনা এনেছিল তার পরিবর্তে ১০০ লা-লী জালালী মোহর পায়। পঞ্চমত, ১১টাঃ ৩৭দাঃ জি ব্যবসায়ী তার মুনাফা হিসাবে নেয়। ষষ্ঠত, ৫ মোহর ১২ টাঃ ৩$\frac{১}{২}$ দাঃ সরকারি কোষাগারে যায়। ব্যবসায়ীগণ এই হারে তাদের মুনাফা পায়।

হিন্দুস্থানে সোনা আমদানী হলেও এ দেশের উত্তরাঞ্চলের পর্বতসমূহে ও তিব্বতে এটা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাছাড়া সালোনী প্রক্রিয়ায় গদা সিন্ধু ও অন্যান্য কতিপয় নদীর

বাষ্প থেকে সোনা উদ্ধার করা যায় ; কারণ এই দেশের অধিকাংশ পানির সঙ্গেই স্বর্ণ মিশ্রিত আছে। তবে এভাবে স্বর্ণ উদ্ধার করতে যে শ্রম ও খরচ সোনার দামের চেয়ে তা বেশি পড়ে যায়।

এক টাকা দিয়ে ১ তো ০ মা ২ সু খাঁটি কিনতে পাওয়া যায়। সুতরাং ৯৫০ টাকা দিয়ে ব্যবসায়ীরা ৯৬৯ তোঃ মাঃ ৪ সু রূপা কিনতে পারে। এর থেকে ৫ তোঃ ০ মাঃ ৪$\frac{৩}{৪}$ সব বাট ঢালাই করতে পুড়ে যায়। বাকিটা থেকে ১০৬ টাকা এবং ২৭$\frac{১}{২}$ দাম মূল্যের রৌপ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন খাতের পরিমাণ হল এরূপ :

প্রথমত ২টা, দাঃ ১২ জিঃ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক (অর্থাৎ ওজনকারী পায় ৫ দাঃ ৭$\frac{৩}{৪}$ জিঃ চাসনিগীর পায় ৩ দাম ৪$\frac{১}{৪}$ জিঃ গালাইকার পায় ৬ দাঃ ১২$\frac{১}{২}$ জিঃ পারবার পায় ২টা ১দা, চিন্তাচী পায় ৬ দামঃ ১২$\frac{১}{২}$ জিঃ)। দ্বিতীয়ত, ১০দা ১৫ জি হল জিনিসপত্রের দাম (অর্থাৎ ১০ দামের কাঠ কয়লা ০ ১৫ জি এর পানি) ; তৃতীয়ত, ৫০টা ১৩দা দিতে হয় দেওয়ানকে ; চতুর্থত, ব্যবসায়ী ৯৫০ টাকা পায় যে রূপা সে কিনেছিল তার বিনিময়ে এবং পঞ্চমত ৩টা ২১ দা ১০$\frac{১}{২}$ জি ব্যবসায়ী পায় মুনাফা হিসেবে। কিন্তু সে যদি নিজের ঘরে রৌপ্য পরিশোধন করে তাহলে তার মুনাফা অর্ধেক বেশি হয় ; কিন্তু যদি শুধু মুদ্রা বানানোর জন্যে আনে তাহলে তার মুনাফা তত বেশি হবে না।

লারী ও শাহী নামীয় রৌপ্য এবং উপরিউক্ত অন্যান্য রকমের খাদ মিশ্রিত রৌপ্য এক টাকা ১ তো ০ মা ৪ সুঃ পাওয়া যায়। ফলে ৯৫০ টাকায় পাওয়া যায় ৯৮৯ তোঃ ৭ মাঃ। সাব্বাকী প্রক্রিয়ায় শতকরা ১$\frac{১}{২}$ তোলা হারে এর থেকে ১৪ তো ১০ সা ১ সু পুড়ে যায় এবং ঢালাই করে বাট বানাতে আগুনে নষ্ট হয় ৪ তোলা, ১১ মা ৩ সু। বাকি রূপাতে ১০১২ টাকা তৈরি হয় আর খাক-ই খারাল থেকে ৩$\frac{১}{২}$ টাকা উদ্ধার হয়। এর থেকে নিম্নরূপ হারে ভাগ হয় ; প্রথম ৪ টাকা ২৭ দা ২৪$\frac{৩}{৪}$ জি যায় শ্রমিকদের বেতন (মাপক পায় ৫ দাঃ ৭$\frac{৩}{৪}$ জিঃ সাব্বাক পায় ২টা, ০ দা, ১৯জিঃ ; কুরসকব পায় দাঃ ১৯ জিঃ চাসীনীগীর পায় ৩ দাঃ ৪ জি ; গালানীকার পায় ৬ দা ১২$\frac{১}{২}$; জরার পায় ২টা ১ দাঃ শিক্কাচী ৬ দা ১২$\frac{১}{২}$ জি) ; দ্বিতীয়ত ৫ টাকা ২৪ দাঃ, ১৫ জি খরচ হয় জিনিসপত্রের জন্যে (যেমন ৫টা ১৪ দামের সীসা, ১০ দামের কাঠ কয়লা ও ১৫ জিতলের পানি) ; তৃতীয়ত ৫০ টাকা ১৪ দাম দিতে হয় রাষ্ট্রকে ; চতুর্থত ব্যবসায়ীগণ ৯৫০ টাকা পায় তার রূপার জন্য ; পঞ্চমত ৪টা ২৯ দা হল তার মুনাফা[৬৬]। কখনো রূপা কিনতে পারে। ফলে তখন তাদের মুনাফাও বেড়ে যায়।

---

৬৬. এ সবের মোট পরিমাণ আবুল ফজল যা লিখেছেন তারচেয়ে কিছু বেশি হয় ; তিনি লিখেছেন ১০১৫ টাকা ২০ দাম, কিন্তু সবগুলো যোগ করলে হয় ১০১৫ টাকা ২৫ দাম ১৪$\frac{৩}{৪}$ জিতল।

১০৪৪ দামে এক মতে তামা পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রতি সেরের দাম হয় ২৬ দা ২$\frac{১}{২}$ জিঃ। এর থেকে গলানোর সময়[৬৭] সের পুড়ে যায় ; আর যেহেতু প্রতি সেরে ৩০ দাম হয়, সর্বমোট এতে ১১৭০টি দাম তৈরি হয় ; এর থেকে ব্যবসায়ী তার মূলধন ১৮ দা ১৯$\frac{১}{২}$ জিতল মুনাফা নেয়, ও ৩০ দাম ৪ জিঃ যায় শ্রমিকদের বেতন ; আর ১৫ দা ৮ জিঃ খরচ হয় জিনিসপত্রের জন্যে (যেমন ১৩ দা ৮ জি কাঠ কয়লার জন্যে, ১ দা পানির জন্যে, আর ১৬ মাটির জন্যে) ; ৫৮$\frac{১}{২}$ দা রাষ্ট্রের প্রাপ্য হয়।

৬৭. উচ্চ থেকে যা পতিত হয় যেমন বৃষ্টি, তুষার ইত্যাদি।

আইন-১৩

ধাতুর উৎপত্তি

সৃষ্টিকর্তা চারটি মৌলিক পদার্থ সৃজন করে অতি চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন। অগ্নি, প্রচণ্ড উষ্ণ, শুষ্ক ও হালকা ; বায়ু সামান্য গরম, আর্দ্র ও হালকা ; পানি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, আদ্র ও ভারী ; মাটি বেশ ঠাণ্ডা, শুষ্ক ও ভারী। উষ্ণতা হালকা করে আর শৈত্য ভারি করে। আর্দ্রতা সহজেই বস্তুকণাকে পৃথক করে অথচ শুষ্কতা বস্তুকণায় পৃথকীকরণ বন্ধ করে। এই চমৎকার ব্যবস্থায় ফলে চারটি মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত আসরাই উলাভী। দ্বিতীয়ত পাথর। তৃতীয়ত গাছগাছড়া, চতুর্থত জীবজন্তু। সূর্যের উত্তাপে জলীয় পদার্থ হালকা হয়ে বায়ুর সাথে মিশ্রিত হয় ও উপরে উঠে। এই মিশ্রিত বস্তুকে বলা হয় বুখার (bukhar) বা গ্যাস। এই একই কারণে ধূলিকণা বাতাসের সাথে মিশ্রিত হয় এবং আকাশে উড়ে। এই মিশ্রিত বস্তুকে বলা হয় দুখান বা বাষ্প। কখনও বায়বীয় পদার্থ ধূলিকণার সাথে মিশে। অনেক দার্শনিক উপরের উভয় রকমের বস্তুকেই বুখার বলে তবে তাদের বিভিন্নতা বুঝাবার জন্যে জলীয় পদার্থ ও বায়ুর সংমিশ্রণকে বলে আর্দ্র বুখার আর ধূলিকণা আর বায়ুর মিশ্রিত পদার্থকে বলে শুষ্ক বুখার বা দুখানি বুখার (Dukhani Bukar)। তাঁরা বলেন উভয় মিশ্রণই পৃথিবীর উপরে সংঘটিত হয়, যেমন মেঘ, বাতাস, বৃষ্টি, তুষার ইত্যাদি এবং মাটির নিচেও সংঘটিত হয় যেমন ভূকম্পন, প্রশ্রবণ ও খনিজ পদার্থ। তাঁরা বুখারকে বস্তুর দেহ ও দুখানকে তার প্রাণ বলে মনে করেন। এদের পরিমাণ ও প্রকৃতির তারতম্যের হেরফেরের ফলে বিভিন্ন জিনিসের গঠন সম্পন্ন হয় ; যার বিবরণ দর্শনের পুস্তকাদিতে লিপিবদ্ধ আছে।

ধাতু পাঁচ প্রকারের হয় ; প্রথমত যেগুলো শুষ্কতার জন্যে দ্রবীভূত হয় না যেমন ইয়াকৃত। দ্বিতীয়ত যেগুলো তাদের জলীয়তার জন্যে দ্রবীভূত হয় না যেমন পারদ। তৃতীয়ত যেগুলোকে নমনীয় বা দাহ্য না হলেও গলানো যায়, যেমন নীল পাথর ; চতুর্থত যেসব পদার্থ নমনীয় নয় কিন্তু দাহ্য তবে সেগুলো গলানো যায় ; যেমন গন্ধক। পঞ্চমত যেসব পদার্থ নমনীয় কিন্তু দাহ্য নয় তবে গলানো যায় যেমন স্বর্ণ। কোনো পদার্থ গলানো যায় বলে ধরা হয় যখন শুষ্কতা ও আর্দ্রতার স্বাভাবিক মিশ্রণের ফলে তার অণুগুলো স্থানান্তরিত করা যায় ; আর কোনো বস্তুকে নমনীয় বলা হয় তখন যখন এর থেকে কোনো অংশ পৃথক না করে বা কোনো বস্তু না মিশিয়ে তাকে সম্প্রসারিত বা বিস্তৃত করা যায়।

কোনো বুখার ও দুখানের সংমিশ্রণে যদি প্রথমটা পরিমাণে অধিক হয় এবং যখন তাদের পরিপূর্ণ সংমিশ্রণের পর সূর্যের তাপের ফলে তার সংকোচন হয় তখন পারদের সৃষ্টি হবে। যেহেতু এর কোনো অংশই দুখান ছাড়া নেই সেহেতু শুষ্কতা অনুধাবনযোগ্য। ফলে তা ধরলে

হাতের কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু হাত শরীরে আনতে হয় ও যেহেতু উত্তাপের ফলে এর সংকোচন হয়েছে, তাপ আর একে গলাতে পারবে না। আবার বুখার ও দুখানের কোনো সংমিশ্রণে উভয়ই প্রায় সমপরিমাণ থাকে একটা বেশ আঁঠালো ভেজা জিনিসের সৃষ্টি হয়। এটা গাঁজানোর সময় এতে বাতাস প্রবেশ করে। ফলে ঠাণ্ডায় তা জমে যায়। এটা দাহ্য পদার্থ। যদি দুখান ও আঁঠালো রকমটা কিছুটা বেশি হয় তখন লাল বা হলদে, বা ধূসর বা সাদা গন্ধকের সৃষ্টি হয়। যদি দুখানের ভাগ বেশি হয় আর আঁঠালো বস্তুর ভাগ কম হয় তাহলে লাল ও হলদে রংএর আর্সেনিকের সৃষ্টি হবে। আর যদি বুখারের হার অধিক হয় তা হলে জিনিসটা শক্ত হলে খাঁটি কালো ও হলদে রংএর ন্যাপথার সৃষ্টি হবে। যেহেতু এগুলোতে ঠাণ্ডা দ্বারাই সংকোচন হয় ফলে এগুলোর সবই গলানো যায় ; আর এটা আঁঠাযুক্ত ও ভেজা হওয়ায় দাহ্যও হয়, কিন্তু জলীয়তার ফলে তা নমনীয় নয়।

যদিও পারদ ও গন্ধকই মান সপ্ত বস্তুর উপাদান, তাদের মিশ্রণের বিচিত্রতার দ্বারা অথবা বিভিন্ন উপাদানের একের উপর অন্যের প্রভাবের তারতম্যের ফলে নানারূপ বস্তুর রূপ পরিগ্রহ করে। এইরূপে যখন উপাদান দুইটির কোনটাই মৃত্তিকার সাথে মিশ্রিত হয় না এবং সেগুলো যখন পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ থাকে এবং পরস্পরের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিশে যায় এবং যখন গন্ধক সাদা হয় এবং পরিমাণে পারদের চেয়ে কম হয় তখনই রৌপ্যের সৃষ্টি হয়। তেমনি যখন উভয় উপাদানই সমপরিমাণ হয় আর গন্ধক লাল হয় এবং তা রাঙাতে সমর্থ হয় তখন স্বর্ণের সৃষ্টি হয়। আবার ঠিক এরূপ অবস্থায়ই যদি উভয় উপাদানই মিশ্রিত করার পর কিন্তু পরিপূর্ণভাবে মিশে যাওয়ার পূর্বে সংকোচিত হয় তাহলে খারচিনি (kharchini) তৈরি হবে। এই জিনিসটা অহনচিনি (Ahanchini) নামেও পরিচিত। তবে মনে হয় আসলে জিনিসটা কাঁচা সোনা। আবার কেউ বলেন এটা এক প্রকমের তামা। আবার কেউ বলেন এই গন্ধকটাই খাদ মিশ্রিত হয় আর পারদ পরিমাণে বেশি থাকে, আর তা অতিরিক্ত দাহ্য শক্তিসম্পন্ন হয় তাহলে তামার সৃষ্টি হবে। আর যদি উপাদান দুটি সম্পূর্ণরূপে না মিশে আর পারদের অংশ বেশি হয় তা হলে টিব সৃষ্টি হবে। কেউ কেউ বলেন যে এ ব্যাপারে উপাদান দুইটি বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। যদি উভয় উপাদানই নিকৃষ্ট মানের হয় আর তা ভালভাবে মিশ্রিত হয়। আর যদি পারদের সাথে ধূলিকণাগুলো আলাদা হবার মতো গুণসম্পন্ন হয় এবং যদি উভয় উপাদানের মিশ্রণ সম্পন্ন না হয় আর তাতে পারদের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি হয়, তাহলে সীসা তৈরি হবে। এই সাত ধাতুকেই বলে "সপ্ত বস্তু" এবং পারদকে বলা হয় বস্তুদের মাতা আর গন্ধককে বলা হয় পিতা। তাছাড়া পারদকে বলা হয় জীবনীশক্তির প্রাণ আর আরসেনিক ও গন্ধককে বলা হয় তার কেন্দ্র।

				বৎসর
রাজা ভাগবত	ক্ষত্রী রাজত্ব	করেছিলেন	--	২১৮
আনন্দ ভমী			--	১৭৫
রঙ্গ ভীম			--	১০৮
গজভীম			--	৮২

দেওদত	--	৯৫
জগসিং	--	১০৬
বর্মাসিং	--	৯৭
মোহন দত্ত	--	১০২
বিনোদ সিং	--	৯৭
মিলার সেন	--	৯৬
সত্তর জিত	--	১০১
ভূপত	--	৯০
মধরক	--	৯১
জয় ধ্রুক	--	১০২
উদয় সিং	--	৮৫
বিশু সিং	--	৮৮
বীরনাথ	--	৮৮
রুখদেব	--	৮১
রাখবিন্দ (রুখনন্দ)		৭৯
জগজীবন	--	১০৯
কালুদানন্দ	--	৮৫
ব্যাসদেব	--	৯০
বিজয়করণ	--	৭১
মতসিং	--	৮৯

কায়েত সম্প্রদায়ের নয়জন রাজপুত্র পরপর ৫২০ বৎসর রাজত্ব করেন। তারপর সার্বভৌমত্ব অন্য একজনের হাতে চলে যায়।

কায়েত বংশ

রাজা ভোজগোড়ীর রাজত্ব করেছিলেন	--	৭৫
লালসেন	--	৭০
রাজা মধু	--	৬৭
সমান্ত ভোজ	--	৪৮
রাজা জয়ন্ত	--	৬০
পির্থুরার	--	৫২
রাজা গ্রর	--	৪৫
রাজা লছমন		৫০
রাজা নন্দভোজ	--	৫৩

এগার জন রাজপুত্র উত্তরাধিকারী সূত্রে পরপর ৭১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। এরপর আর একটি কায়েত বংশ শাসনক্ষমতা লাভ করে।

		বৎসর
রাজা উদসুর (আদিসুর)	রাজত্বকাল	৭৫
রাজা দেমনীডান		৭৩
রাজা উনরূদ		৭৮
রাজা পারতার রুদ্র		৬৫
রাজা ভাওদাতা		৬৯
রাজা রুকদেব		৬২
রাজা গিরিধর		৮০
রাজা পৃথিধর		৬৮
রাজা শিশিতধর		৫৮
রাজা প্রভাকর		৩৩
রাজা জয়ধর	,,	২৩

দশজন রাজপুত্র ৬৯৮ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তারপর অপর এক কায়েত বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

		বৎসর
রাজা ভোপাল	রাজত্বকাল	৫৫
রাজা থ্রিপাল		৯৫
রাজা দেবপাল		৮৩
রাজা ভূপতিমাল		৭০
রাজা ধনপতি পাল		৪৫
রাজা বিজন পাল		৭৫
রাজা জয়পাল		৯৮
রাজা রাজপাল		৯৮
রাজা ভোগপাল, তার ভ্রাতা		৫
রাজা দেবপাল, তার পুত্র		৭৪

সাতজন রাজপুত্র উত্তরাধিকার পরপর ১৬০ বৎসর রাজত্ব করেন।

		বৎসর
সুখ সেন	রাজত্বকাল	৩
বলাল সেন, যিনি গৌড়ের দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন রাজত্বকাল		৫০
লক্ষণ (লছমন) সেন		৭
মধু সেন		১০
কেসু সেন		১৫

সদা (সুর) সেন	১৮
রাজা নোজা (বুদ্ধ সেন?)	৩

এরূপে ৬১ জন রাজপুত্র ৪৫৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তারপর বাংলাদেশ দিল্লীর নৃপতিদের অধীনস্থ হয়।

সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবকের সময় হতে সুলতান মুহম্মদ তুঘলক শাহ পর্যন্ত ১৭ জন প্রাদেশিক শাসনকর্তা ১৫৬ বৎসর শাসন করেন। তাঁদের পরে আসেন—

হিজরী	খ্রি:			বৎসর	মাস
৭৪১	১৩৪০	মালিক ফখরুদ্দীন শিলাহদার	রাজত্বকাল	২	০
৭৪৩	১৩৪২	সুলতান আলাউদ্দিন		১	
৭৪৪	১৩৪৩	শামসুদ্দীন ভান্দারা ইলিয়াস		১৬	
৭৬০	১৩৫৮	সিকন্দার (শাহ), তাঁর পুত্র		৯	
৭৬৯	১৩৬৭	সুলতান খিয়ামুদ্দীন, তাঁর পুত্র		৭	
৭৭৫	১৩৭৩	সুলতান উস সালাতিন, তাঁর পুত্র		১০	
৭৮৫	১৩৮৩	শামসুদ্দীন, তাঁর পুত্র		৩	
৭৮৭	১৩৮৫	কাজসি, বাংলার দেশীয় লোক		৭	
৭৯৪	১৩৯২	সুলতান জালালুদ্দীন		১৭	
৮১২	১৪০৯	সুলতান আহমদ, তাঁর পুত্র		১৬	

তাঁর ক্রীতদাস নাসির রাজত্ব করেন এক সপ্তাহ, আবার কারো মতে অর্ধদিন।

৮৩০	১৪২৬–২৭	নাসির শাহ, শামসুদ্দীন ভান্দার বংশধর	রাজত্বকাল	৩২	০
৮৬২	১৪৫৭	বারবক শাহ,		১৭	
৮৭৯	১৪৭৪	ইউসুফ শাহ,		৭	,,
৮৮৭	১৪৮২	সিকান্দর শাহ,		--	অর্ধদিন
৮৮৭	১৪৮২	ফখ শাহ,		৭	৫
৮৯৬	১৪৯০	বারবক শাহ,			আড়াই দিন
৮৯৭	১৪৯১	ফিরোজ শাহ		৩	০
৮৯৯	১৪৯৪	মাহমুদ শাহ, তাঁর পুত্র		১	
৯০০	১৪৯৫	মুজাফফর হাবশী		৩	৫
৯০৩	১৪৯৮	আলাউদ্দীন		২৭	
৯২৭	১৫২১	নসরত শাহ, তাঁর পুত্র		১১	
৯৪০	১৫৩৪	মাহমুদ শাহ, আলাউদ্দিনের পুত্র, পরাজিত করেন।			
৯৪৪	১৫৩৭	শের খান			

৯৪৫	১৫৩৮	হুমায়ুন (গৌড়ে দরবার করেন)
৯৪৬	১৫৩৯	শেরখান, দ্বিতীয়বার
৯৫২	১৫৪৫	মুহম্মদ খান
৯৬২	১৫৫৫	বাহাদুর শাহ, তাঁর পুত্র (খিলয়াসুদ্দীন, তাজ খান)
৯৭১	১৫৬৩–৪	সুলায়মান, তাঁর ভ্রাতা বায়জিদ, তাঁর পুত্র
৯৮১	১৫৭৩	
৯৮১	১৫৭৩	দাউদ, তাঁর ভ্রাতা (আকবরের বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হন)।

৫০ জন রাজপুত্র প্রায় ৩৫৭ বৎসর শাসন করেন এবং একশত এগার জন প্রায় ৪৮১৩ বৎসর কাল সময়ে সার্বভৌমত্বের শিখা প্রজ্জ্বলিত রেখে অনন্ত নিদ্রায় চলে গিয়েছেন।

প্রথম রাজা (জগদত্ত) রাজা দুর্যোধনের সাথে তাঁর বন্ধুত্বের ফলে দিল্লীতে আগমন করেন এবং বর্তমান সময়ের ৪০৯৬ বৎসর পূর্বের মহাভারতের যুদ্ধে বীরোচিতভাবে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেন। যখন রাজা নৌজার [তিনি নদীয়ার রাজা হবেন] জীবনের পাত্র পূর্ণ হয়ে যায়, সার্বভৌমত্ব রায় লক্ষণের পুত্র লক্ষনিয়ার হাতে চলে যায়। সেই সময়ে নদীয়া বাংলার রাজধানী ছিল এবং নানাবিধ বিদ্যাশিক্ষারও কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে এর শ্রীবৃদ্ধিতে কিছুটা ভাটা পড়লেও এর পাণ্ডিত্যের চিহ্নসমূহ এখনও বর্তমান। জ্যোতিষীগণ তার রাজত্বের অবসান হবে এবং অন্য এক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল এবং তারা মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীকে এই দুই কার্য সম্পাদনের লোক বলে চিনতে পারেন। রাজা এইসব ভবিষ্যৎবাণীকে কল্পনা বলে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করলেও তার প্রজাদের বহু সংখ্যক দূরদেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কুতবুদ্দীন আইবক যখন শাহাবুদ্দীনের পক্ষে ভারতবর্ষ রক্ষা করছিলেন, তখন খিলজী অস্থির বলপ্রয়োগে বিহার অধিকার করেন। রাজা একটি নৌকাতে চড়ে পলায়ন করেন। মুহম্মদ বখতিয়ার বাংলাদেশে অভিযান করেন। মুহম্মদ বখতিয়ার বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করেন। তিনি নদীয়া শহর ধ্বংস করে দেন এবং রাজধানী লক্ষণাবতীতে স্থানান্তরিত করেন। সেই সময় হতে বাংলাদেশ দিল্লীর রাজাদের অধীন।

সুলতান তুঘলকের রাজত্বকালে কদর খান বাংলায় রাজ প্রতিনিধি ছিলেন। তার তরবারি বাহক মালিক ফখরুদ্দীন ক্ষমতার লোভে বশবর্তী হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা তার প্রভুর নিহত করবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং গোপনে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করেন এবং ছলনাপূর্ণ অভিযোগ করে প্রতারণাপূর্বক শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং দিল্লীর সুলতানদের আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকার করেন। কদার খান প্রধান অনুচরদের অন্যতম মালিক আলী মুবারক আলাউদ্দীন নাম ধারণ করে ফখরুদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাকে যুদ্ধে বন্দী করে প্রাণদণ্ড দান করেন। হাজী ইলিয়াস আলাই নামে বাংলার একজন আমীর অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে হত্যা করেন এবং শামসুদ্দীন নাম গ্রহণ করেন।

তাকে ভাদায়াও বলা হয়। সুলতান ফিরোজ তাঁকে শাস্তি দিতে দিল্লী হতে অভিযান করেন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়, কিন্তু বর্ষাকালে সমাগত দেখে তিনি দ্রুত তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করে প্রত্যাবর্তন করেন। শামসুদ্দীনের মৃত্যু হলে সামরিক বাহিনীর নেতাগণ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিকান্দার শাহ নাম দিয়ে সিংহাসনে বসান। সুলতান ফিরোজ পুনরায় বাংলা অভিযান করেন কিন্তু সন্ধি করে প্রত্যাবর্তন করেন। সিকান্দরের মৃত্যুর পর তার পুত্রকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা হয় এবং গিয়াসুদ্দীন নাম দিয়ে সুলতান ঘোষণা করা হয়। শিরাজের খাজা হাফিজ তাঁকে একটি কবিতা উপহার পাঠান, তাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ছিল :

এখন ভারতের টিয়া পাখিসমূহ চিনি নিয়ে আনন্দোৎসব করতে

এই সুমিষ্ট ফারসি কবিতায় তা এতদূর বাংলাদেশে বহন করে নিয়েছে।

বাংলার এক দেশীয় লোক কামনি প্রতারণাপূর্বক তাঁর (গিয়াসুদ্দীনকে) পৌত্র শামসুদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সুলতান জালালুদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। ঐ দেশে নিয়ম ছিল এই যে, সাত সহস্র পদাতিক যাদের পাইক বলা হত, প্রাসাদের চতুষ্পার্শে পাহারা দিত। একদিন বিকালে একজন খোজা এই পাহারাদারদের সাথে ষড়যন্ত্র করে ফতেহ শাহকে হত্যা করেন এবং বারবক শাহ নাম ধারণ করেন।

এই পাহারাদারদের হাতে ফিরোজ শাহও নিহত হন এবং তাঁর পুত্র মাহমুদকে সিংহাসনে বসান হয়। এই পাহারাদারদের সাহায্যে মুজাফফর নামে এক আবিসিনীয় ক্রীতদাস তাঁকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুজাফফরের এক পরিচারক আলাউদ্দিন আবার এই পাহারাদারদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তার প্রভুকে হত্যা করেন এবং নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। এরূপে ভাগ্যের খামখেয়ালীতে এই নিচ পদাতিক সৈন্যগণ বহুদিন ধরে রাষ্ট্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আলাউদ্দীন বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করেন এবং পাইক বাহিনী ভেঙে দেন। কথিত আছে নসরত শাহ ও বিচার কার্য নির্বাহে ও উদারতায় পিতার আদর্শ অনুসরণ করেন এবং তাঁর ভ্রাতাগণের সাথে অত্যন্ত সহৃদ ব্যবহার করেন। সুলতান ইবরাহীম লোদী যখন সুলতান বাবরের সহিত যুদ্ধে নিহত হন (১৫২৬), তখন তাঁর ভ্রাতা ও সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ এই রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং নিরাপত্তার সাথে থাকেন। হুমায়ুন জাহাঙ্গীর কুলি বেগকে এই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। শের খান যখন দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় সমাসীন হন তখন আপোষ মীমাংসার ভান করে তিনি জাহাঙ্গীরকে আহ্বান করে তাঁকে হত্যা করেন। সলিম খানের রাজত্বের সময় (দিল্লীতে) তার আত্মীয় মুহম্মদ খান তার প্রভুর প্রতি আনুগত্যের সাথে প্রজাদের প্রতি ন্যায়বিচার যুক্ত করেন। সমরেজ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি নিহত হলে, তাঁর পুত্র খিজির খান তার স্থলাভিসিক্ত হন এবং বাহাদুর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। সমরেজ খান তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন। সলিম খানের এক আমীর তাজখান (কররানী) জালালুদ্দীনকে নিহত করে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুলায়মান অত্যাচারী প্রকৃতির হলেও কিছুকাল রাজত্ব

করেন এবং তারপর তাঁর পুত্রদ্বয় বায়োজিদ ও দাউদ অসদাচরণ করে রাজকীয় অধিকার মুদ্রা প্রচতি ও খোৎবা পাঠ করে অসম্মান করেন। আমার সংক্ষিপ্তসার এইবার সমাপ্ত হল।

আল্লাহরতায়ালার বহু শোকের যে এই সমৃদ্ধশালী দেশটি সম্রাটের ন্যায়পরায়ণতায় অধিকতর উজ্জ্বলতা পেয়েছে।

বিহারসুবা

এটা দ্বিতীয় আবহাওয়ায় অবস্থিত। গড়রী হতে রোহতাম পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ১২০ শেষ ; তিরসুত হতে উত্তরের পর্বতসমূহ পর্যন্ত এটা প্রস্থ ১১০ শেষ। এর পূর্ব সীমান্তে বাংলাদেশ, পশ্চিমে এলাহাবাদ ও অযোধ্যা। উত্তর ও দক্ষিণে ইহা সুউচ্চ পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। এর প্রধান নদী গঙ্গা ও সোন। কাঠ বা চামড়া যা কিছুই সোন পতিত হয় তাই শিলীভূত হয়ে যায়। শোন, নর্মদা ও জোহিলা এই তিন নদীর আদি ঝরনা গড়হার (মন্দনা) নিকটস্থ এক নলখাগড়ার একটি মাত্র কেয়ারী[৬৮] হতে উত্থিত হয়েছে। সোন খেতে সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর এবং শীতল ; উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়ে এটা মানের নিকটে গঙ্গার সাথে মিশেছে। গণ্ডক উত্তর দিক হতে প্রবাহিত হয়ে হাজীপুরের নিকটে গঙ্গার সাথে মিশেছে। যদি কেউ এর পানি পান করে তার গলা ফুলে যায় এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে বিশেষত ছোট বাচ্চাদের বেলায় এবং নারিকেলের মতো বড় হয়।

শালিগ্রাম একটি ছোট কাল পাথর, হিন্দুগণ একে পবিত্র জিনিসগুলির মধ্যে গণ্য করে এবং একে গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা করে। এটা যদি গোল, ছোট ও তৈলাক্ত হয় তবে একে তারা চরম ভক্তি শ্রদ্ধা করে এবং এর আকৃতির বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে এর বিভিন্নরূপ নামকরণ করা হয় এবং তৎনুরূপ গুণাবলী আরোপ করা হয়। সাধারণত এতে একটি মাত্র ফুটো থাকে, কোনো কোনোটায় বেশি থাকে, অপর কোনোটায় একেবারেই থাকে না। এর মধ্যে কাঁচা স্বর্ণ আছে। কেউ কেউ বলেন যে এর মধ্যে একটি পোকার জন্ম হয় এবং তা ফুটো করে বের হয়ে আসে, আবার কেউ কেউ বলেন যে পোকাটি বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করে। হিন্দুগণ এই পাথরের গুণাগুণ সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখেছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক মূর্তিই ভেঙ্গে গেলে তার ভক্তি শ্রদ্ধার আর কোনো দাবি থাকেনা, কিন্তু এগুলির বেলায় তা ঘটে না।

---

৬৮. নর্মদা, শোন ও মহাবদী এই তিনটি নদী মধ্য প্রদেশের গড় মন্দলা জেলার পূর্ব সীমান্তের তিন মাইল দূরে অবস্থিত রেওয়া রাজ্যের অমর কন্টক গ্রামের একটি পবিত্র উৎস হতে উৎপত্তি হয়েছে। জোহিনা একটি অতি ক্ষুদ্র নদী, এটা প্রকৃতপক্ষে মোনেরই একটি শাখা নদী, এবং ইহা উৎস হতে উত্তর পশ্চিম কোণে বন্ধুগড়ের ১৩ মাইল পূর্বে মোনে পতিত হয়েছে। ফলে একে মোন হতে পৃথক গণ্য করা ঠিক হবে না এবং এটা অমর কন্টকের একই উৎস হতেও উৎপন্ন নয়, এর কিছু পূর্ব অবস্থিত অপর এক উৎস হতে এর উৎপত্তি। একই উৎস হতে নির্গত তৃতীয় বড় নদী, আবুল ফজল সম্পূর্ণরূপে এটা বাদ দিয়ে গিয়েছেন। মহানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে ভারতীয় বদ্বীপের প্রায় অর্ধেক অতিক্রম করে উড়িষ্যায় বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে ; নর্মদার মোহনা হতে এর মোহনার দূরত্ব প্রায় ১৮০০ মাইল, যদিও উভয় নদী একই উৎস হতে উৎপত্তি। নর্মদা আরব সাগরের পড়েছে। অমর কন্টকের পবিত্র উৎসটি মাত্র ৮ গজ লম্বা ও ৬ গজ প্রশস্থ এবং এটা চার দেয়ালে ঘেরা। এটা মন্দলা শহরের ৯০ মাইল পূবে অবস্থিত।

মোন নদীর সর্বোত্তর হতে পাহাড়ের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত এর কোনো এলাকায় এগুলি পাওয়া যায়।

করমনাশা দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত হয়ে চৌসার নিকটে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। এর পানি অপবিত্র বলে গণ্য করা হয়[৬৯]। গুনাগুনও দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত হয়ে পাটনার নিকটে গঙ্গার সাথে মিশেছে। এই সুবার ছোট ছোট নদীগুলির বর্ণনা করা অসম্ভব। গ্রীষ্মকালের মাসগুলি অতিরিক্ত গরম ; কিন্তু শীতকাল পরিমিত। দুই মাসের বেশি গরম কাপড় পরিধান করা হয় না। ছয়মাস কাল বৃষ্টি হয় এবং সারা বৎসরই দেশটি সবুজ ও উর্বরা থাকে। কোনো চরম হাওয়া প্রবাহিত হয় না অথবা ধূলা ঝড়ও উঠে না। কৃষিকার্য অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করেছে। বিশেষ চাউল উৎপাদনে এর গুণ ও পরিমাণের কোনো তুলনা হয় না। কিলারী[৭০] নামে এক প্রকার মটর আছে দেখতে মটরশুঁটির মতো, এটা দরিদ্রগণ আহার করে কিন্তু স্বাস্থ্যকর। প্রচুর গেণ্ডারী উৎপন্ন হয় এবং চমৎকার গুণসম্পন্ন। পান বিশেষত মাখী নামীয় পান মোলায়েম ও সুন্দর রং-এর এবং খুব পাতলা ও সুগন্ধি ও খেতে সুস্বাদু হয়। ফল, ফুলও প্রচুর উৎপন্ন হয়, মানের নামক স্থানে মুচাকন্দ[৭১] নামে একপ্রকার ফুল হয়, অনেকটা ধুতরা ফুলের মতো, অত্যন্ত সুগন্ধি এবং এটা অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় না। দুধ খুব উচ্চগুণ সম্পন্ন এবং খুব সস্তা। ফসল ভাগ করবার রীতি এখানে প্রচলিত নয়। কৃষক স্বয়ং এসে খাজনা আদায় করে এবং প্রথমবার তার সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে নিজেকে হাজির করে। ঘরে বেশির ভাগই টালীর ছাদ। ভাল হাতী প্রচুর সংগ্রহ করা যায় তেমনি নৌকাও। অশ্ব ও উট নাই বললেও চলে। তোতা পাখি প্রচুর এবং বারবারী জাতের একপ্রকার চমৎকার ছাগল পাওয়া যায় এবং একে তারা খোজা করে ; অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাবার ফলে এরা হাঁটতে পারে না এবং তখন এদের পাল্কিতে করে বহন করা হয়। যোদ্ধা মোরগ বিখ্যাত। প্রচুর সীসা পাওয়া যায়। এখানে গিলটি করা কাচ প্রস্তুত হয়।বিহার সরকারের রাজগীর গ্রামের নিকট মার্বেল পাথরের ন্যায় একপ্রকার পাথরের খাদ আছে। এর দ্বারা অলঙ্কার প্রস্তুত করা হয়। এখানে উত্তম কাগজও প্রস্তুত হয়। হিন্দুদের তীর্থস্থান গয়া এই প্রদেশে অবস্থিত। ব্রাহ্মের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বলে একে ব্রাহ্ম-গয়াও বলা হয়। বিদেশী বন্দরসমূহ হতে মূল্যবান পাথর এখানে আমদানী করা হয় এবং অনবরত ব্যবসা চালনা হয়।

সরকার হাজীপুরে কাঁঠাল ও বরহাল[৭২] ফল প্রচুর উৎপন্ন হয়। প্রথমটি বড় আকারের হয় যে কোনো লোক অতি কষ্টে এটি বহন করতে পারে।

---

৬৯. এর নাম দ্বারা ধর্মকর্মের পুণ্য নাম করা বুঝায়। কোনো সম্প্রদায়ের লোকই এর পানি পান করে না। কথিত আছে যে সূর্য বংশীয় এক রাজা এক ব্রাহ্মণকে নিহত করলে এক সাধু পৃথিবীর সমস্ত নদী হতে পানি সংগ্রহ করে তাকে ধৌত করে তার পাপ মোচন করে। এই পানির স্রোত হতে এই নদীর উৎপত্তি বলে গণ্য করা হয় বলে এর পানি অপবিত্র মনে করা হয়।

৭০. খেসারী ডাল।

৭১. এটা ধুতবার চেয়ে অনেক ছোট হয় এবং অত্যন্ত সুগন্ধি ফুল।

৭২. এটা ছোট গোল এক প্রকার ফল।

সরকার চম্পারণে মাশকালাই-এর বীজ অকর্ষিত জমিতে ছিটিয়ে দেয়া হয় এবং এটা কোনোরূপ পরিশ্রম বা কর্ষণ ছাড়াই উৎপন্ন হয়। এর সংবাহনে বন্য লম্বা গোলমরিচ জন্মে।

স্মরণাতীত কাল হতে তিরহুত হিন্দু কৃষ্টির কেন্দ্র বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। এর আবহাওয়া অতি চমৎকার। দধি এক বৎসর পর্যন্ত নষ্ট হয় না। যারা দুধের সাথে পানি মিশ্রিত করে বিক্রি করে, তারা রহস্যজনক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। মহিষ এত হিংস্র হয় যে সেগুলি বাঘকেও আক্রমণ করে। বহু হ্রদ আছে। এক একটির পানি কখনও কমে না এবং এর গভীরতা পরিমাপ করা যায় না। কমলা গাছের ঝোপ ৩০ কোশ পর্যন্ত এবং তা দেখতে অতি মনোরম। বর্ষাকালে গেজেল হরিণ ও বাঘ প্রায়ই একই সাথে আবাদী এলাকায় আসে এবং স্থানীয় লোকেরা এগুলি শিকার করে। ভাঙা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গওয়ালা এদের অনেকগুলি কোনো খের দেওয়া স্থানে ছাড়িয়া দেয়া হয় এবং তারা অবসর সময়ে এদের শিকার করে।

একটি উট দুর্গম পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত বোহ্‌তান অত্যন্ত সুরক্ষিত। এর পরিধি ১৪ কোশ এবং ভূমি আবাদ করা হয়। এতে বহু ঝরনা আছে এবং যেখানে মাটিতে তিন কি চার গজ গর্ত করা হয় ; সেখানেই পানি পাওয়া যায় এবং দুইশতেরও অধিক জলপ্রপাত চক্ষু ও কর্ণের তৃপ্তি দান করে। আবহাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

এই সুবায় ৭টি সরকার আছে এবং এটা ১৯৯টি পরগণায় বিভক্ত। মোট রাজস্বের পরিমাণ ২২ কোটি ১৯ লক্ষ ১৯৪০৪৯ $\frac{১}{২}$ দাম। (৫৫৪৭৯৮৫ টাকা ১ আনা ৩ পাই)। এইসব পরগণার মধ্যে ১৩৮টি উৎপন্ন ফসল বিশেষ নির্ধারিত মূল্যে হিসাব করে অর্থ দ্বারা খামানা পরিশোধ করে। জরিপকৃত জমির পরিমাণ ২৪ লক্ষ ৪৪১২০ বিঘা, আর তা হতে অর্থে রাজস্ব আদায় হয় ১৭ কোটি ২৬ লক্ষ ৮১৭৭৪ দাম (৪৩১৭০৪৪ টাকা)। বাকি ৬১টি পরগণার নির্ধারিত রাজস্ব হল ৪ কোটি ২২ লক্ষ ৩৭১৩০ $\frac{১}{২}$ দাম (১২৩০৯৪০ টাকা ১২ আনা ৫ পাই)। এর মধ্যে ২২ লক্ষ ৭২১৭৪ ময়ূর খাল (৫৬৮০৩ টাকা ৮ আনা ১০ পাই)। এই প্রদেশ ১১৪১৫ জন অশ্বারোহী, ৪৪৯৩৫০ পদাতিক এবং ১০০ নৌকা সরবরাহ করে।

সরকার বিহার

৪৬টি মহাল ও ৯৫২৫৯৮ বিঘা। রাজস্ব ৮০১৯৬৩৯০ দাম, বিশেষ ফসল হতে নগদ মূল্যে এবং সাধারণ বিঘা হারে রাজস্ব নির্ধারিত করা ভূমি হতে আদায় হয়। ময়ূরখাল, ২২৭০১৪৭ দাম। সম্প্রদায় নানারূপ অশ্বারোহী ২১১৫। পদাতিক ৬৭৩৫০।

	বিঘা ও বিসোয়া	রাজস্ব দাম	অশ্বারোহী	পদাতিক	ময়ূর খাস দাম	সম্প্রদায়
আরওয়াল	৫৭০৮৯-৫	৪২৬৭৮০		১০০০		
আউডিখরী (খোকরী?)	৪৯৪০১-১০	৩৭৪৭৯৪০				
ইখাল	৪০৪০৪-৪	৩৩৫২৬০		২০০		আফগান ও ব্রাহ্মণ

	বিঘা ও বিসোয়া	রাজস্ব দাম	অশ্বারোহী	পদাতিক	ময়ূর খাস দাম	সম্প্রদায়
অমৃতু	২৪৩৮৭-১৯	১৮২১৩৩৩			১৬০৩৫	ব্রাহ্মণ
অনবালু		৮৪৭৯২০		২৫০		ব্রাহ্মণ
অনছা	১০২৯০-৫৭	৬৭০০০০০	২০	৩০০		আফগান
আন্দ্রি বিহার, শহরতলী জেলার মত, পাথরের ও	১৯৯৮-৯	১৪৭৯৮০	২০	২০০		কায়েত
ছটের একটি দুর্গ আছে	৭০৬৮৩-৯	৫৫৩৪১৫১	১০	৪০০	৬৫৩২০০	
বাহলাওয়ার	৪৮৩১০-৩	৩৬৫০৬৪০		৫০০	৯০০০	ব্রাহ্মণ
বাসোক	৩৫৩১৮-১৮	২৭০৩৪৩৯		৩০০	১৭৩৮১৩০	শেখজাদাহ
পলাচ	৩০০৩০-১৮	২২৭০৫৩৮		৫০০	৫৯১৮৫	ব্রাহ্মণ
বালিয়া	২৬০০০-১৮	২০৫৬৫০২	২০	৪০০	৮৫৭৪৭	রাজপুত্র
পাটনা, দুইটি দুর্গ একটি ইটের অপরটি মাটির	২১৮৪৬-৮	১৯২২৪৩০			১৩১৮০৭	
ফুলওয়ারী	২০২২৫-১৯	১৫৮৫৪২০	২০	৭০০	১১৮১২০	রাজপুত
পাহারা	১২২৮৫-৬	৯৪১১৬০	২০	৪০০	১৮৫৬০	ব্রাহ্মণ
ভিমপুর	১০৮৬২-১৫	৮২৪৫৮৪			২৪৪২৪	
পন্দারক		৭২৭৬৪০	৩০০	২০০০		
তিলদাহ	৩৯০৫৩-১২	২৯২০৩৬৬	২০	৩০০	২৩২০৮০	শেখজাদা জারার

দ্বিতীয় খণ্ড

সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্র

সম্রাটের সামরিক বাহিনীতে ও অন্দর মহলের নিয়ন্ত্রণের বিধানসমূহ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আমি সেই সুপণ্ডিত প্রতিভাবান ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন তাঁর চমৎকার বিধানসমূহের বিবরণ দেব।

আইন-১
স্বর্গীয় যুগ

সুনির্দিষ্ট তারিখ ছাড়া অর্থনৈতিক লেনদেনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ভুলবশত ও মিথ্যাচারের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই কারণে প্রত্যেক জাতিই এর প্রতিষেধক আবিষ্কার করে এবং একটি যুগ সুনির্দিষ্ট করে। যেহেতু চিন্তাধারা সুখের আকার এবং তা কার্যসম্পাদনের সহায়ক, সেহেতু অপ্রচলিত সময় তালিকা পরিহার করে নবযুগের প্রবর্তন করা সরকারের পক্ষে অবশ্য করণীয় কাজ। এই কারণে সম্রাট ইলাহী[১] ২৯ সালে কর্তৃত্ব ও রাজস্বের আনন্দ উদ্যানের শ্রী এনে রাষ্ট্রের প্রাসাদ-উদ্যান প্রস্ফুটিত ও সতেজ করে তোলেন। কোনো সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটনার সন্নিবেশকে জনগণ বলে মাহরোজ (তারিখ)। আরবগণ একে মুখায়রাখ (তালিকা) এ পরিবর্তন করেছে। ফলে তারিখ একটা ঘরোয়া শব্দে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ এই আরবি শব্দটি ইরাক শব্দ হতে উৎপন্ন বলে মনে করে ; ইরাক শব্দের অর্থ বন্য ষাড়।[২] এই বিধানের ধাতুরূপের অর্থ মন্থন করা। কোনো ঘটনা ঘটার সময় সম্বন্ধে অজ্ঞানতা কমিয়ে আনল। এটা এই নামে পরিবর্তিত হতে থাকে। কেউ কেউ আবার বলে যে তারিখ শব্দটাও পূর্ববর্তী যুগের পরবর্তী কাল বুঝায়। অন্যান্যরা আবার এ দ্বারা কোনো ঘটনা সংঘটনের নির্ধারিত সময় বুঝায় বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, ওমুকে তার উপজাতির তারিখ অর্থাৎ এই ব্যক্তি এই উপজাতির আভিজাত্যের সূচনা। সাধারণত এটা দ্বারা একটা নির্দিষ্ট দিন বুঝায়। যা দ্বারা পরবর্তী সময় নির্দিষ্ট করা হয় এবং যা একটা যুগের সূচনা করে। এই জন্য তারা এমন একটা দিন বাছাই করে যেদিন কোনো স্মরণীয় ঘটনা

---

১. আকবরের রাজত্বের ২৯ বৎসরের প্রারম্ভ হতে এই বৎসরের প্রচলন করা হয় এবং হি: ৬ই রবিউল আউয়াল = ১৫৮৪ খ্রি. ১০ই মার্চ তারিখে।

২ এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামের পরিশিষ্টের ২৩০ পাতায় আছে ; তারিখ শব্দের উৎপত্তি উ-র-খ হতে হিব্রু শব্দ ইখারা বা মাস ও একই রূপ উদ্বুদ্ধ। আলবেরুনীতে বলা হয়েছে যে এই শব্দ ফারসি শব্দ মাহরুয়ের অপভ্রংশ ; এখানেও এই শব্দটি কোনো মাসের প্রারম্ভ সম্বন্ধীয় কিছু এমন একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আল-খারিজনী তাঁর মকাতীহ আল-উমুক গ্রন্থে এই মতবাদ ভ্রান্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

ঘটেছে।[৩] যেমন, যেদিন কোনো সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে, কোনো সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেছে, কোনো বন্যা বা ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। বহু শ্রমের ফলে এবং প্রচুর অর্থানুকূল্যে সর্বক্ষণ আল্লাহর এবাদত করে ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে, বোধশক্তির উজ্জ্বলতা দ্বারা এবং ভাগ্যের সমৃদ্ধিতে সুদূরপ্রসারী প্রতিভার সমাবেশে এবং বিভিন্নমুখী জ্ঞানের ফলে এবং সর্বশক্তিমানের অনুগ্রহে মানমন্দিরসমূহ নির্মিত হল বিভিন্ন আকারের জানালাসহ এবং সুউচ্চবেদীর উপরে সিঁড়িসম্বলিত চমৎকার উপর ও নিম্নের কক্ষ যাতে ধুলিকা কিংবা শব্দ প্রবেশ করতে না পারে।

উল্লিখিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে যেমন,

বৃত্ত ও অন্যান্য দ্বি-বাজ ও দ্বিনলযুক্ত যন্ত্র[৪], উচ্চতা পরিমাপক বৃত্তের চতুর্থাংশে[৫] নক্ষত্র পরিদর্শনের যন্ত্র, এসট্রানোব, গোলক ইত্যাদি জ্যোতির্বিদ্যার আলোকসম্পাদন করা হল এবং গ্রহের সংখ্যা নির্ণয়, তারকাসমূহের অবস্থান নির্ণয়, তাদের কক্ষপথের বিস্তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, এদের পরস্পরের দূরত্ব ও পৃথিবী হতে এদের দূরত্ব, গ্রহ নক্ষত্রের আয়তনের তারতম্য ও এমনি আরও অন্যান্য বিষয় নিরূপণ করা হলো। একজন ন্যায়পরায়ণ সম্রাটের দৈনিক ক্রমবর্ধমান সৌভাগ্য ও তার প্রচুর উৎসাহ না থাকলে এরূপ বৃহৎ কার্য সম্পাদন সম্ভবপর নয়। কেবলমাত্র প্রচুর অর্থ থাকলেই উদার মহাপণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ করা যায় না এবং সম্রাটের বিশেষ প্রচেষ্টা ছাড়া অতীত যুগের দার্শনিক পুস্তকসমূহ ও প্রাচীন পণ্ডিতালয় বিধিসমূহ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। এইসব স্বত্বও সপ্ত গ্রহের[৬] একটি সম্পূর্ণ পরিক্রমা পর্যবেক্ষণ করতেই ৩০ বৎসর লেগে যায়। সময় যত বেশি দীর্ঘ হয় কার্যের প্রতি তত বেশি যত্ন নেওয়া যায় এবং তার সম্পাদনে তত বেশি উৎকর্ষ লাভ হয়।

এই কালহরণকারী ক্লেশপূর্ণ বিশ্বে এই কার্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এমনি বহু লোকের প্রতি আল্লাহতায়ালার করুণা বর্ষিত হয়েছে। যেমন মিশরের আর্কিমেডিস, এরিস্টারকাস ও হিপারস্কাস, যার সময় হতে বর্তমান ৪০ সালে ব্যবধান ১৭৬৯ বৎসর যেমন আলেকজান্দ্রিয়ার প্রটেমী, ১৪১০ বৎসর পূর্বে যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ[৭] করেছিলেন ; যেমন ৭৯০

---

৩. এই অংশটি আলবেরুনীর আমার-উল-বকিয়া গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভের সঙ্গে এত মিল আছে যে মনে হয় আবুল ফজল ঐ গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন।

৪. এই যন্ত্রপাতিগুলি ঠিক বুঝা যায় না। প্রথমটি সম্ভবত এরিস্টাকাস আবিষ্কৃত স্কাফিয়াম। ইহা দ্বারা কোনো পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয়টি সম্ভবত আর্কিমেডিসের আবিষ্কৃত একটি যন্ত্র যার দুই নলা দ্বারা সূর্যের পরিধি মাপা যায়।

৫. এই শব্দের অর্থ পরিষ্কার বোঝা যায় না।

৬. প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণ গ্রহ বলতে সাধারণভাবে চোখে যে পাঁচটি গ্রহ দেখা যায় সেগুলি এবং চন্দ্র ও সূর্য বুঝাত, পাঁচটি গ্রহ, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। ৩০ বৎসর বলতে নিশ্চয়ই ইম্বাদের মধ্যে যে গ্রহটির সবচেয়ে বেশি সময় নেয় তা বুঝাচ্ছে, অর্থাৎ শনিগ্রহ, তৎকালে পরিচিত গ্রহদের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা দূরে ছিল। এটা ২৯ বৎসর ৫$\frac{১}{২}$ মাসে স্থির তারাদের মধ্যে সস্থানে ফিরে আসে।

৭. এই স্থানে বর্ণিত সময় তালিকা সঠিক নয়। আর্কিমেডিসের সময় ছিল ২৭৮-২১২ খ্রি. পূর্বে এরিসটারকাস-এর আনুমানিক ২৮০-২৬৪ খ্রি. পূ. আর হিপ্পারকাসের সম্ভবত খ্রি. পূর্ব ১৬০-১৪৫, কিন্তু

বৎসর পূর্বের বাগদাদের খলিফা মামুন, যেমন ৭৬৪ বৎসর পূর্বের দামাস্কাসের সিন্দ বিন আলী[৮] ও খালিদ বিন আবদুল মালিক[৯] খান মারওয়াজী। হাকিম ও ইবনে আলম[১০] বর্তমান সময়ের ৭১২ বৎসর পূর্বে বাগদাদে একটি মানমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন কিন্তু নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে পারেননি, তেমনি ৬৫৪ বৎসর পূর্বে রাক্কাত বাত্তানী[১১] একটি মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তুষের খাজা নাসির অক্সিজেন সন্নিকটের মুরাখা নামক স্থানে আর একটি মানমন্দির নির্মাণ করার পর তিনশত বাষট্টি সৌর বৎসর পার হয়ে গিয়েছে আর সমর খন্দের মির্যা লুখ বেগ যে মানমন্দির নির্মাণ করেন তার বয়স ১৫৫ বৎসর হয়েছে।

আরবি কথায় রাসাদ অর্থ পর্যবেক্ষণ করা এবং পর্যবেক্ষণকারীগণ এমন লোক যারা বিশেষভাবে নির্মিত প্রাসাদে থেকে তারকাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার বিভিন্ন দিক অনুধাবন করেন। তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল এবং এইসব মহি সময় প্রহেলিকাদের সম্বন্ধীয় আবিষ্কারসমূহ তাঁরা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। এটাই জ্যোতির্বিদ্যায় তালিকা (যিজ) বলা হয়। এই শব্দটি ফারসি শব্দ যিকের আরবি রূপান্তর। যিক শব্দের অর্থ যে সূতো ব্রোকেত বস্ত্রের উপরের কারুকার্যের গতিনিয়ন্ত্রণ করে। তদনুরূপ জ্যোতির্বিদের তালিকা ও তাকে গ্রহণক্ষত্রের পরিচিত ও অবস্থান নির্ণয়ে পথ প্রদর্শন করে এবং এর লাইন ও স্তম্ভসমূহ কার্য ও প্রস্থে সূতার অনুরূপ। আবার একে যিহ্‌এর আরবি রূপান্তরও বলা হয় যেহেতু এটা

তবু একই সময়ে দেখান হয়েছে। খ্যাতনামা গণিতবিদ, জ্যোতিশাস্ত্রবিদ ও ভৌগোলিক প্লটেমীর সময় সঠিক বলা যায় না। তবে তিনি ১৩৯ খ্রি. আলেকজান্দ্রিয়ায় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং ১৬১ খ্রি. জীবিত ছিলেন। মামুন ৮১৩ খ্রি. ২৪ সেপ্টেম্বর খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন তিনি যে সমস্ত গ্রীক গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তার সমস্তই অনুবাদ করান বিশেষ প্রটেমীর আলমাজেস্ট। আলমাজেস্ট শব্দটি গ্রীক ও আরবি শব্দের সমন্বয়।

৮. আবু তৈয়ব সিন্দ-বিআলী প্রথমে ইহুদী ছিলেন। খলিফা মামুনের সময়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং খলিফা তাঁকে তাঁর জ্যোতিবিদ ও মানমন্দিরসমূহের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন।

৯. খলিদ বিন আবদুল মালিক হি: ২১৭ সাল (৮৩২ খ্রি.) মার্ভের অধিবাসী ছিলেন। বাগদাদের শাম্মাসিয়া মানমন্দির হতে প্রথম যে তিন জন জ্যোতির্বিদ আরবগণের মধ্যে সর্বপ্রথম পর্যবেক্ষণকার্য পরিচালনা করেন তিনি তাদের একজন ছিলেন।

১০. ইবনুল আলম হি: সাল ৩৭৫ (৯৮৫ খ্রি.) সাদহাদ উদদৌলার খুব প্রিয় পাত্র ছিলেন কিন্তু তাঁর পুত্র শামসুদ্দৌলার সময় তেমন সমাদর না পাওয়ায় তিনি দরবার ত্যাগ করেন কিন্তু মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে বাগদাদে ফিরে আসেন। তাঁর জ্যোতিশাস্ত্রীয় সময় তালিকা তাঁর সময়ে ও পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল।

১১. মহাম্মদ বিন জাবীর আল বাত্তানী থাবরানে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাখকাতে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ হি: ২৬৪ (৮৭৭-৭৮) সালে শুরু হয় এবং হি: ৩০৬ সাল পর্যন্ত চলে। এনসাইক্লোপেডিয়া ইসলামে তাঁকে, "আরব জ্যোতির্বিদদের মধ্যে অন্যতম বলে অভিহিত করেছে। একে আরবদের পটলেমী বলা হতো। ৩১৭ হি: তে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। দ্রাঘিমাংশে তারকাদের গতির পটলেমী যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন। তিনি তা সংশোধন করেন এবং তা ১০০ বৎসরে পরিবর্তে ৭০ বৎসরে এক ডিগ্রি নিরূপণ করেন; আধুনিক পর্যবেক্ষকদের মতে এটা ৭২ বৎসরে ১ ডিগ্রী বৎসরের দৈর্ঘ্যে সময়ও তিনি সংশোধন করে ৩৬৫ নি, ৫ ঘণ্টা, ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড নিরূপণ করেন। এর প্রকৃত সময় হতে ২ মিনিট কম কিন্তু পটলেমীর নিরূপিত হয় হতে ৪ মিনিট নিকটবর্তী।

প্রায়ই ব্যবহার করতে হয়, যা বুদ্ধিমানগণ বুঝতে পারে। কেউ কেউ আবার এই শব্দকে পারসিক শব্দ মনে করে যা দ্বারা রাজমিস্ত্রীর মাপকার্য বুঝায় এবং সে যেমন এই যন্ত্র দ্বারা দালানের সমতা নিরূপণ করে, সেরূপ।

জ্যোতির্বিদও এর দ্বারা শূন্যতা নির্ধারণ করে। অনেকেই এভাবে লিখে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তাকাবলী সুবিখ্যাত।

১. তুর্কি জাতীয় মাজুর

বনু সামাদুর পরিবারের দুই ব্যক্তি আছেন। তঁদের একই ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করেছেন এবং অপর এক তৃতীয় ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। তাঁর নাম আবুল কাসিম আবদুল্লাহ। তাঁর মতে তারা দুই ভাই এবং প্রথমোক্তজন 'বদিয়া' বা 'অবাক কাণ্ড' পুস্তকের প্রণেতা। শেষের জন অন্যান্য জ্যোতির্বিদ্যার তালিকা প্রণয়ন করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন তবে সেগুলির লেখক সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি সম্ভবত কিবিয়ত ও কাথিরী হতে এই তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। কামিরী আবার ইবনে জৌনিসতে তথ্য সংগ্রহ করেন। ফিরিয়তা কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে আবুল হাসান আলী বি. আমাজুরের পুত্র ; ভ্রাতা নয়। ইবনে জৌনিস হিরাতে এক আবুল কাসেমের উল্লেখ করেছেন। বন্ধু আমাজুরগণ খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ ছিলেন এবং তাঁরা ৮৮৫ হতে ৯৩৩ খ্রি. পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করেন এবং উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারে পথ প্রদান করেন।

২. হিম্মার কাস।

৩. টলেমী।

৪. জাহিয়া গোরাস।

৫. জোরেয়াসটার।

৬. আলেকজান্দ্রিয়ার নিয়ন।

৭. গ্রীক জাতীয় সামাত। এটা সাবাতও পড়া যায় কিন্তু কোনটা সঠিক বলা যায় না। কোনো নামেরই অন্য কোথায়ও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় নি।

৮. নাচিত বি কুররাহ বি হারুন হাররানের অধিবাসী এবং সাবিয়ান সম্প্রদায়ভূক্ত। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা গণিতশাস্ত্র ও দর্শনে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হি: ২২১ (খ্রি. ৮৩৬) সালে তাঁর জন্ম হয় এবং তিনি হি: ২৮৮ (খ্রি. ৯০১) সালে ইন্তেকাল করেন। তিনি খলিফা আল মুয়াতাখিদের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁকে জ্যোতিষীরূপে দরবারে ডেকেছিলেন। তিনি গিয়োডেসিয়াসের জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে নিবন্ধ লেখেন এবং ইউক্লিডের অনুবাদ করেন যদি হুনহিন বি. এসহাক পূর্বেই ইহার আরবি অনুবাদ করেছিলেন। তিনি সিরীয় ভাষায় এক সারিয়ান মতবাদ ও আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

৯. হুমাস বি. মিবান (সাব্যনও হতে পারে)। মনে হয় প্রথম নামটা ভুল। কিরিযতে মিনানের এক পুত্রের উল্লেখ আছে তবে তার নাম আবুল হাসান। মনে হয় এখানে তার

কথাই বলা হয়েছে। তিনি খাতিব বি. কুররাহ এর পৌত্র এবং তি হারবের মতে পিতামহের নাম অনুসারে আবুল হাসান ছাড়াও তাকে যাচিত বলা হত। পিতামহের ন্যায় তিনিই জ্যোতির্বিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া তিনি একজন খ্যাতনামা চিকিৎসকও ছিলেন এবং বাগদাদে—চিকিৎসা করতেন। তিনি তাঁর সময়ের অর্থাৎ আনুমানিক হি. ২৯০ হতে তাঁর মৃত্যু কাল ৩৬০ সাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। আবুল কারাজ এই গ্রন্থের খুব প্রশংসা করেছেন এবং পিতা ঘাবিত বি. কুরবাহ-এর পুত্র মিবান হি. ৩৩১ সালে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তাঁরা উভয়েই হাররারী ছিলেন এবং প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডিত্যের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন যাঁদের মাধ্যমে গ্রীক বিজ্ঞানসমূহে আরবদের মধ্যে প্রচলিত হয়।

মিবান আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধীয় ইকতাব উল আনওয়া নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি প্রাচীন তথ্য হতে এটা সম্পাদন করেন। আলবেরুনী তাঁর বিবরণে এটা সম্বলিত করেন। ফলে প্রাচীন গ্রীকবিদ্যার এক সম্পূর্ণ অংশ আমাদের হস্তগত হয়েছে।

১০. থাচিত বি. মুসা।

১১. মুহাম্মদ বি. জাবির আল বাত্তানী (১১ নম্বর পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

১২. আহমদ বি. আবদুল্লাহ জাবা। হাবশ লেখার ভুলে জাবা হয়েছে। তিনি আল মামুনের একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন এবং তঁকে আল হাসিব বা গণনাকারী এই উপাধি দ্বারা সম্মানীত করা যায়। মামুন তাকে ক্রান্তিবৃত্ত পর্যবেক্ষণ করতে ও জ্যামিতিক ডিগ্রির মাপ পরীক্ষা করতে তাঁকে নিযুক্ত করেন। খলিফার নির্দেশে তিনি কতিপয় তালিকা প্রণয়ন করেন। আবুল কারাজ বলেন যে তিনি তিনটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যা সিন্দ্রত্রিন্দের মত করে লেখা। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় মুমতাহান বা পরীক্ষিত (পর্যবেক্ষণ হতে প্রত্যাবর্তনের পর), তৃতীয়টার নাম 'শাহ'।

১৩. আবু রায়হান। আবু রায়হান মুহম্মদ বি. আহমদ আলবেরুনীর হি: ৩৬২ সালে জন্ম হয় (খৃ. ৯৭৩)। মৃত্যু হি: ৪৪০ (১০৪৮ খ্রি.)।

১৪. খালিদ বি. আবদুল মালিক (৯ নং পাদটিকা দ্রষ্টব্য)

১৫. ইয়াহিয়া বি. মনসুর। নামটি প্রকৃতপক্ষে ইয়াহিয়া বি. আবি মনসুর হবে। তিনি আল মামুনের বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিদদের একজন। আবুল খারাজ বলেন যে খলিফা তাঁকে বাগদাদের শাম্মামিয়া মানমন্দিরে ও দামাসকাসের কাসিয়ান পর্বতের মানমন্দিরে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর পুস্তকসমূহের তালিকা তাঁর বংশ পরিচয় ও উত্তরাধিকারীগণের বর্ণনা দেওয়া আছে। তাঁর পুত্রগণ ও তাঁদের পিতার খ্যাতি বৃদ্ধি করে। তিনি আনুমানিক ৮৩৩ খ্রি. (হি: ২১৮) মামুনের তারমাস অভিযানের সময় ইন্তেকাল করেন এবং আলেপ্পোতে তাঁকে কবর দেয়া হয়।

১৬. হামিদ মারওয়ারুদী। নিঃসন্দেহে তিনি আবু হামিদ, আহমদ বি মুহম্মদ আস মাখানী। সাখান মার্ডের নিকটস্থ একটি শহর। তিস্লেইন লিখেছেন, "মারওয়ারুদী অর্থ অধিবাসী। মারওয়ারুদ খোরাসানের একটি খ্যাতনামা শহর, নদীর তীরে অবস্থিত।

ফারসি ভাষায় মাররুদ এবং মার্ডআস শাহজান হতে ৪০ পরাসদ্ধ দূরে অবস্থিত ; কবিগণ প্রায়ই এই দুই মাডেরি উল্লেখ করেন ; বৃহৎ শহরটির নামের সাথে শাহজান শব্দটি যুক্ত এবং এটা হতেই মারওয়াদী শব্দের উৎপত্তি। এই দুইটির শহর পার্থক্য বুঝাতে অপর শহরটির সাথে রুদ শব্দটি যুক্ত করা হয়। মারওয়ারুদকে মারওয়ার রুদী ও মারওয়াজীও বলা হয়। শাহজান প্রকৃতপক্ষে সাখান। আবু হামিদ সে সময়ের একজন সর্বপ্রথম জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন (খ্রি. ৩৭৯ হি: ৮৯৮ খ্রি.) এবং বাগদাদের এমট্রোলোর নির্মাতা ছিলেন। তাঁকে রাজকীয় জ্যোতির্বিদ্যার বিবরণীর সত্যতা পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

১৭. মুখিথী।

১৮. শার্কী। সম্ভবত কামিরী বর্ণিত আবুল কাসিম আল সারাকীকে বুঝাচ্ছে।

১৯. আবুল ওয়াকা নূরহানী। প্রকৃতপক্ষে এটা বুযজানী হবে। হিরাতের দিকে নিশাপুর জেলার কুযজান একটি ছোট শহর। হি: ৩২৮ (খ্রি. ৯৩৯) তাঁর জন্ম হয় আর হি: ৩৮৮ (খ্রি. ৯৯৮) সালে ইন্তেকাল হয়। বিশ বৎসর বয়সে তিনি ইরাকে বসতি স্থাপন করেন। ফিরিমতে তাঁর পুস্তকসমূহের তালিকা দেওয়া আছে। তাঁর অনুশাসন আস শামিল নামে পরিচিত এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পুস্তক আলমাজেষ্ট। এতে আরবগণ জ্যামিতিতে যে স্পর্শক রেখা ও ছেদকে রেখার সূত্র দেওয়া আছে, এটা বর্তমান যুগের ত্রিকোণোমিতিতে ব্যবহৃত সূত্রেরই অনুরূপ। আলবাত্তানীর সময়ে জ্যাএর বদলে লম্ব ব্যবহৃত হয়। তিনি স্পর্শরেখার প্রবর্তন করে বৃত্তের আনুপাতিক প্রকাশ সংক্ষিপ্ত করেন।

২০. জামি।

২১. বালিথ ক্যয়াহু শিয়ার।

২২. আধাদী। হাজি খলিফার মতে কুশিয়ার বি. কেশন আল হাম্বানী তিনখানা অনুশাসন পুস্তক লিখেছিলেন। নাম হলো জামি ও সালি (বালিখ) ও অপরটি আধাদী।

২৩. সুলেমান বি. মুহম্মদ। জ্যোতির্বিদদের মধ্যে আম্মারদের একমাত্র যে বংশধরের নাম পাওয়া যায় তা হলো ইবন উস মাতির খ্রি. ৭৭৭ হি: (১৩৭৫ খ্রি.) এর নাম আলাউদ্দিন। সম্ভবত আবুল ফজল খ্যাতনামা আবু হামিদ আল খামুলিকে বুঝাচ্ছে।

২৫. সকাইহ। সম্ভবত কোনো একটি মৌলিক পুস্তকের নাম, গ্রন্থকারের নাম নয়।

২৬. আবুল কারাহ সিরাজী।

২৭. মজমুয়া : সম্ভবত হাজি খলিফা বর্ণিত একটি পুস্তকের নাম।

২৮. মুখতাব লেখকের নাম আবু মনসুর সুলেমান বি আল হোসেন বি: বার দোআই। এই নামীয় অপর পুস্তকের লেখক চিকিৎসক আবু নসর ইয়াহিয়া বি. কারীর আত তাক্রিতী।

২৯. আবুল হাসান তুসি। কিসিমতে এই নামীয় একজন উপজাতীয় ঐতিহাসিক ও কবির উল্লেখ আছে। তাঁর এই নামীয় পুত্র একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার কোনো উল্লেখ নেই।

৩০. আহমদ বি. ইসহাক সারাক্ষী। সারাক্ষীদের বংশ তালিকায় এই নামের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত নামটি আহমদ বি. মহম্মদ আত তৈয়ব হবে। তিনি খলিফা আল মুয়াত্তাধিক–এর শিক্ষক ছিলেন। খলিফা তাঁর গুপ্ত তথ্য ফাঁস করে দেয়ার জন্য হি: ২৮৬ (৮৯৯ খ্রি.) তাঁর প্রাণদণ্ড দেন। আলবেরুনী তাঁকে একজন জ্যোতিষী বলে বর্ণনা করেছেন।

৩১. খারারী। সম্ভবত আল ফজারী হবে। আবু ইসহাক ইবরাহীম বি. হাবিব আরবদের মধ্যে সর্বপ্রথম এমট্রোলোর যন্ত্র প্রস্তুত করেন। তিনি একটি অনুশাসন ও কতিপয় জ্যোতির্শাস্ত্রীয় পুস্তক প্রণয়ন করেন।

৩২. আল হারুনী। সম্ভবত বাগদাদের জ্যোতিষী হারুন বি. আল মুসমাজ্জিমকে বুঝাচ্ছে। তিনি একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রপিতাসহ খলিফা আল মনসুরের জ্যোতিষী ছিলেন এবং তাঁর পুত্র ইয়াহিয়া ফজল ফজল বি. মহলএর জ্যোতিষী ছিলেন।

৩৩. অদওয়ারই কিরাইন। একটি পুস্তকের নাম। লেখকের নাম পাওয়া যায় নি।

৩৪. ইয়াকুব বি. তাউস। সম্ভবত তাউসের স্থলে তারিখ হবে। আলবেরুনী এই জ্যোতির্বিদের উল্লেখ করেছেন।

৩৫. খোয়ারাজমী। আল মামুনের নির্দেশে মুহম্মদ বি. মুসা সিদ্ধান্তের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেন। তিনি জ্যোতির্বিদের চেয়ে গণিতশাস্ত্রে বিশদরূপে অধিকতর খ্যাতি অর্জন করেন।

৩৬. ইউসুফী।

৩৭. ইয়াকী। সম্ভবত উলুখ বেগের 'ফি মাওয়াখী উজ আমাল উন নাজুমিয়া পুস্তক বুঝাচ্ছে। সঠিক বুঝা যায় না। এই নামে অন্য কোনো কিছুর, কোনো উল্লেখ কোথায়ও পাওয়া যায় না।

৩৮. জৌঝরিয়ান।

৩৯. সামায়ানী। ডি হারবেল্ট এই উপনামের আবু সাদ আবদুল করিম মুহম্মদ এর উল্লেখ করেছেন। তিনি গণিত পুস্তক 'আদাব হি ইমতিমাল ইন হিসাব' পুস্তকের প্রণেতা। হি: ৫০৬–৬২। ফিরিমত অপর এক সামায়ানের উল্লেখ করেছেন যিনি পটলেমীর অনুশাসন পুস্তকের সমালোচনা লিখেছিলেন এবং তৃতীয় আর এক আল সামায়ানের উল্লেখ করেছেন যিনি আবু মাশারের ক্রীতদাস ছিলেন এবং একটি জ্যোতিশাস্ত্রীয় পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন।

৪০. ইবনে মাহরা। আবুল ফজল কাকে বুঝিয়েছেন বলা শক্ত। পারসিটার ইবনে আধি সাহারীর নামে বাগদাদের এক জ্যোতিষীর উল্লেখ করেছেন।

৪১. আবুল ফজল মাশাল্লাহ। মূল পুস্তকের ভুলবশত মাশাদা লেখা আছে। আল মনসুরের রাজত্বকালে এর জন্ম হয় এবং আল মামুনের রাজত্বকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

৪২. আয়াসিমি।

৪৩. আবু মাশারের কবির। বালঘের অধিবাসী। আল কিনদীর সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ৪৭ বৎসর বয়সের পূর্বে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন শুরু করেন নি। হি: ২৭২

(৮৮৫ খ্রি.) সালে একশত বৎসরেরও অধিক বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন বিশেষ খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতিষী ছিলেন। জ্যোতিষী হিসাবে এবং ভবিষ্যৎ বাণী ফলে-যাওয়ায় আল মুসতাইনের আদেশে তাকে বেদদাও দেওয়া হয়। যার ফলে তিনি লেখেন, আমি আঘালত করেছিলাম, আমাকে আঘাত করা হয়েছে। ফিরিমতে তার ৩৩টি পুস্তকের উল্লেখ আছে। ইউরোপে তিনি আলবুমাসের নামে পরিচিত। তাঁর পুস্তক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

৪৪. সিন্দ বি. আলী।

৪৫. ইবনে আলম।

৪৬. শাহরিয়াবান। আলবেরুনীর পুস্তকে তাঁর উল্লেখ আছে তবে এর সাথে শাহ শব্দটি যুক্ত আছে। হাজী খলিফা শাহরিয়ার নামীয় এক পুস্তকের উল্লেখ করেছেন। এটি একটি বিখ্যাত পুস্তক। খারমী হতে আত তামিমী ইহা আরবিতে অনুবাদ করেন।

৪৭. আরকাশদ এটা সংস্কৃত অহর্গনের অনুবাদ। আলবেরুনী একে 'মারকাশদের দিনগুলি' নামে উল্লেখ করেছেন।

৪৮. ইবনে সুফি। আল শেখ মুহম্মদ বি. আবিল ফতেহ আস সুফি আল মিশরী উলুখ বেগের অনুশাসন পুস্তকের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেন এবং তাতে নতুন তালিকা ও আলোচনা সন্নিবেশিত করেন।

৪৯. মেহালান কাশিম। মেহেলান, মেহিলান অথবা ইবনে মেহিলান ডি—হারবেল্ট-এর মতে বুইদ পরিবারের মুলতান উদদৌলার মন্ত্রীর নাম ছিল। সম্ভবত তার আনুকূল্যে তাঁর নামে কোন অনুশ্যাসন পুস্তক লিখিত হয়ে থাকবে।

৫০. আহওয়াজী। ডি হারবেল্ট এই নামীয় কয়েকজন লেখকের উল্লেখ করেছেন। এদের একজন ইউক্লিডের একটি সমালোচনা প্রণয়ন করেন।

৫১. আবু জাফর বুশানজীর উরুম। ইয়াকুতের মতে (মুজাম-ইল বুলদান) বুশানজ হিরাতের ৪০ মাইল দূরের একটি শহর। এই সময়ে কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের জন্ম হয়েছে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো জ্যোতির্বিদদের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৫২. আবুল ফতেহ। শেখ আবুল ফতেম আস সুফি সমর ফন্দী নামে পরিচিত তালিকাসমূহের সংশোধন করেন।

৫৩. আক্কাহরাহিবী

৫৪. মাসাউদী। ইউরোপের লাইব্রেরিগুলিতে এর মাত্র ৪টি কপি আছে। তাছাড়া আর কোথায়ও নেই।

৫৫. মনজরীর মুয়াতাবার। এটা আবুল ফতেহ আবদুল রহমানের উপন্যাস। তিনি আলী আল খাজিল আল মারওয়াযজীর একজন ক্রীতদাস ছিলেন এবং তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁর অনুশাসন পুস্তক প্রণয়ন সমাপ্ত হলে সুলতান মনজর তাঁকে এক সহস্র দিনার প্রেরণ করেন কিন্তু তিনি তা ফেরৎ দেন।

৫৬. ওয়াজিখই-মুয়াতাবার।

৫৭. আহমদ আবদুল জলিল মনজরী। তিনি নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে দুইটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ডি হারবেল্ট একে একজন উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষী বলে বর্ণনা করেছেন।

৫৮. মুহম্মদ হাসিব তবরী।

৫৯. আদানী।

৬০. তায়লাসানী এইগুলি বিভিন্ন তালিকার নাম।

৬১. আসাবাই।

৬২. কিরমানী।

৬৩. সুলতান আলী খোয়ারাজমী। আলী, শাহ বি, মুহম্মদ বি. ইলকাসিম, সাধারণত আলাউদ্দিন আল খোয়ারাজমী নামে পরিচিত। তিনি শাহী নামে এক অনুশাসন পুস্তকের প্রণেতা। উমদাত উল এলখানিয়া' নামে একখানি তিলিকার ফারসি ভাষায় একটি—সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেন।

৬৪. ফাকির আলী নাসারি।

৬৫. শিরওয়ানীর আলা-ই। ফরিদ উদ্দীন আবুল হাসান আলী বি. ইল করিম আস শিরওয়ানী, আল ফাহহাদ নামে পরিচিত। শেষের দিকে জ্যোতির্বিদদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতনামা। কতিপয় অনুশাসন পুস্তকের প্রণেতা।

৬৬. রাহিরী।

৬৭. মোস্তেটফী। হাজী খলিফা এই পুস্তকের উল্লেখ করেছেন কিন্তু লেখকের নাম নাই।

৬৮. ইয়াজদীর মুসতাখাব।

৬৯. আবু রাজা ইয়াজদী। নিশাপুর ও শিয়াজের মধ্যবর্তী একটি শহরের নাম ইয়াজদী

৭০. কায়দুরাহ।

৭১. ইকলিনী।

৭২. নাসিরী। সম্ভবত নাসিরুদদৌলাহ বি.—হামদান-এর নামানুসারে নাসিরি হয়েছে।

৭৩. মুলাখখান।

৭৪. দস্তর। দস্তুর উল আমল ফি তাশিহ ইল জাবদওয়ান' মাহমুদ বি. মাহমুদ বি. ফখিজাদা কর্তৃক ফারসি ভাষায় লিখিত উলুম বেগের অনুশাসনের সমালোচনা।

৭৫. মুরাক্কাব।

৭৬. মিকলামাহ।

৭৭. আসা।

৭৮. শাতস লাহ।

৭৯. হামিল।

৮০. খাতাই।

৮১. দায়লামী। এটা কতিপয় তালিকার সমষ্টি। এইগুলোর লেখক কে তা সঠিক জানা যায় না। লুলাগু খামের ভাই কলাই খান চীন বিজয় করে সেখানে বাগদাদের—

জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানসমূহ প্রচলন করেন। ১২৮০ খ্রি. রাজা কোচিয়ান পারসিক জামালুদ্দীনের নিকট হতে ইবনে ইউনুসের তালিকাসমূহ লাভ করেন।

৮২. মুহম্মদ বি. আইয়ুব এর মুফরাদ।
হাজী খান এই পুস্তকের উল্লেখ করেছেন কিন্তু লেখকের নাম নাই।

৮৩. আবু রশিদের কামিল।

৮৪. এলখামি। নাসিরুদ্দিন তুসির তালিকাসমূহ।

৮৫. জামমিদী। গিয়াসুদ্দীন জামসিদ জ্যোতির্বিদ খাদিজাদাসহ উলুখ বেগের অনুশাসন পুস্তক প্রণয়নে সহায়তা করেন।

৮৬. গুরগানী। উলুখ বেগের অনুশাসন পুস্তকের অপর নাম।

তাঁরা গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ও বিভিন্ন গতিবিধি সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদের তালিকা অনুযায়ী বৎসরের পর বৎসর যা কিছু লিপিবদ্ধ করে যায় তাকে তাঁরা পঞ্জিকা বলে। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো গ্রহের সর্বপ্রথম শেষরাশিতে প্রবেশ করা হতে ক্রান্তিবৃত্তে কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে এর আহ্নিক গতির বিবরণ থাকে। হিন্দীতে একে মাত্রাই বলা হয়। ভারতীয় পণ্ডিতগণ জ্যোতিশাস্ত্রকে ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তির ফল বলে গণ্য করেন। কোনো সরল মানব স্বাভাবিক পবিত্রতা নিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ দ্বারা ধ্যানমগ্ন হলে যখন তার আত্মা বোধশক্তি ও বস্তুজগত অতিক্রম করে যায়। তাকে এমন উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যখন পার্থিব অপার্থিব সকল জিনিস, মাজিননে ও কোনো বিশেষ কিছু ঐশ্বরিক ও নারকীয়, অতীত ও বর্তমান সমস্ত কিছু তা মনে প্রতিফলিত হয়। দয়ালু স্বভাবের জন্য ও বিজ্ঞানের প্রসারের সহায়তার জন্য তারা পবিত্র চরিত্রের অনুসন্ধিৎসুদের নিকট তাদের জ্ঞান ব্যক্ত করে। তারা আবার তাদের এই শিক্ষা লিপিবদ্ধ করে এবং এই লেখাকে তারা বলে সিদ্ধান্ত। এইরূপ নয়টি পুস্তক বর্তমান আছে। ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত, সূর্য সিদ্ধান্ত, সোম সিদ্ধান্ত, বৃহস্পতি সিদ্ধান্ত। এগুলো যথাক্রমে ব্রহ্ম, সূর্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতির প্রভাবে লিখিত হয়েছে। স্মরণাতীত কালে এদের সৃষ্টি হয়েছে এবং এইগুলি বিশেষভাবে প্রথম দুইটিকে প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা করা হয়। সর্গ সিদ্ধান্ত[১২] এই পাঁচটি পার্থিব উৎস হতে সৃষ্টি হয়েছে। অশিক্ষিত লোকেরা সম্ভবত নিন্দা করতে পারে এবং মনে করতে পারে তা এই রহস্য নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে লাভ করা হয়েছে এবং তা গোপন করে এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যাতে সমৃদ্ধ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা ইহা স্বীকার করতে দ্বিধা করে না। বিশেষত যখন সহজাত উৎকর্ষ সম্পন্ন ও বাহ্যিক মহৎ চরিত্রের লোকেরা মনে করে যুগ যুগ ধরে একই রূপে পরস্পরাগত ঐতিহ্য হস্তান্তর করে আসছে। সব মণির মধ্যেই সময়ের পরিমাপক হল "নিকনে মরণ"[১৩] এবং এটা দুই রকমের হয় : প্রথমত স্বাভাবিক যখন তুরান

---

১২. পাঁচটি সিদ্ধান্ত পাঁচজন খ্যাতিনামা মুণিঋষীর নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে।

১৩. গ্রীকগণ কর্তৃক ব্যবহৃতে এই শব্দ দ্বারা ২৪ ঘণ্টা আলো ও আঁধার (দিন ও রাত্রি) বুঝায়।

ও পাশ্চাত্য দুপুর থেকে দুপুর পর্যন্ত ; বা চীন ও তার্তার চীনে[১৪] মধ্যরাত্রি হতে মধ্যরাত্রি ; কিন্তু সূর্যাস্ত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্তই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধরা হয়। হিন্দু পণ্ডিতদের মতে জগতে[১৫] অর্থাৎ পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে এটা সূর্যোদয় হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত ধরা হয় ; আর রুমাকে অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তে সূর্যাস্ত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, সর্ব দক্ষিণে সিংহলে মধ্যরাত্রি হতে মধ্যরাত্রি এবং দিল্লীতে অনুরূপ : সিদ্ধপুর বা সর্বোত্তরে দুপুর হলে দুপুর। দ্বিতীয়ত সমীকরণী একে কৃত্রিমও বলা হয়, যথা ক্রান্তিবৃত্তে সূর্যের পরিভ্রমণ দ্বারা পরিমাপ করা যে গোলকের পূর্ণ ঘূর্ণনকে বুঝায় গণনের সুবিধার জন্য তারা সূর্যের ঘূর্ণনের সম্পূর্ণ সময়টাকে সমানভাবে তিন ভাগ করে। যে আংশিক সময় বাকি থাকে তা প্রতিদিনের সাথে সমানুপাতে ভাগ করা হয়। কিন্তু সূর্যের ঘূর্ণনের সময় কালের তারতম্য হওয়ার ফলে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম দিনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আল বাত্তানীর তালিকায় একে ৫৯ মিনিট, ৮ সেকেণ্ড, ৮ তৃতীয়া, ৪৬ চতুর্থী, ৫৬ পঞ্চমী ও ১৪ বর্ষী বলে ধরা হয়েছে। এ লেখনীতে মিনিট ও সেকেণ্ড একইরূপ ধরা হয়েছে কিন্তু ১৯ তৃতীয়া, ৪৪ চতুর্থী, ১০ পঞ্চমী ও ৩৭ ষষ্ঠী ধরা হয়েছে। সাম্প্রতিক গুরগানী তালিকায় খাজার[১৬] সঙ্গে তৃতীয়া পণ্ডিত মিলে কিন্তু তাতে ৩৭ চতুর্থী ও ৪৩ পঞ্চমী ধরা হয়। আলমাজেস্টে পটলেমী মিনিট ও সেকেণ্ড এর বেলায় সমান ধরে কিন্তু ১৭ তৃতীয়া, ১৩ চতুর্থী, ১২ পঞ্চমী ও ৩৬ ষষ্ঠী গণ্য করে। অনুরূপ ভাবে প্রাচীন তালিকাগুলিতেও তারতম্য দেখা যায়। এটা নিঃসন্দেহে পর্যবেক্ষণের বিভিন্নতা ও যন্ত্রপাতির বিভিন্নতারই ফল। বৎসর চক্র ও ঋতুর সময় সূর্যের উপরে নির্ভর করে। এর কোনো নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করার সময় হতে—পুনরায় সে স্থানে আগমন করা পর্যন্ত—সময়কে এক বৎসর ধরা হয়। যে সময় এটা একটা রাশিতে থাকে তাকে বলা হয় সূর্য মাস। চন্দ্র কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে যাত্রা করে পুনরায় সূর্যের সান্নিধ্যে থেকে বা বিপরীতে যে বা তেমনি যে কোনো অবস্থায়, যে স্থানে প্রত্যাবর্তনের সময়কে চন্দ্রি মাস ধরা হয়। আর যেহেতু চন্দ্রের বার পরিভ্রমণের সময় কাল সূর্যের একবার পরিভ্রমণের প্রায়[১৭] সমান, সেই জন্য একে বলা হয় চন্দ্র বৎসর। এইরূপে

---

১৪. উইঘুর একটি চাখতাই উপজাতীয় নাম। এই স্থানে তাদের অধিবাস মনে করা হয়।

১৫. এই শব্দটা জামকোর্ট হবে। আলবেরুনী সিদ্ধান্ত পুস্তক হতে এটি উদ্ধৃত করেন। যে চারটি প্রান্তের নাম দেয়া হয়েছে সেগুলি চারটি বড় শহরের নাম। পৃথিবীটাকে একটা উপগোলক বর্ণনা করা হয়েছে যার অর্ধেক জল আর অর্ধেক স্থল। নীরু পর্যন্ত এর কেন্দ্র এবং এর উপর দিয় বিষুম রেখা (নীল্যকাশ) অতিক্রম করে। এই পর্বতের উত্তরের অর্ধেকটায় দেবদেবীর বাস। আর দক্ষিণ ভাগে দৈত্য দানব ও নাগাদের বাস। ফলে এর নাম দৈতন্তর। সূর্য যখন মীরুর মাথার উপর থাকে তখন জামকোটে, বেলা দুপুর মধ্যরাত্রি এবং সিদ্ধপুরে বৈকাল। আল বেরুনী এই দুইটা দিয়া লিখেছেন। ব্লকম্যানের সম্পাদিত মূল আইন গ্রন্থে এই অদ্ভুত ভূগোলের একটা মানচিত্র দেয়া আছে।

১৬. নাসিরুদ্দিন তুসি একখানা তালিকা প্রণেতা।

চন্দ্র ও সূর্যের দুই যোগাযোগের সময় ব্যবধান ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট। চন্দ্রের স্বাভাবিক গতি নির্ণয় দ্বারা ইহা স্থির করা হয়েছে এবং ইহার উপর ভিত্তি করে গ্রীকগণ মাস নির্ধারণ করেন। মাস পুরাপুরি ৩০ দিন ধরা হয়। সূর্যের গতি ও চন্দ্রের গতির মিলিত পরিপ্রেক্ষিতে উষ্ণ অঞ্চলের বৎসর বার চন্দ্রের মাস বা ৩৬০ দিন ধরা হয়।

বৎসর ও মাস উভয়ই সূর্য ও চন্দ্রে হয়। আর এই দুইটির প্রত্যেকটি স্বাভাবিক হয় যখন দিনে হিসাব না করে গ্রহের ঘূর্ণনের সময়কে ধরা হয় এবং এটা সমীকরণী বা কৃত্রিম হয় যখন ঘূর্ণনের সময়কে ভিত্তি না করে দিনের পরিমাণকে গণনার ভিত্তি করা হয়। হিন্দু পণ্ডিতগণ মাসের ন্যায় বৎসরকেও চার ভাগে ভাগ করে এবং প্রত্যেক ভাগকে বিশেষ উদ্দেশ্য আরোপ করে। রাত্রি, দিন, বৎসর ও মাসের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল যা সময়ানুক্রমিক অঙ্কপাতনের ভিত্তি। এবার নিম্নে প্রাচীন সম্বৎসরগুলোর বিবরণ দিয়ে এই বর্ণনা শেষ করব।

ইসলামী জ্যোতির্বিদ্যা কি তার ব্যাখ্যা (এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম পুস্তক হতে গৃহীত) গ্রীকদের ন্যায় মুসলমানদের বেলায়ও নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তার জ্যামিতিক প্রতিরূপ দেয়া। ফলে বর্তমানে আমরা যাকে বলি ফলিত জ্যোতির্বিদ্যা এবং যন্ত্রপাতির মতবাদ বলি প্রকৃতপক্ষে এটা তাই ছিল। গণনা দ্বারা বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে দিন ক্ষণ ও রাত্রি নির্ণয় করতে বিশেষ করে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য, যে ব্যবহারিক জ্ঞানের দরকার হয়, তার সমষ্টিকে বলা হয় ইলম আল মাওখাকিত বা নির্দিষ্ট সময়ের বিজ্ঞান। ইসলামের শুরুতে আরবগণের ব্যবহারিক জ্যোতির্বিদ্যার কিন্তু পরিমাণ জ্ঞান ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে (খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী) প্রকৃতপক্ষে জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়নের সূচনা হয়। দুই ভারতীয় পুস্তক অধ্যয়ককে প্রভাবিত করে ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্ম স্ফুত সিদ্ধান্ত, যা ৭৭১ খ্রি. বাগদাদের রাজদরবারে নীত হয় এবং ইবরাহীম বি, হাবীব আল কাজারী ও ইয়াকুব বি. তারিখ একে ভিত্তি করে এবং আর্যভট্টের ৫০০ খ্রি. প্রণীত পুস্তক যাকে ভিত্তি করে আবুল হাসান আহওয়াজী গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধীয় তালিকা প্রণয়ন করেন।

এই জাতীয় পুস্তকগুলির সাথে অচিরেই জিক-ই (রাজকীয় জ্যোতির্বিদ্যার তালিকা) নামীয় নহলবী তালিকার আরবি অনুবাদ সামিল করা হয়। এটা সমানীয় সাম্রাজ্যের শেষ ভাগে প্রণীত হয় ; কিন্তু আনুমানিক একাদশ শতাব্দীতে এইগুলির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। সবশেষে আসে গ্রীক প্রভাব। কিন্তু গুরুত্বে এটাই ছিল প্রথম। এটা মুসলিম জ্যোতির্বিদ্যার গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধির জ্যামিতিক রূপান্তর যোগ করে। আনুমানিক ৮০০ খ্রি. আলমাজেস্ট সর্বপ্রথম আরবিতে অনূদিত হয় কিন্তু অনুবাদ তেমন ভাল হয় নি। পরে আরও দুটি (৮২৮ খ্রি. ও আনুমানিক ৮৫০ খ্রি.) উচ্চস্তরের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। পরে গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার অসংখ্য পুস্তক ও তালিকা আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

হিন্দুযুগ

ব্রহ্মার সৃষ্টি হতে এর আরম্ভ ধরা হয় এবং তার প্রতিটি দিন একটি যুগ। তারা বলে যে ৪ যুগ[১৮] এক কল্প হয় এবং এইরূপ ৭০কল্প শেষ হলে সর্বমোট ৪৩২০, ০০০ বৎসর হয়, এবং

১৮. অর্থাৎ সত্য বা কৃত...এবং কালি। প্রথমটাতে ১৭২৮০০০ বৎসর ; দ্বিতীয়টায় ১২৯৬০০০ বৎসর ; তৃতীয়টায় ৮৬৪০০০ বৎসর এবং চতুর্থটায় ৪৩২০০০ বৎসর মোট ৪৩২০,০০০ বৎসর। সাত মনুর প্রথম

এখন একজন মনুর আবির্ভাব হয়। তিনি ব্রহ্মার ইচ্ছাশক্তি হতে উদ্বুদ্ধ হন এবং সৃষ্টির প্রতি ব্রহ্মার সহযোগিতার ফল। তার প্রতিদিনে পর পর চতুর্দশটি মনুর আবির্ভাব হয়। বর্তমানে যা ব্রহ্মার বয়সের ৫১ বৎসরের শুরু। ছয়টি মনুর আবির্ভাব হয়েছে এবং সপ্তমটির ২৭ কল্প ও অষ্টবিংশতি কল্পের ৩ দিন যুগ এবং চতুর্থ যুগের ৪৭০০ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। বর্তমান যুগের শুরুতে রাজা যুধিষ্ঠির পৃথিবী জয় করেন এবং যেহেতু এক যুগের শেষ হয়ে যায়। সেই জন্য তার রাজত্বকে একটি সম্বৎসরের সূচনা করেন এবং সেই সময় হতে আজ পর্যন্ত অর্থাৎ পবিত্র সম্বৎসরের ৪০ বৎসরে ৪৬৯৬ বৎসর পার হয়ে গিয়েছে। ৩০৪৪ বৎসর পর্যন্ত এই সম্বৎসর প্রচলিত ছিল। তারপর বিক্রমজিৎ[১৯] তার নিজের সিংহাসন আরোহণের সময় হতে গণনা আরম্ভ করেন এবং এইরূপে মানব জাতীয় খানিকটা উপকার করেন। তিনি ১৩৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। সেই সময় হতে বর্তমান বৎসর পর্যন্ত ১৬৫২ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তারা বলে যে শালিবাহন[২০] নামে এক যুবক অলৌকিক শক্তির সাহায্যে বিজয়ী হয় এবং রাজাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী করে। যেহেতু বন্দীর মৃত্যুদণ্ড দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে না, সেজন্য তিনি তার প্রতি[২১] সহৃদয় ব্যবহার করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর কোন কিছু প্রার্থনা করার আছে কি-না। তিনি উত্তরে জানান যে যদিও তার সমস্ত পৃথিবী হতে অবসর গ্রহণ করে পরম সৃষ্টিকর্তার আরাধনায় পর্যবসিত হয়েছে, তবু তাঁর একটিমাত্র ইচ্ছা তার সম্বৎসরটি যেন যুগের তালিকা হতে মুছে না যায়। কথিত আছে যে তাঁর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় এবং যদিও তিনি নিজের সম্বৎসর চালু করেন, অন্যদের ঐ সম্বৎসর পালনে তিনি কোন বাধা দিতেন না। এই সম্বৎসরের পরে ১৫১৭ বৎসর গত হয়ে গিয়েছে এবং তারা বিশ্বাস করে যে এটা আরও ১৮,০০০ বৎসর চালু থাকবে। অতঃপর রাজা বিজয় অভিনন্দন একটি নতুন সম্বৎসরের প্রচলন করবেন এবং তাতে বৎসর চালু থাকবে। তার নাগার্জ্জন সিংহাসনে আরোহন করলে আর একটি সম্বৎসরের প্রচলন করবেন যা

জন স্বয়ম্ভুর (স্বয়ং সৃষ্ট) তিনি খ্যাতনামা অনুশাসন প্রণেতা। পরবর্তী পাঁচজন হ'ল স্বরোচেশা, উত্তম, তামসা, ধরভত, চক্ষুশাঃ সপ্তম জন হ'ল বৈভতস্বাত বা সূর্য হতে জন্ম, এবং তিনি বর্তমান যুগের মনু।

১৯. এই সম্বৎসর সৌরচন্দ্র নিয়মে প্রচলিত এবং একে বলা হয় সনভত বা সমভত। কালীযুগের ৩০৪৪ বৎসর গত হয়ে যাওয়ার পর এই সম্বৎসর আরম্ভ হয় অর্থাৎ খ্রিষ্টের জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্বে সমবতকে খ্রিষ্টীয় সনে পরিণত করতে হলে তা হতে ৫৭ বাদ দিলেই খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যাবে। এই সব হিন্দুস্তানের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত।

২০. শালিবাহন পৌরাণিক কাহিনীর দক্ষিণাত্যের এক রাজপুত্র যে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিতের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। তার রাজধানী ছিল গোদাভরী তীরে প্রতিষ্ঠানে। সক সম্বৎসর তার জন্ম সময় হতে শুরু হয়ে এবং কালী যুগের ৩১৭৯ বৎসরে ১লা বৈশাখ হতে এর আরম্ভ অর্থাৎ ১৪ই মার্চ ৭৮ খ্রিষ্টাব্দ।

২১. বিষ্ণু, পরবর্তীকালে এইরূপ গ্রহণ করে অন্যায় ধ্বংস করে পৃথিবীকে উদ্ধার করবেন। এটাই হ'ল দশম বা শেষ অবতার এবং চারিযুগের পরে এটা সংঘটিত হবে। তিনি পরে সম্বলের ব্রাহ্মণ কিন্তু সর্মার পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন।

৪০০০০০ বৎসর চালু থাকবে এর পর কলকী[২২], যাকে তারা একজন অবতার মনে করে। একটি নতুন সম্বৎসরের প্রবর্তন করবেন এবং তা ৮২১ বৎসর চালু থাকবে। এই ছয়টিকে প্রধান সম্বৎসর গণ্য করা হয় এবং মক বলা হয়। তাছাড়া আরও রাজ যুগ আছে যেগুলিকে বলা হয় মনপত।[২৩] শালিবাহনের অভিযানের পর বিক্রমজিতের সম্বৎসরকে মাক হতে পরিবর্তন করে সমপত করা হয়। এই ছয় শেষ হ'লে মত্য[২৪] যুগের পুনরায় শুরু হবে এবং একটি নতুন যুগের সূচনা হবে।

হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ মাস ও বৎসরকে চার রকম বলে মনে করে। প্রথমত সৌরমান। এটা রাশিচক্রের এক ক্ষেত্রে সূর্যের অবস্থানের সময় এবং এইরূপে এই বৎসরে ৩৬৫ দিন ১৫ ঘড়ি[২৫] ৩০ পল ও ২২$\frac{১}{২}$ বিপল হয়। ২য় চন্দ্রমাস, যা চন্দ্রের বৃদ্ধির প্রথম দিন হতে নতুন চন্দ্র পর্যন্ত সময় ধরা হয়। এই বৎসরটির ৩৫৪ দিন ২২ ঘড়ি[২৬] ও এক পল। এই বৎসরের শুরু হয় সূর্যের মেষ রাশিতে প্রবেশের সময় হ'তে। ৩০ চন্দ্রদিনে (তিথিতে) এই মাস হয়। সূর্যের সম[২৭] অবস্থান হতে চন্দ্রের গতি পথের ১২ ডিগ্রীতে এক তিথি হয়। এবং চন্দ্রের গতির কম বেশি হতে ঘড়ির সংখ্যারও তারতম্য হয়। সবচেয়ে বেশি হয় ৬৫ ঘড়ি আর সবচেয়ে কম হয় ৫৪ ঘড়ি। প্রথম তিথিকে বলা হয় পরিভা, দ্বিতীয়টিকে তিজ ; চতুর্থটিকে চৌথ ; পঞ্চম টিকে পঞ্চমী ; ষষ্ঠটিকে ছয় ; সপ্তমটিকে সপ্তমী ; অষ্টমটিকে অষ্টমী ; নবমটিকে নবমী ; দশমটিকে দশমী ; পঞ্চমদশটিকে পূর্ণ মাসি ; এবং ১৬ হতে ২৯ পর্যন্ত তারা চতুর্থদশ পর্যন্ত একই নাম ব্যবহার করে। ৩০টিকে বলা হয় অমাবস্যা। পবিড়া বা প্রথম হতে ১৫ পর্যন্ত সময়কে তারা বলে শুক্লপক্ষ ; এবং অপর ভাগটিকে বলে কৃষ্ণপক্ষ। কেহ কেহ কৃষ্ণ পক্ষের প্রথম তিথি হতে মাস গণনা করে। তাদের পঞ্জিকাতে সাধারণত বৎসর সৌর আর মাস চন্দ্র ধরা হয়।

---

২২. প্রকৃতপক্ষে সম্ভত হবে। সক দ্বারা সম্বৎসর বা যুগ বুঝায়। সাধারণত এটা শালিবাহনের প্রচলিত সম্বৎসরকে বুঝায়।

২৩. মূল গ্রন্থে এখানে ভুল আছে। এ মত বা সত্য হবে।

২৪. এক ঘড়ি = ২৪ মিনিট একপল = ২৪ সেকেণ্ড এবং এক বিপল -১ সেকেণ্ড। ফলে এতে ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ২২$\frac{১}{২}$ সেকেণ্ডে হয় ; কিন্তু বর্তমানে আমাদের হিসাব মতো ইহা ৫ ঘণ্টা ৪৮ মি. ৪৭$\frac{১}{২}$ সেকেণ্ড।

২৫. পল বাদ দিলে এটাই আমাদের সঠিক বর্তমান হিসাব।

২৬. সূর্য ও চন্দ্রের ঠিক যোগাযোগের মুহূর্ত হতে বৎসর আরম্ভ হয়। অর্থাৎ সৌর বৎসর শুরু হবার ঠিক পূর্বের নতুন চাঁদ দেখার সময় হতে। এটি সৌর মাস চৈত্রের ৩০ বা ৩১ তারখে হয়। যোগাযোগের দিন (অমাবস্যা) পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন। নতুন মাসের প্রথম দিন অমাবস্যার পর হতে শুরু হয়। তিথি আপাত সময় হতে গণনা করা হয়।

২৭. যখন এই সৌর মাসে দুই নতুন চাঁদ উদিত হয়, তখন সেই চন্দ্র মাস পুনরায় গণনা করা হয়। বৎসরে তখন অন্তবর্তী সংযোগ সাধিত হয়, অর্থাৎ ১৩ মাসে বৎসর হয়। একই নামের দুইটি মাসের বিভিন্নতা বুঝাতে একটি নিজ ও অপরটাকে অধিক শব্দ সংযোজনা করা হয়।

যেহেতু চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসর হতে দশ দিন ৫৩ ঘড়ি ২৯ পল ও ২২½ বিপল কম হয়। সূর্য এবং চন্দ্রের গতির গড় ধরে হিসাব করলে দুই বৎসর ৮ মাস ১৫ দিন ও ৩ ঘড়িতে এই পার্থক্যের পরিমাণ এক মাস হয় এবং পঞ্জিকার গণনা ধরলে এই সময় ঊর্ধ্বে তিন বৎসর ও নিম্নে ২ বৎসর এক মাসে হয়। প্রথমোক্ত হিসাব মতে প্রতিবার মাসে এই রূপ পার্থক্য দেখা দেয় এবং এইরূপ বৎসরে তারা একটা মাস দু'বার হিসাব করে ; আর দ্বিতীয় মতে হিসাব করলে দুই সম অবস্থানের প্রতিমাসে, এবং যা অবশ্যই চৈত্র ও আশ্বিন মাসের মধ্যে সংঘটিত হয় এবং এই সাত মাসের বাইরে যায় না ; চান্দ্রমাস দুইবার গণনা করা হয়। এই অধিক মাসটাকে অমার্জিত ভাষায় লাউন্দ বলা হয়।

তৃতীয় ধরনের মাস হ'ল শাওন মাস। তারা ইচ্ছামতো যেকোন দিন হতে এই মাস গণনা আরম্ভ করে। ৩০ দিনে এই মাস হয়। আর ৩৬০ দিনে বৎসর।

চতুর্থ ধরনের মাস নক্ষত্রর। চন্দ্রের যে কোন অবস্থান হতে গমন করে আবার ফিরে আসার সময় দিয়ে গণনা করা হয়। ২৭ দিনে এই মাস হয় এবং ৩২৪ দিনে বৎসর হয়। তাদের মতে ঋতুর সংখ্যা ছয়টি[২৮] এবং এদের ঋতু বলা হয়। সূর্য যখন মীন ও মেষ রাশিতে থাকে সেই সময়কে তারা বলে বসন্ত। এটা পরিমিত আবহাওয়ার ঋতু ; বৃষ ও মিথুন রাশিতে থাকবার সময় গ্রীষ্মকাল বা উষ্ণ ঋতু ; মকর ও সিংহ রাশিতে অবস্থানের সময় বর্ষা, বৃষ্টিপাতের সময়, কন্যা ও তুলা রাশিতে অবস্থান কাল শরৎ, বর্ষা কালের শেষ এবং শীতের সূচনার সময় ; বৃশ্চিক ও ধনু রাশিতে অবস্থানের সময় হেমন্ত, মকর ও কুম্ভ রাশিতে অবস্থানের সময় শীত কাল।

এমনিভাবে বৎসরকে তিন ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটিকে বলা হয় কাল। এটা ফাল্গুন হতে শুরু হয়। চারটি উষ্ণ মাসকে বলে গ্রীষ্মকাল। চারটি বৃষ্টিপাতের মাসকে বলে বর্ষাকাল, ও চারটি শীতের মাসকে বলে শীতকাল। হিন্দুস্থানের সমস্ত অঞ্চলে তিনটিই ঋতু হয়। মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন এই চারটে গ্রীষ্মকাল, কর্কট, সিংহ, কন্যা ও তুলা এই চারটে বর্ষাকাল ; বৃশ্চিক, ধনু, মকর ও কুম্ভ শীতকাল। সৌর বৎসরকে এরা দু'ভাগে ভাগ করে। মেষ হতে শুরু করে কন্যারাশির শেষ পর্যন্ত সময়কে বলে উত্তর গোল, এটা বিষুব রেখা হতে সূর্যের উত্তরে গমনের সময়, এবং তুলা রাশির শুরু হতে মীন রাশির শেষ পর্যন্ত সময়কে বলে দক্ষিণ গোল, সূর্যের বিষুর রেখার দক্ষিণে গমনাগমনের সময়। —তাছাড়া মকর রাশির প্রথম হতে মিথুন রাশির শেষ পর্যন্ত সময়কে বলে উত্তরায়ণ। সূর্যের উত্তরে অবনমনের সময় ; এবং কর্কট রাশির প্রথম হতে ধনু রাশির শেষ পর্যন্ত সময়কে বলে দক্ষিণায়ন বা সূর্যের দক্ষিণে অবনয়ন। বহু ঘটনা বিশেষত মৃত্যু এই ভাগগুলির প্রথমটিতে সংঘটিত হলে তা সৌভাগ্যসূচক বলে গণ্য করা হয়।

নিকথিমেরনকে তারা ৬০টি সমান ভাগে ভার করে এবং প্রত্যেক ভাগের নাম দেয়া হয় ঘটি বা ঘড়ি। প্রত্যেক ঘড়ি আবার কতিপয় ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগকে তারা পল বলে।

---

২৮. প্রতিটি পাশাপাশি দুই মাস নিয়ে হয়। সব সময় একই মাস নিয়ে ঋতু হয়।

অনুরূপভাবে তারা পলকেও ভাগ করে এবং প্রতিভাগকে বলে নাড়ি বা বিপল। প্রত্যেক নাড়ি সুস্থির মেজাজের। না দৌড়ান অবস্থায় বা রাগান্বিত হয়ে অন্য কোনরূপ চিত্ত বৈকল্য না ঘটান অবস্থায় ছয় শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় এক নাড়ির সমান গণ্য করা হয়।

স্বাস্থ্যবান একটি লোক এক ঘড়িতে ৩৬০ বার শ্বাস নেয় এবং এক সেকেণ্ডে মেরনে নেয় ২১৬০০ বার। কেউ কেউ বলেন যে, যে শ্বাস ছাড়া হয় তাকে বলে শ্বাস আর যা গ্রহণ করা হয়, তাকে বলে প্রশ্বাস এবং দু'টিকে মিলিতভাবে বলা হয় পরান। ছয় পরানে এক পল হয় এবং ৬০ পলে এক ঘড়ি হয়। জ্যোতির্বিদ্যার ঘণ্টা এক মেরনের ২৪ ভাগের এক ভাগ এবং ইহা $২\frac{১}{২}$ ঘড়ির সমান। প্রতিদিন ও প্রতিরাত্রি আবার ৪ ভাগে বিভক্ত এবং প্রতি ভাগকে বলে প্রহর, কিন্তু এদের সবগুলো সমান নয়।

যতা-ই সম্বৎসর

তাঁরা পৃথিবীর সৃষ্টি হতে গণনা করে। তাঁদের মতে এটা বর্তমান সময় হতে ৮৮৮৪ ওয়ান ও ৬০ বৎসর পূর্বে সংঘটিত হয়। প্রতি ওয়ান ১০,০০০ বৎসর। তাদের বিশ্বাস যে পৃথিবী ৩০০০,০০০ ওয়ান। আবার কারো মতে ৩৬০,০০০ ওয়ান স্থায়ী হবে। তাঁরা স্বাভাবিক সৌর বৎসর ও স্বাভাবিক চন্দ্রমাস ব্যবহার করে। বৎসর আরম্ভ করে সূর্যের কুম্ভরাশির মধ্যবর্ত স্থানে অবস্থানের সময় হতে। মুহিউদ্দীন[২৯] মাথবেরী ইহাকে ১৬ ডিগ্রী বলে গণ্য করে, অন্যরা ১৬ হতে ১৮ ডিগ্রী ধরে। সেখানে মেরনকে তারা ১২ চাখে ভাগ করে। প্রত্যেক চাখ আবার ৮ কেহ্ বিভক্ত এবং এদের প্রত্যেকটি তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়।

নিকমে মেরনকে তাঁরা আবার কতিপয় মিনিকেও ভাগ করে। সময়ের এই গণনার জন্য তাদের তিনটি চক্র আছে যেমন শাব্দ ওয়ান ; ওয়ান ও ঘা ওয়ান ; প্রতিটি ৬০ বৎসর হয় এবং চক্রের প্রতি বৎসর দুটি[৩০] পদ্ধতিতে অঙ্ক পাতন করা হয়। প্রতি চক্রের বিবর্তন

---

২৯. তিনি একজন খ্যাতনামা দার্শনিক ও গণিতবিদ ছিলেন এবং সুলতানের চাকরি করতেন। স্পেন ও আফ্রিকায় শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে তাঁর মুখরেবী উপনাম হয়। হিঃ ৬৫৮ সালে তিনি নাসিরুদ্দীন তুসির সহিত একত্রে মুরাথা মানমন্দিরের তত্ত্বাবধান করেন এবং একখানি তালিকা প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন।

৩০. বদু শব্দটিও এই কালচক্রে ব্যবহার করা যায় তবে তা এত শুদ্ধ হয় না। কালচক্রে চীনে দুই শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করত। একশ্রেণীতে দশ অক্ষর ও অপর শ্রেণীতে বার অক্ষরের শব্দ থাকত। শব্দগুলির প্রথম অক্ষরগুলি যুক্ত করে প্রথম ব্যবহার হ'ত। দ্বিতীয় অক্ষর যুক্ত করে দ্বিতীয় বৎসর এইভাবে দশ বৎসর পর্যন্ত চলত। এগার বৎসরের বেলায় ১০ অক্ষরের শব্দ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে এই শ্রেণীর শব্দগুলির প্রথম অক্ষরগুলির সহিত ১২ অক্ষর সম্বলিত শব্দগুলির ১১ অক্ষরগুলির যুক্ত হ'ত। দ্বাদশ বৎসরের সময় প্রথম শ্রেণীর শব্দগুলোর দ্বিতীয় অক্ষরগুলোর সহিত দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দগুলোর দ্বাদশ অক্ষরগুলোর যুক্ত করা হ'ত ; ত্রয়োদশ বৎসরের বেলায় প্রথম শ্রেণীর শব্দগুলোর তৃতীয় অক্ষরগুলোর সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দগুলোর প্রথম অক্ষরগুলো যুক্ত করা হ'ত ; কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দগুলোর অক্ষরও শেষ হয়ে গিয়েছে।

মতান্তরে প্রথম চক্রের আরম্ভ হয় খ্রিষ্টপূর্ব ২৩৯৭ সনে। ফলে বর্তমানে আমরা ৭২ কালচক্রে পৌছেছি। যার ২৮ বৎসর ১৮৯০ সনে শুরু হবে। চীনদের সময় বের করতে কিন্তু কালচক্রের সময়কে ৬০ দিয়া

কতিপয় দশ ও বার চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। প্রথমটা বৎসর ও দিনের গণনার জন্য ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয়টিও অনুরূপভাবেই ব্যবহার করা হয় এবং তা হারারী। এই দুই শ্রেণীর চিহ্নের সমন্বয়ে তারা ৬০ এর কাল চক্র গঠন করে এবং তারা সূক্ষ্ম হিসেব বের করে।

তুর্কী সম্বৎসর

একে উইঘুরীও বলা হয়। এর আগেরটির মতো তবে এর কালচক্র ১২ এর শ্রেণী উপর ভিত্তি করা। তারা তাদের বৎসর ৬ দিন অনুরূপ ভাবেই গণনা করে। তবে কোন কোন জ্যোতির্বিদের তালিকায় ১০ সংখ্যার শ্রেণীও ব্যবহার করা হয়। এই সম্বৎসরের প্রারম্ভ সজ্ঞাত। আবু রায়হান (আলবেরুনী) বলেন[৩১] যে তুর্কীগণ সায়রো মেসিডোনীয় অসম্পূর্ণ বৎসরসমূহে ৯ যুক্ত করে তাকে ১২ দ্বারা ভাগ করে এবং ইদুরচিহ্ন হতে গণনা করে অবশিষ্টাংশ যে প্রাণীতে গিয়ে শেষ হয়, তথা হতে বৎসর গণনা করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে যাচাই করে দেখা যায় যে এতে এক বৎসর কম হয়। নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্য হ'ল যে ইঁদুর চিহ্ন হতে আরম্ভ করে অবশিষ্টাংশ প্রাণী চিহ্নসমূহ দিয়ে শুরু করে যেখানে শেষ হয় সেই প্রাণীর নাম গ্রহণ করা হয়।

যদিও এই সম্বৎসরের প্রারম্ভ কাল অজ্ঞাত তবু কালচক্রের বৎসর ও তার নাম সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য জানা যায়। আর যদি অসম্পূর্ণ মালিকী সম্বৎসরের সাথে ৭ বৎসর যোগ করে ১২ দ্বারা ভাগ করে। ইঁদুর চিহ্ন হতে গণনা করে অবশিষ্টাংশ যা থাকে তার প্রাণীরই বৎসর হয়। নিম্নলিখিত কাল চক্র হতে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।[৩২]

কালচক্রের বার বৎসরের নাম

১. মিকান— ইঁদুর ২. উদ—ষাঁড় ৩. পারিস—চিতাবাঘ ৪. তাওউশকান—খরগোস ৫. লৌহ—ড্রাগন ৬. আইলান—সর্প ৭. ইউন্ত—অশ্ব ৮. কু-মেষ ৯. বিজ—বানর ১০. তাখাকু—মোরগ ১১. ইত—কুকুর ১২. তনকুজ—শুকুর। প্রত্যেক শব্দের সাথে তারা এল যোগ করে বৎসর বুঝায়।

জ্যোতিশাস্ত্রীয় সম্বৎসর

জ্যোতির্বিদগণ সৃষ্টির প্রথম হতে গণনা করে এই মত পোষণ করেন যে সমস্ত গ্রহগুলিই মেষ রাশিতে ছিল। বৎসরটি সৌর। তাঁদের হিসেব মতে সেই সময় হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ১৮৪৬৯৬ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে।

পূরণ করে বাকি বৎসরগুলো যোগ করতে হবে। যদি সময়টা খ্রিষ্টপূর্বে হয় তবে তা ২৩৯৮ হতে বাদ দিতে হবে। আর খ্রিষ্টপরে হলে তা হতে ২৩৯৮ বাদ দিতে হবে।

৩১. আলবেরুণির আতহার উল বাকিয়া বা ভারতে কোন গ্রন্থেই এটা পাওয়া যায় নি। তুর্কী সম্বৎসর বর্তমানে ব্যবহার হয় না। কিন্তু চক্র বৎসরের নামগুলি ইন্দোচীন জাপানে ব্যবহৃত হয়।

৩২ রাশিচক্রের এই বার চিহ্ন জাপানী চক্রের প্রাণীসমূহের অনুরূপ। কিন্তু দেশী নামগুলো ভিন্ন ভিন্ন। এইগুলো হতে যে হিসেব ধরা হয় তা তেমন বোধগম্য নয়।

আদমের সম্বৎসর

তাঁর জন্ম হতে এই সম্বৎসরের শুরু। বৎসর সৌর, আর মাস চান্দ্র। এলখানি তালিকা অনুযায়ী আজ পর্যন্ত এই সম্বৎসরের ৫৩৫৩ সৌর বৎসর পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কিছু লোক যাদের নিকট স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের পুস্তক আছে তারা বলে ৬৩৪৬ সৌর বৎসর পার হয়েছে। আবার কেহ বলে ৬৯৩৮ সৌর বৎসর ; আবার অন্যরা বলেন ৬৯২০ সৌর বৎসর কিন্তু খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণের মতে ৬৭৯৩ বৎসর অতিক্রম করে গিয়েছে।

ইহুদী সম্বৎসর

আদমের সৃষ্টি হতে এর আরম্ভ। তাদের বৎসর স্বাভাবিক, সৌর : মাস কৃত্রিম, চান্দ্র, তারা তাদের মাস ও দিন আরবদের মতোই গণনা করে। তবে মধ্যবর্তী এক নিয়ম মত। বৎসরগুলি দুই প্রকারের যেমন সহজ যাতে কোন অতিরিক্ত সংযোগ করা হয় না। এবং মিশ্রিত, যাতে অতিরিক্ত সন্নিবেশ করা হয়। হিন্দুদের মতো তারা প্রতি তিন বৎসরে একমাস অতিরিক্ত সন্নিবেশ করে।[৩৩]

মহাপ্লাবনের সম্বৎসর

এই ঘটনার সময় হতে এই সালের গণনা শুরু হয়। বৎসর স্বাভাবিক সৌর। আর মাস স্বাভাবিক চান্দ্র। সূর্যের মেষ রাশিতে প্রবেশ করার সময় হতে বৎসর শুরু হয়। বালখের আবু মা-শার এই সম্বৎসরে নক্ষত্রদের মোটামুটি অবস্থান সম্বন্ধে তার এই সম্বৎসরের উপর ভিত্তি করেন। সেই সময় হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ৪৬৯৬ বৎসর পার হয়েছে।

বুখত নাসসারের সম্বৎসর (নেবুচাদ মজ্জার)

এই সম্রাট তাঁর রাজত্বর শুরু হতে এক সম্বৎসরের প্রচলন করেন। বৎসর সৌর কৃত্রিম, ৩৬৫ দিন, কোন ভগ্নাংশ নেই। তেমনি ৩০ দিনে মাস, আর বৎসরের শেষে ৫ দিন যোগ করা হয়। পটলেমী তাঁর আলমাজেস্টে এই সম্বৎসরের গ্রহবিগ্রহের গতিবিধি নির্ণয় করেন। এর আরম্ভ হতে ২৩৪১ বৎসর পার হয়ে গিয়েছে।

ফিলিকাসের সম্বৎসর (আর হি ডেয়াস)[৩৪]

একে ফিলবাস বা ফিলকাসও বলা হয়। এটা ম্যাসিডনের আলেকজাণ্ডারের সম্বৎসর নামেও পরিচিত। এটা তাঁর মৃত্যুর সময় হতে শুরু হয়। বৎসর ও মাস কৃত্রিম, সৌর।

---

৩৩. অথবা ১৯ চান্দ্র বৎসরের ৭ মাস। আরবগণ নাবুনাসসারের সাথে লেবুচাদ মজ্জারের গোলমাল করে ফেলে যদিও দুই জনের রাজত্বকালের ব্যবধান ১৪৩ বৎসর ! পটলেমীর মতে এই সাল খ্রি: পূ: ৭৪২ অব্দে শুরু হয়।

৩৪. তিনি দ্বিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ফিলিপ ও লারিসার নর্তকী ফিলিপ্পার সন্তান। এই সাল খ্রি: পূ: ৩২৪ অব্দের ১২ নভেম্বর হতে আরম্ভ হয়।

আলেকজান্দ্রিয়ার থিয়ন এই সালকে ভিত্তি করেই তার অনুশাসনে বর্ণিত নক্ষত্রসমূহের মধ্যবর্তী রাশি নির্ণয় করেন। পটলেমী তার আলমাজেস্টে এই সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এই মাসের ১৯১৭ বৎসর পার হয়ে গিয়েছে।

কপটিক সম্বৎসর[৩৫]

এটা অতি প্রাচীন কালীয়। আল বাত্তানী বলেন যে, এর বৎসর সৌর। কৃত্রিম, ৩৬৫ দিনে বৎসর। কোন ভগ্নাংশ নেই। সুলতানী তালিকা অনুযায়ী এর বৎসর ও মাস সিরীয় মেসিডনীয় সম্বৎসরের অনুরূপ। এতেও অনুরূপ অতিরিক্ত সংযোজন আছে। কিন্তু এর সংযোজন সিরীয় মেডিসনীয় সংযোজনের ছয় মাস পূর্বে করা হয়।

সিরীয় মেসিডনীয় সম্বৎসর

বৎসর ও মাস কৃত্রিম, সৌর এবং ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনে বৎসর হয়। কতিপয় জ্যোতিশাস্ত্রীয় পর্যবেক্ষণের মতে অতিরিক্ত ভগ্নাংশটি $\frac{১}{৪}$ এর কম। পটলেমীর মতে ইহা ১৪ মি. ৪৮ সে. এলখানী পর্যবেক্ষণে মিনিট একই হয় কিন্তু ৩২ সেকেণ্ডেও ৩০ তৃতীয়া হয়।

কেথীয়দের হিসেব অনুযায়ী মিনিট একই কিন্তু ৩৬ সেকেণ্ড ৫৭ তৃতীয়া ; সাম্প্রতিক গুরগানী পর্যবেক্ষণের মতে মিনিট ঠিকই থাকে কিন্তু ৩৩ সেকেণ্ড হয় ; মাখরেবীতে ১২ মি. ধরা হয় ; বাত্তানীতে ১৩ মিল ৩৬ সে.। মুহিউদ্দীন মাখরেবী বলেন যে কিছু সিরীয় মেসিডনীয় হিসেব মতে ভগ্নাংশটি এক চতুর্থাংশের বেশি হয়। আবার অন্য হিসেব মতে এটা এক চতুর্থাংশের কম হয়। ফলে মধ্যবর্তী হিসেবে $\frac{১}{৪}$ অংশ ধরা হয়েছে। কেউ কেউ আবার বলেন যে সিরীয় মেসিডনীয় পর্যবেক্ষণ মতে ভগ্নাংশটি পুরাপুরি $\frac{১}{৪}$ অংশই পাওয়া গিয়েছে। ফলে এটা একটি স্বাভাবিক সৌর বৎসর। যদিও মোল্লা আলী কুশব্দি প্রথমোক্ত ভিত্তিতে এটাকে সৌর বৎসর বলে গণ্য করেছেন। এই সম্বৎসর দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সময় হতে গণনা করা হয় যদিও তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম বার বৎসর এর প্রচলন হয় নাই। অন্যান্যরা আবার দাবি করেন যে তিনি তাঁর রাজত্বের ৭ম বৎসরে তাঁর রাজ্য মেসিডনীয়া হতে দ্বিগ্বিজয়ে বহির্গত হবার সময় এর প্রচলন করেন। মুহিউদ্দিন মুখবেরী আবার বলেন যে এণ্টিওকের প্রতিষ্ঠাতা মেলিউকাসের রাজত্বের সময় হতে এর প্রবর্তন হয়। ইহুদী ও সিরীয়গণ উভয়েই এই সম্বৎসর ব্যবহার করেন। তাঁরা বলেন যে ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডার গ্রীস হতে পারস্য বিজয়ে গমনের সময় জেরুজালেম হয়ে যান। সেই সময় তিনি সিরীয় পণ্ডিতগণকে ডেকে নির্দেশ দেন যেন তারা মোজাই সম্বৎসর ত্যাগ করে তার প্রচলিত সম্বৎসর ব্যবহার

---

৩৫. ইহা গও ফ্রেসিয়ান বা শহীদদের সম্বৎসর। ষষ্ঠ শতাব্দীতে খ্রিষ্টীয় সম্বৎসর প্রবর্তনের পূর্বে খ্রিষ্টান লেখকগণ এই সম্বৎসর ব্যবহার করতেন। বর্তমানেও এটা আবিসিনীয়গণ ও কপটগণ ব্যবহার করেন।

করেন। তার উত্তর ছিল : "আমাদের পূর্ব পুরুষগণ কখনও এক সহস্র বৎসরের বেশি কোন সম্বৎসর ব্যবহার করেন নি এবং এই বৎসর আমাদের সালের এক সহস্র বৎসর পূর্ণ হবে। ফলে আগামী বৎসর হতে আপনার নির্দেশ যথাযথ পালিত হবে।" তারা সেই অনুযায়ী কাজ করেছিল। এই ঘটনা আলেকজাণ্ডারের রাজত্বের ২৭ বৎসরে ঘটে। কেউ কেউ দাবি করেন যে এই গ্রীক সম্বৎসরটির হিব্রু হতে উদ্ভব হয়েছে। কুশিয়ার তাঁর জামীতে বলেন সিরীয় মেসিডনীয় সম্বৎসরে আর সিরীয় সম্বৎসরে কোন পার্থক্য নেই; শুধু মাসের নামগুলি ছাড়া, সিরীয় বৎসর তিশিন উল আউয়ালের প্রথম দিন হতে শুরু হয়। এরূপ হয় যখন পূর্বে সূর্য তুলা রাশির চতুর্থ ডিগ্রীতে থাকে, বর্তমানে এটা ১১ ডিগ্রীতে থাকে।[৩৬] সিরীয় মেসিডনীয় সম্বৎসরের বেলায় ঐ নির্দিষ্ট হয় কানুনী-ই-সানরি প্রথম দিন। যখন সূর্য মকর রাশির ২০ ডিগ্রীতে থাকে। বাত্তানী বলেন যে এই সম্বৎসর[৩৭] আলেকজান্দার বিকরনুটাস এর পিতা ফিলিপের সময় হতে আরম্ভ হয়, কিন্তু তিনি এটা তার পুত্রের খ্যাতি বৃদ্ধি করার জন্য তার নামানুসারে প্রচলন করেন এবং তিনি একে ভিত্তি করে তাঁর পুস্তকে গ্রহদের রাশির অবস্থান নির্ণয় করেন। এই সম্বৎসরের ১৯০৫ বৎসর গত হয়ে গিয়েছে।

আগাস্টীয় সম্বৎসর

রোম সম্রাটের মধ্যে সর্বপ্রথম। তাঁর সময়েই যিশু খ্রিষ্টের জন্ম হয়। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সময় হতে এই সালের শুরু হয়। বৎসর সিরীয় মেসিডনীয় সম্বৎসরের অনুরূপ আর মাসগুলি কপটিকীয়। সাধারণ বৎসরের শেষ মাসে ৩৫ দিন হয় আর লিপিইয়ারে হয় ৩৬ বৎসর। এই সম্বৎসরের ১৬২৩ বৎসর গত হয়েছে।[৩৮]

খ্রিষ্টীয় সম্বৎসর

যিশু খ্রিষ্টের জন্ম হতে আরম্ভ হয়। সিরীয় মেসিডনীয় বৎসরের মত এর বৎসরেও ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা। প্রতি ৪ বৎসর পর তারা দ্বিতীয় মাসের শেষে একদিন যোগ করে। এদের কাছে

---

৩৬. এটা ১৫ ও হতে পারে। গ্রাডইউনের মতে ১৬। এটা মেলিউ কিন্তু সম্বৎসর নামে সমধিক পরিচিত। ইহা শুরু হয় ৩৬ খ্রিষ্টপূর্ব ৩১২ সালের ১লা অক্টোবর।

৩৭. তারিখবিদদের মধ্যে এই সম্বৎসরের প্রারম্ভ কাল নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন ইহা খ্রি: পূ: ৩১২ অব্দের ১লা অক্টোবর শুরু হয়েছে। সিরীয়ার গ্রীকগণ তাদের বৎসর শুরু করে সেপ্টেম্বর মাসে। সিরীয়ার অন্যান্য অধিবাসীগণ শুরু করে অক্টোবর মাসে। ইহুদীগণ বলে বিযুরের সময় (২২ বা ২৩ শে সেপ্টেম্বর) হতে এই সাল আরম্ভ করে। মাকাবরীদের পুস্তকে এই সাল ব্যবহার করা হয়েছে এবং সম্ভবত এর নিশানে আরম্ভ হয়। যদি এর আরম্ভ খ্রিষ্টপূর্ব ৩১২ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ধরা হয় তাহলে খ্রিষ্টীয় অব্দ বের করতে হ'ত ৩১১ বৎসর ৮ মাস বাদ দিতে হবে।

৩৮. সিজারদের স্পেনীয় সম্বৎসর শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮ অব্দের ১লা জানুয়ারি। অগাস্টাস কর্তৃক স্পেন বিজয়ের পর বৎসর হতে এই সালের শুরু। আফ্রিকা, স্পেন ও দক্ষিণ ফ্রান্সে এর বহুল ব্যবহার হয়। ১১৮০ সালের এক ধর্মীয় নির্দেশে বার মে লোবার অধীনস্থ সমস্ত গীর্জায় এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। আরবগণের চতুর্থ পেডো ১৩৫০ সালে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। কেস্টাইলের জন ১৩৮২ অব্দে এর প্রচলন নিষিদ্ধ করেন। ১৪৫৫ সাল পর্যন্ত এটা পর্তুগালে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে এই সালের প্রারম্ভকাল খ্রিষ্টপূর্ব ২৭ অবেদর ১৪ই ফেব্রুয়ারি বলা হয়েছে।

মেরন মধ্যরাত্রি হতে শুরু হয়। আরবদের মতো তারা রবিবার হতে শুরু করে সপ্তাহের দিনগুলির নামকরণ করে। তাদের বৎসরের শুরু কেউ কেউ বলে সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশ করার সময় হতে শুরু হয় ; আবার কেউ বলেন যে ঐ রাশির ৮ ডিগ্রী হতে শুরু হয়।

রোমের এন্টনিনাসের সম্বৎসর

এটা তার সিংহাসনারোহনের সময় (১৩৮ খ্রি:) হতে আরম্ভ হয়। বৎসরগুলি সিরীয়, মেসিডোনীয় মাসগুলি কপটীয়। পটলেমী তাঁর আলমাজেস্টে এই সম্বৎসরের নক্ষত্রের নির্ণয় করেন। এই সম্বৎসরের ১৪৫৭ বৎসর গত হয়েছে।

রোমের ডাওক্লেমিয়ানের[৩৯] সম্বৎসর

তিনি একজন খ্রিষ্টান সম্রাট ছিলেন। তাঁর সিংহাসনারোহনের সময় হতে এর আরম্ভ হয়। বৎসরগুলি সিরীয় মেসিডোনীয়, মাসগুলি কপটীয়। এর ১০১০ বৎসর গত হয়ে গিয়েছে।

হিজরী সম্বৎসর

প্রাক-ইসলামিক যুগে আরবদের বহু সম্বৎসর ছিল, যেমন কাবার নির্মাণ এবং ওমর[৪০] বি, রাবীইর রাজত্বকাল। যিনি হিজাজের পৌত্তলিকতার প্রবর্তন করেন এবং এটা হস্তীবৎসর[৪১] পর্যন্ত প্রচলিত থাকে, যখন তারা আর একটি নতুন সম্বৎসরের প্রচলন করে। প্রত্যেক আরব উপজাতীই তাদের ইতিহাসের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হতে একটা সম্বৎসরের প্রচলন করত। হযরতের সময়ে এই প্রথার কোনরূপ সামঞ্জস্য বা পরিক্রমা ছিল না। তারা হিজরীর দিন হতে প্রতি বৎসরের একটা বিশেষ নামকরণ করত। যেমন ঐ বৎসরকে বলা হত 'অনুমতির বৎসর' যখন মক্কা হতে মদিনায় যাওয়ার অনুমিত পাওয়া যায়। দ্বিতীয়

---

৩৯. মূল গ্রন্থে ডাওক্লেমিয়ান লেখা আছে, কিন্তু সম্ভবত এটা কনস্টানস্টাইন হবে। প্রথম খ্রিষ্টান সম্রাট কনস্টানটাইমই ছিলেন, ডাওক্লেমিয়ান নয়। ১০১০ সংখ্যাটাও ভুল। গ্রাওউনের মতে ইহা ১৪১০ হবে। আবুল ফজল যদি ডাওক্লেমিয়ান এর সম্বৎসর হতে গণনা করে থাকে অর্থাৎ খ্রিষ্টাব্দ ২৮৪, তা হ'লে পরবর্তী বৎসরগুলির সংখ্যা হবে ১৩১০ ; যদি কনস্টানটাইনের সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব পাওয়ার সময় খ্রি: ৩২৪ অব্দ হতে ধরা হয় তা হ'লে হবে ১২৭০ বৎসর। আর যদি ৩০৬ খ্রিষ্টাব্দ তাঁর সম্রাট ঘোষণার সময় হতে ধরা হয় তা হলে হবে ৬২৯০ বৎসর। ডাওক্লেমিয়ান কর্তৃক তার পিতা কনস্টানটিয়াসকে সিজার ঘোষণা করা হয় ২৯২ খ্রিষ্টাব্দে।

৪০. এটা লেখা হয়েছে (আলবেরুনী হতে গৃহীত), এটা আমর বি, লোহাই হবে। এর জন্ম হয় ১৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি হিজাজের রাজা ছিলেন। তার বংশ পরিচয়ের জন্য এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম দ্রষ্টব্য। খ্যাতমানা খুজ্জাআহ উপজাতী তার বংশধর বলে দাবি করে। সিবীয়ার বলকাতে তিনি তথাকার অধিবাসীদের পৌত্তলিকতা পালন দর্শন করেন, তাদের মূর্তি তাদেরকে সত্য প্রতিপন্ন করাত, রক্ষা করত ও অনুগ্রহ করত এবং তাদের প্রার্থনা অনুযায়ী বৃষ্টিপাত ঘটত। তার অনুরোধে তারা তাদের মূর্তি হোবলে তাকে উপহার দেয় এবং এটা তিনি মক্কায় প্রতিষ্ঠা করে এর পূজার প্রচলন করেন।

৪১. ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ, যে বৎসর হযরত মুহম্মদের (স:) জন্ম হয় এবং নাম ইসলামের ইথিওপীয় রাজা আব্রাহার পরাজয়ের স্মৃতি বহন করে।

বৎসরটির নাম দেওয়া নির্দেশের বৎসর অর্থাৎ বিধর্মীদের সহিত যুদ্ধ করবার নির্দেশ।[৪২] দ্বিতীয় খলিফার (ওমর) আমলে, ইয়েমেনের শাসনকর্তা আবু মুছা আশারী[৪৩] নিম্নলিখিত নিবেদন পেশ করেন। "আপনাদের পত্রাবলী এসেছে। তাতে তারিখ দেওয়া আছে শাবান মাস। আমি বুঝতে পারছিনা শাবান দ্বারা কোন তারিখ বুঝান হইয়াছে।" খলিফা তখন পণ্ডিতগণকে আহ্বান করেন। কতিপয় ইহুদী তাদের সম্বৎসরের প্রচলন করতে উপদেশ দেন। সুপণ্ডিত হুরমুজান[৪৪] বলেন, "পারসিকদের একটি হিসাব আছে, যাকে তারা মাহরোজ বলে" এবং এটা কি তিনি তা বুঝিয়ে দেন। কিন্তু যেহেতু উভয়টিতেই অতিরিক্ত সংযোজন আছে এবং তাদের হিসেবে তেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি কোনটাই গ্রহণ করেন নি। হিজরী সন গ্রহণ করলেন। এদের প্রবর্তিত নিয়মে সূর্য সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ার পর নতুন চাঁদ উঠার সময় হ'তে মাসের শুরু হয় এবং পরবর্তী নতুন চাঁদ দেখা পর্যন্ত চলে। এটা কখনও ৩০ দিনের বেশি বা ২৯ দিনের কম হয় না। কখনও এমন হয় যে পর পর ৪টি মাসই ৩০ দিন হয় আবার তিনটি ২৯ দিন হয়। তারিখ গণনাকারীগণ চন্দ্রের অভ্যুদয় হতে গণনা না করে চান্দ্র মাসকে দুই প্রকারে হিসাব করতে থাকেন যেমন স্বাভাবিক, যা সূর্যের দিকে বা তার বিপরীতে থেকে কোন নির্দিষ্ট অবস্থান হতে যাত্রা করে সেই স্থানে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সময় ; দ্বিতীয়ত কৃত্রিম ; যেহেতু চন্দ্রের গতি সব সময় সমান নয় এবং যেহেতু এর শ্রেণীবিভাগ বা সঠিক নির্ণয় দুঃসাধ্য। এর গতির গড় ধরা হয় এবং ফলে হিসেবের খুব সুবিধা হয়। সম্প্রতিক (গুরগানী) তালিকার হিসেবে অনুযায়ী এই সময় ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪

---

৪২ তৃতীয় বৎসরকে বলা হ'ত পরীক্ষার বৎসর

৪র্থ	শুভ সম্ভাষণের বৎসর বিবাহ হওয়া উপলক্ষে
৫ম	ভূমিকম্পের বৎসর
৬ষ্ঠ	অনুসন্ধানের বৎসর
৭ম	বিজয়ের বৎসর
৮ম	সমতার বৎসর
৯ম	ব্যতিক্রমের বৎসর
১০	বিদায়ের বৎসর
	আলবেরুনীর 'তারিখ'

৪৩. আবু মুছা আল আশারী কুফার লোক ছিলেন এবং তিনি হযরতের একজন অনুচর ছিলেন। তিনি মক্কাতে হযরতের সাথী হন এবং মদিনায় হিযরত করবার পূর্বেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আবিসিনীয়ার পলায়নকারীদের মধ্যেও তিনি ছিলেন এবং ইয়ামন হ'তে মক্কায় গমনকে ধরে তাঁর জীবনে তিনটি পলয়ান সংঘটিত হয়। (এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম ১ খণ্ড ৪৮১ পৃ:)।

৪৪. হুরমুজার একজন পারসিক পণ্ডিত ছিলেন। আবু মুসা তাঁকে বন্দী করেন এবং খলিফা ওমরের নিকট প্রেরণ করেন। খলিফা তাঁকে ক্ষমা করে মুক্তি দেন। পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। (এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম ৩৩৮।)

মিনিট।[৪৫] নিয়ম হ'ল এই যে যদি ভগ্নাংশ অর্ধেকের বেশি হয় তবে তা একদিন ধরতে হবে। এরূপে মহরম মাসে যখন ভগ্নাংশ অর্ধেকের বেশি তারা সেই মাসকে ৩০ দিন এবং দ্বিতীয় মাস ২৯ দিন গণনা করে এবং শেষ পর্যন্ত পর পর এইভাবে চলতে থাকে। সাধারণ বৎসরে তাই জিলহাজ্জ ২৯ দিন। গড় চান্দ্র বৎসরে ৩৫৪ দিন ৮ ঘন্টা ৪৮ মিনিট হয় ; এটা কৃত্রিম সৌর দিন হতে ১০ দিন ২১ ঘ ১২ মি. কম। মির্জা উলুখ বেগ তার অনুশাসন পুস্তকে এই সম্বৎসরকে ভিত্তি করেছেন। এর বর্তমান সময় পর্যন্ত ১০০২ বৎসর গত হয়েছে।

ইয়াজদাজিরদের সম্বৎসর

তিনি শাহরিয়ার আপারওয়েজ[৪৬] বি. হুরমুজ পোশিরোয়ানের পুত্র। এটা জামশিদের সিংহাসনারোহণের সময় হতে আরম্ভ হয়। তারপর প্রত্যেক পরবর্তী সম্রাট তার সিংহাসনারোহণের সময় হতে এর পুন প্রবর্তন করেন এবং ইয়াজদাজিরদ ও তাঁর শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণের সময়ের পরে পুন প্রবর্তন করেন।[৪৭] বৎসরগুলি সিরীয় মেসিডোনীয় ; কিন্তু অতিরিক্ত ভগ্নাংশগুলি ১২০ বৎসর পর্যন্ত জমিয়ে রাখা হয় এবং তখন একমাস পূর্ণ হলে সেই বৎসরটি ১৩ মাস ধরা হয়। প্রথম সংযুক্তি কারওয়ারদিনের পর করা হয় এবং এটা ঐ মাসের নামানুসারেই নামকরণ করা হয়। বৎসর ও মাস কৃত্রিম, সৌর। ৯৬৩ বৎসর গত হয়ে গিয়েছে।[৪৮] হিজরী সন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা : 'প্রথম হিজরী সনের ১লা মহরম কোন দিনে হয়েছিল এখনও এই প্রশ্নের সমাধান হয়নি" (এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা আছে)। "হিজরীর সঠিক দিন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত হতে পারেননি। বেশির ভাগ বিবরণ অনুযায়ী ইহা ৮ই রবিউল আউয়াল ছিল (৬২২ খ্রিঃ ২০ই সেপ্টেম্বর)। কিন্তু এটা মক্কা হতে যাত্রা করার দিন হতে পারে না। এটা মদিনায় আগমনের দিন। অন্যান্যদের মতে এটা ২য় বা ১২ই রবিউল আউয়াল। কিন্তু ৮ই তারিখকে প্রাধান্য দেওয়া হয় যেহেতু তা সোমবার ছিল। একটি ছুন্নী অনুযায়ী হযরতকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে যেহেতু তা

---

৪৫. এটা চান্দ্র মাস–সূর্য ও চন্দ্রের দুই যোগাযোগের মধ্যবর্তী সময়। রাশিচক্রের যে কোন নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করার সময় হতে চন্দ্রের যে স্থানে প্রবর্তনের সময় হতে এই সময় ভিন্ন। কারণ এই সময় ২৭ দিন ৭ ঘন্টা ৪৩ মি. হয়। ফলে অনেক সময় চান্দ্র মাস পুরাপুরি দিনের সংখ্যা নিয়ে ২৮ দিন ধরা হয়। ইংলণ্ডের আইন অনুযায়ী চান্দ্র মাসের সময় ২৮ দিন। (লুইস-এসট্রনমি অব দি এনমিয়েন্টস)

৪৬. আলবেরুনীতে আছে শাহরিয়ার বি. পারওয়াজ। পারওয়েজ বা অপারওয়েজ অর্থ বিজয়ী। ইয়াজজিরদের এক সম্বৎসর এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম পরিশিষ্ট ২৩২, এর ইউজফুল টে ভলুম।। ১২, এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম।V ১৭৮-এর খ্রিঃ মতে ইয়াজদিগিদ।। (খ্রিঃ ৬৩২-৬৫১), আবদাশির III (আকুঃ ৬২৮-৬৩০ খ্রিঃ) এর মধ্যে আরও কতিপয় নামমাত্র শাসনকর্তা ছিলেন।

৪৭. খ্রিষ্টীয় ৬৩২।

৪৮. পারস্যে জোরোয়াস্টার সময় হ'তে সূর্যের আবর্তন জানা ছিল এবং ইহাকে বাৎসরিক উৎসব রূপে পালন করা হতো। কিন্তু মেজিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের পর অন্তবর্তী সংযোজন অবহেলা করা হয় ; মিনিট ও ঘন্টার ভগ্নাংশ গুণ করে দিনে পরিণত করা হয় এবং বসন্তকালের সময় মেষ রাশি হ'তে অপসারণ করে মীন রাশিতে নেয়া হয়।" ('গিবন, ডিক্লাইন এণ্ড ফল X ৩৬৭ পৃ. ১৭৯৭ সনে প্রকাশিত)।

সোমবারটা কেন বিশেষভাবে পালন করেন, তখন তিনি জবাব দেন, 'এইদিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, এই দিনে আমি নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছি এবং এই দিনেই আমি হিজরত করেছি।" হিজরতকে মুসলমানদের সম্বৎসরের প্রারম্ভ গণ্য করা খলিফা ওমরের সময় হতে শুরু হয়। যে সব ছুন্না দ্বারা ইহা হযরত কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে দেখান হয় তা সম্ভবত ঠিক নয় (এনসাইক্লোপেডিয়া ইসলাম)।

এনসাইক্লোপেডিয়া ইসলামের চতুর্থ খণ্ডে ১২১০ (জামানের সাথে) মুসলমানদের প্রবর্তিত ক্যালেণ্ডার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। "যদিও ইসলামের সম্বৎসর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই (১৬ই) জুলাই এ শুরু হয়, মুসলমানদের পক্ষে অদ্ভুত হলেও চান্দ্র বৎসর। হিজরী ১০ সনের পূর্বে প্রবর্তিত হয় নাই। ঐ বৎসরে (৬৩১খ্রিঃ) যখন হযরত মুহম্মদ (দঃ) মক্কায় শেষ হজ্জ করেন। তিনি ব্যবস্থা করেন যে প্রতিটি ২৯ (২৮,৩০) দিনের ১২ চান্দ্র মাসে বৎসর গণনা করা হবে এবং অন্তবর্তী সংযোগকরণ নিষিদ্ধ করা হবে।

এর পূর্বে মক্কাতে পুরাপুরি সৌর বৎসর চালু ছিল, যেহেতু মাসগুলির নামের অংশসমূহ বৎসরের বিভিন্ন ঋতুর নির্দেশ দেয় পরিবর্তনশীল চান্দ্র বৎসরে কখনও এরূপ হতে পারে না। (হেস্টিংসের এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন হতে উৎপন্ন)।

মালিকী সম্বৎসর

একে জালালীও বলা হয়। ঐ সময়ে পারসিক সম্বৎসর চালু ছিল। অন্তবর্তী সংযোজনের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে গেলে বৎসরগুলি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। সুলতান জালালুদ্দীন[৪৯] মালিক শাহ মালজুকীর নির্দেশে ওমর খৈয়াম ও অন্যান্য কতিপয় পণ্ডিত মিলে এই সম্বৎসরের প্রবর্তন করেন। সূর্যের মেষরাশিতে প্রবেশের সময় হতে বৎসরের আরম্ভ হয়। বৎসর ও মাসগুলি প্রথমে স্বাভাবিক ছিল কিন্তু বর্তমানে মাস সাধারণ কৃত্রিম। প্রতিমাসে ৩০ দিন থাকে এবং ইসকান্দার শেষে তারা ৫ বা ৬ দিন যোগ করে। এর ৫১৬ বৎসর গত হয়েছে।

খানী সম্বৎসর

খাজান খানের[৫০] রাজত্ব কাল হতে শুরু এবং এলখানী তালিকা করে প্রবর্তিত। বৎসর ও মাস স্বাভাবিক, সৌর। এর প্রবর্তনের পূর্বে রাজকীয় দপ্তরে হিজরী সন ও চান্দ্র সন অনুযায়ী

---

৪৯. গিবনের ৫৭ পরিচ্ছেদে তাঁর সম্বন্ধে এক চমৎকার প্রবন্ধ (লেখা আছে এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম) III ২১১তেও আছে। তাঁর সম্বৎসর সম্বন্ধেও এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম ১০০৬ (জালালীর সাথে)ও IV ৬৭২ (তারিখ এর সাথে) এবং III ৮৮৮ (নওরোজ-এর সাথে) এই সাল ১০৭৯ খ্রিঃ ১৫ই মার্চ শুরু হয়।

৫০. খজন খান মাহমুদ আরখুনের জেষ্ঠপুত্র। আরখুন ছিলেন ভ্রাতার মুঘল বা পারস্যের ইলখানীয় বংশের চেঙ্গিস খানের পুত্র মঙ্গুখানের অষ্টম উত্তরাধিকারী। তিনি হিজরী ৬০১৮ (খ্রিঃ ১২৯৪) সিংহাসনে

তারিখ প্রতিপালিত হতো। এইভাবে সাংঘাতিক অত্যাচারের পথ খোলা থাকে—কারণ ৩১টি চান্দ্র বৎসর মাত্র ৩০টি সৌর বৎসরের সমান। ফলে কৃষকদের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয় কারণ রাজস্ব নেওয়া হতো চান্দ্র বৎসর অনুযায়ী আর ফসল উৎপন্ন হতো সৌর বৎসর অনুযায়ী। খাজান খান এই প্রথা বিলুপ্ত করে এই সম্বৎসরের প্রবর্তন করেন এবং ন্যায় পরায়নতার নিদর্শন স্থাপন করেন। মাসের নামগুলো তুর্কী, তবে সেগুলোর সঙ্গে খানী শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। এর ২৯৩ বৎসর গত হয়েছে।

ইলাহী সম্বৎসর

হিন্দুস্তানের সর্বত্র যাতে অব্যবস্থা দূর হয়ে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় সেজন্য বহুদিন হতেই বৎসর ও মাসের এক নতুন গণনার প্রবর্তনের বাসনা করেন। তারা হিজরী সনের পক্ষপাতী ছিলেন কারণ তাতে ক্ষতিকর ব্যাপার ছিল। কিন্তু অদূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও অজ্ঞান লোকের সংখ্যাধিক্যবশত যারা বিশ্বাস করে যে প্রচলিত সাল ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, সম্রাট সহৃদতার জন্য এবং প্রজাদের অন্তরের আঘাত দিতে না চাওয়ার ফলে এটা বন্ধ করেন নাই। যদিও পৃথিবীর ন্যায়পরায়ন লোকদের নিকট এটা পরিষ্কার হয়েছিল যে ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের বাজার মুদ্রার সাথে ধর্ম সম্পর্কের ধারাবাহিকতার সহিত আধ্যাত্মিক সত্যের দ্বি-সূত্রের পবিত্রতারই কি সম্পর্ক থাকতে পারে, তবু এই পৃথিবীটা অবিবেচনার ধূলায় পূর্ণ এবং সূক্ষ্মদর্শীগণ খেঁকশিয়ালের[৫১] কাহিনী হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন, যে খেঁকশিয়াল উটদের দাগ দেওয়ায় পলায়ন করেছিল। সম্বৎসরের ৯৯২ সালে তার আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তা হতে তার জ্ঞানবর্তিকায় নতুন আলোক সজ্জাত হ'ল এবং এর পূর্ণ 'আলোক মানবজাতিকে—সমুজ্জ্বল করল। সৌভাগ্যশালীগণ, সত্যসন্ধানীগণ প্রত্যাশায় শয্যা হতে মাথা তুলল এবং দুষ্ট চরিত্র ও অলস ব্যক্তিগণ এককোণে সরে গেল। ইতিমধ্যে সম্রাটের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রতিনিধি আমীর ফতেউল্লাহ শিবাজী[৫২] জ্ঞানগৃহের 'অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন, এই লক্ষ্য কার্যে পরিণত করতে আরম্ভ করেন এবং সাম্প্রতিক প্রচলিত গুরগানী অনুশাসনকে ভিত্তি করে সম্রাটের সিংহাসনারোহণের সময় হতে এই সম্বৎসরের

আরোহণ করেন এবং তাঁর আর্সগাপুত খোদাবন্দা মুহম্মদ হিঃ ৭০৩ (খ্রিঃ ১৩০৩) সিংহাসনারোহণ করেন। এলখানী সম্বৎসর সম্বন্ধে এনসাইক্লোপেডিয়া ইসলাম পরিশিষ্ট ২৩২ দ্রষ্টব্য : খজন খান সম্বন্ধে 'একই গ্রন্থের I ১৪৯ দ্রষ্টব্য।

৫১. গুলিস্তান ১ গল্প সংখ্যা XVI "তারা তাকে বলল, "সহ পাগল উটের সাথে তোমার কি সম্পর্ক আছে এবং উটের সাথে তোমার চেহারারই বা কি মিল আছে?" সে জবাব দিল, "শান্ত হও, যদি হিংসুকগণ তাদের মতলব হাসিলের জন্য বলে যে ইহা একটি উট, কে তখন আমার অবস্থা তদন্ত করে আমাকে ছাড়াবার জন্য কষ্ট করবে?' আকবর তার রাজত্বের ২৯ বৎসরের প্রারম্ভে ইলাহী সম্বৎসরের প্রবর্তন করেন হিঃ ৯৯২ সালের ৮ই রবিউল আউয়াল-১০ই মার্চ ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দ। (আকবরনামা ইংরাজী অনুবাদ III ৬৪৪)। এ প্রনমেপ ইউজফুল টেবলন II ৩৭।

৫২. আইন-ই-আকবরীর প্রথম খণ্ডের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ করেন। দর্শনীয় মহত্বের উজ্জ্বল্য, পৃথিবীর অধিপতির স্বয়ং ইহাকে নির্মাণ করে যার নিদর্শন প্রদর্শন করেন, বিশেষত এতে যখন আধ্যাত্মিক জগতের নেতৃত্বে কেন্দ্রীভূত হয় এবং অনুকূল প্রজাগণ কর্তৃক ইহার স্বীকৃতির জন্য ইহাতে স্বর্গীয় ভাবের আরোপ করা হয় এবং এর চিরস্থায়ী প্রবর্তনের সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়। বৎসর ও মাস স্বাভাবিক, সৌর, কোন অন্তবর্তী সংযোজন নেই, তবে মাস ও দিনের পরিমিত নামসমূহের কোন পরিবর্তন করা হয়নি। মাসের দিনগুলি ২৯ হ'তে ৩২ ধরা হয় এবং শেষটার দুই দিনকে বলা হয় রোজ ও সাব (রাত ও দিন)। প্রত্যেক সম্বৎসরের মাসগুলির নাম সুবিধার জন্য–তালিকার আকারে লিপিবদ্ধ করা হলো।

১.	২.	৩.	৪.	৫.
হিন্দু মাস	খাতাই মাস	উইখির সম্বৎসর	জ্যোতির্বিদের সম্বৎসর	আদমের সম্বৎসর
চৈত	চানওয়ে	আরাম আয়	,,	,,
বৈশাখ	ঝে সেওয়েহ	ইকানদি আয়	,,	,,
জেথ	সামওয়েহ	ওচান্দ আয়	,,	,,
আষাঢ়	হার ওয়েহ	দার ছানজ আয়	,,	,,
শাওন	উত্তয়েহ	বেশাঞ্জ আয়	,,	,,
গদন	লুওয়েহ	আলতিনজ আয়	,,	,,
কুনওয়ার	চিত্তরেহ	ইয়েতিনজ আয়	,,	,,
কার্তিক	বাওয়েহ	সকসানজ আয়	,,	,,
অধন	খেওয়েহ	তুকশানজ আয়	,,	,,
পৌষ	শাবওয়েহ	ওন্নানজ আয়	,,	,,
মাঘ	শায়যায়ওয়েহ	ওনবারানজ আয়		
ফাগুন	সির ওয়েহ	হাকসাবাত আয়	,,	,,

৬.	৭.	৮.	৯.	১০.
ইহুদীদের সম্বৎসর	মহাপ্লালনের সম্বৎসর	নবনাসারের সম্বৎসর	ফিলিপাস আবহিডিয়াস	কপটীয় সম্বৎসর
			এর সম্বৎসর	
তিশরী	,,	থোথ	থোথ	থোথ
মারহেশওয়ান	,,	বাপেহ	বাপেহ	পাত্তপী
কিমলিউ	,,	হাতোর	যতার	খওয়াক
তেবেথ	,,	তুবাহ	কেহাক	খওয়াক

শেবাত	,,	আমশের	তুবাহ	তায়বী
আধার	,,	,,	আমশের	ফমনোথ
নিযান	,,	,,	বরমহ্যত	ফরমুথি
ইয়ার	,,	,,	বরমুলাহ্	নচোন
সিত্তয়ান	,,	,,	বসনছ	পয়নী
তাম্মুজ	,,	,,	বোনাহ	ইঠপফী
আব	,,	,,	আবিদ	মেনরী
ইলুল	,,	,,	মিনরী	

১১. সিরীয় মেসিডোনীয় সম্বৎসর	১২. অগস্টানীয় সম্বৎসর	১৩. খ্রিষ্টীয় সম্বৎসর	১৪. এল্টলিনাসের সম্বৎসর	১৫. ভাত্তক্লেসিয়ানের সম্বৎসর
তাশরিনুল	নাবু	জানুয়ারি		
আউয়াল	নাসারের	ফেব্রুয়ারি		নাবু
তাশরিনুল	অনুরূপ	মার্চ		নাসারের
আখির		এপ্রিল		অনুরূপ
কানুনুল		মে		
আউয়াশ		জুন		
কানুনুল		জুলাই		
আখির		আগস্ট		
কোবাত		সেপ্টেম্বর		
আজার		অক্টোবর		
নিসাজ		নভেম্বর		
আরয়ার		ডিসেম্বর		
হুনজুরান				
তমুজ				
আয়নুল				

১৬.	১৭.	১৮.	১৯.	২০
হিজরা সম্বৎসর	ইয়াজদিজিরদের সম্বৎসর	মালিকী সম্বৎসর	খানী সম্বৎসর	পবিত্র সম্বৎসর
মুহরম	ফবওয়ারদিন	ফরওয়াদিন মাহ	আরমে আয়	ফরওয়ারদিন শাহ
সফর	মাহ নুরাতুন	ই জালানী	খানী	ই ইলাহী
রবিউ আউয়াল	আরদিচিহিমতমাহ	ইত্যাদি	ইত্যাদি	ইত্যাদি
রবিউস সানী	খুরদাদ পুঃ প্র	ইত্যাদি	ইত্যাদি	১৮ নভেম্বরের মতো
জমাদিউল আউয়াল	তিরমাহ পুঃ প্র	ইত্যাদি	তনম্বরের মতো	শুধু জালালীর
জমাদিউস সানী	আমুরদাদ মাহ পুঃ প্র	১৭ নভেম্বর	শুধু আয় এরপর	বদলে ইলাহী হবে
রজব	শাবেওয়ার মাহ পুঃ প্র	মতো শুধু	খানীশব্দ যোগ	
শাবান	মিহর মাহ পুঃ প্র	মাহএর পর	করতে হবে	
রমজান	আখার মাহ পুঃ প্র	জালালী	চতুর্থ মাসের	
শাওয়াল	দীয় মাহ পুঃ প্রশঃ	শব্দ যোগ	বেলায় তৃতীয়	
জি কাযা	বাহমান মাহ পুঃ প্রঃ	করতে হবে	নম্বরের দারদানজ	
জ্বি হজ	ইসকান্দার মু		এর স্থলে তোর	
	মাহ পুঃ প্রঃ		তনজ হবে	

পৃথিবীর ঘটনাবলী সময়ানুক্রমিক লিপিবদ্ধ করলে তা ইতিহাসবিজ্ঞানে পরিণত হয় এবং যে এতে ব্যুৎপত্তি লাভ করে সেই ঐতিহাসিক। ভারত, খতা, ফ্রাঙ্ক, ইহুদী ও অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে এই বিজ্ঞানের বহু লেখা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিজাজে যে সর্বপ্রথম এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন তিনি হলেন মুহম্মদ বি. ইসহাক। অতঃপর আসে ওয়াহাব বি. মুরাবিবহ, ওয়াকিফী, আছমা-ই, আবারী, আবু আবদুল্লাহ মুসলিম বি. কুতায়বাহ, কুফার আনাম, মুহম্দ সুকান্না, হাকিম আলী মিসকাওয়াইহ, ফকরুদ্দীন মুহম্মদ বি. আলী, দাউদ সুলায়মান বিশকিতী, আবুল ফরাজ, ইমাদউদ্দীন বি. কাশির, মুকাদ্দানি, আবু হানিফা দিনওয়ারী মুহম্মদ বি. আবদুল্লাহ মাসাউদী, ইবনে খাল্লাকান, ইয়াকা-ই-আবু নসর উতবী ; পারসিকদের মধ্যে ফির্দৌসী তুসি, আবুল হাসান বৈহাকী, তারিখি খুসবাড়ীর লেখক আবুল হোসেন, খাজা আবুল ফজল বৈহাকী, আববাস বি. মুসাব, আহমদ বি.

সায়য়াব, আবু ইসহাক বাজ্জাজ, মুহম্মদ বলখী, আবুল কাসিম লেখক কা-বি. আবুল হাসান ফারসি, তাজুল-মাসিরের লেখক সদরুদ্দীন মুহম্মদ, আবু আবদুল্লাহ খুজখানী (তাবাকাত-ই-নাসিরীর লেখক) কবিরুদ্দীন ইরাকী, জুবদাহ এর লেখক আবুল কাসিম কাশি, মাখজান-উল বালাঘাতএর লেখক খাজা আবুল ফজল এবং ফজাইল-উল-মূলুক আলাউদ্দীন বু আইনী, খাজা শামসুদ্দীনের ভ্রাতা, দিও খানের লেখক (তিনি তারিখ জাহানকুশা প্রণয়ন করেন),—হামদুল্লাহ মুস্তৌফি, কাজউইনী, কাজী নিযাম বায় ধাভী, খাজা রশিদী তাবিব, হাবিব আবু এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত লেখকগণ।

এরূপভাবে বহুদিন হতেই সমসাময়িক ঘটনা সময় দ্বারা লিপিবদ্ধ করে রাখবার প্রথা চলে আসছে এবং একটি শব্দ বা শ্লোকাংশ বা অনুরূপ কিছু দ্বারা বৎসর লিখে রাখা হচ্ছে এবং একেও তারিখ বলা হচ্ছে। যেমন সম্রাটের সিংহাসনারোহণের সময় বুঝাতে তারা নসরাত-ই আকার এবং কাম বক্স শব্দ দু'টি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ ইহা কিছু কিছু চর্চা করত যেমন আবী সিনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ লেখ হয়েছে :

আবু আলী সিমা সত্যের প্রতীক

শাজাতে (৩৭৩) প্রবেশ করে তিনি অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে প্রবেশ করেন। শাখাতে (৩৯১) তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। তাকাজে (৪২৭) তিনি পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবুল ফজল এই নামগুলি রৌজতিউস সাফা গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করেছেন। আবুল ফজল শুধু নামগুলি লিখেছেন কোন বিবরণ দেন নাই। তাঁদের জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হ'ল। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে তাঁদের সম্বন্ধে আরও বিশদ বিবরণ দেয়া আছে।

মুহম্মদ বি. ইসহাক—খ্যাতনামা পুস্তক আলমখাথী ওয়াস সিয়ারএর লেখক। তিনি মদিনার অধিবাসী ছিলেন এবং ছুন্নার পরিবহনকারী হিসেবে অত্যন্ত সম্মানীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। আল বুখারী এবং অসসাদো-ই একে মুসলেম বিজয় সম্বন্ধীয় ইতিহাসের প্রথম উৎস বলে গণ্য করতেন। হিঃ ১৫১ (ক্রিঃ ৭৬৮) তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। তাঁর লেখা হতেই ইবনে হিশাম হারাতের জীবনী লেখার উপাদান সংগ্রহ করেন।

ওয়াহাব বি. মুয়াবিব—তিনি পারসিক সৈন্যদের বংশধর ছিলেন। হিঃ ১১০ সালে মুহরম মাসে (এপ্রিল-মে ৭২৮ খ্রিঃ) এমনের সানাই এ ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ আবার বলেন হিঃ ১১৪ বা ১১৬ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তার বয়স ৯০ বৎসর হয়েছিল। তিনি বহু গাথা ও প্রাচীন কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ প্রাক-ইসলামিক পারস্য, গ্রীস, এমন, মিশর ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সব তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বেশির ভাগই তাঁর লেখা হ'তে সংগৃহীত। পরবর্তী মুসলমান সমালোচকগণ একে একজন দুঃসাহসী মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেছেন। ওয়াকিদী-আবু আবদুল্লাহ, মুহম্মদ বি. ওমর, ওয়াকিদ, আলওয়াকিজী মক্কার অধিবাসী ছিলেন এবং মুসলমান বিজয়ের খ্যাতনামা পুস্তক, "বিজয়

অভিযান", তাঁর লেখা। হিঃ ১৩০ অব্দে তার জন্ম হয় (সেপ্টেম্বর ৭৪৫ খ্রিঃ) ইন্তেকাল করেন সোমবার ১১ই জুলহজ্জ হিঃ ২০৬ (২৭ই এপ্রিল ৮২৩ খ্রিঃ)।

আসমা-ই আবু সইদ আবদুল মালিক বি কুরাইব আল আসমা-ই--একজন খ্যাতনামা দার্শনিক ও আরবী ভাষার সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বশরার অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময় তাঁকে বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়। কথিত আছে যে ১৬০০ শ্লোক তার মুখস্ত ছিল। জন্ম হিঃ ১২২ (খ্রিঃ ৭৪০) ইন্তেকাল সফর হিঃ ২১৩ (মার্চ-এপ্রিল ৭২৮খ্রিঃ)।

তায়াবী-আবু জাফর মুহম্মদ বি. জারির আত তাবারী, কোরানের সুবিখ্যাত ব্যাখ্যার লেখক এবং খ্যাতনামা ইতিহাস পুস্তকের লেখক। তাঁকে একজন অতি বিশুদ্ধ ছুন্না পরিবহনকারীরূপে গণ্য করা হয়। জন্ম হিঃ ২২৪ (৮৩৮-৩৯ খ্রিঃ) তাবারিস্তানের আমাল নামক স্থানে জন্ম হয় এবং বাগদাদে হিঃ ৩১৯ (৯২৩ খ্রিঃ) তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবু আবদুল্লাহ মুসলিম (২১৩-২৭০ হিঃ) দিশওয়ারের অধিবাসী, কেহ বলে মার্ভের। কিতাব-উল মাযারিক এবং আদাব-উল-কাতিব (লেখকদের জন্য নির্দেশাবলী) পুস্তকদ্বয়ের লেখক। প্রথমটি একটি সাধারণ জ্ঞানের পুস্তক। এতে প্রথম যুদ্ধের মুসলমানদের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া আছে। আ-নাম কুফি-মুহম্মদ বি. আলী, আনিম কুফি নামে পরিচিত। তাঁর লেখা ফুতুই-আনিম (হাজী খান) হযরতের মৃত্যুর পর হতে কারবালায় হোসেনের মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের বিবরণী। আহমদ বি. মুস্তৌফি ইহা পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন।

মুহম্মদ মুকান্না-ফ্রেটাগ এর মুহম্মদ বি. ওহমাইজ্জাহ লিখেছেন। কথিত আছে যে তাঁর সৌন্দর্য সংরক্ষণের জন্য তিনি যে মুখাবরণ পরিধান করতেন তা হতে তাঁর উপাধি মুকান্না হয়। বহুমূল্য উপহার দিয়ে তিনি তাঁর সম্পদ শেষ করে ফেলেন : উমাইয়া বংশের রাজত্বের সময় তিনি জীবিত ছিলেন এবং লোকেরা তাঁকে বিশেষ সমীহ করত। কিন্তু তিনি তখন দরিদ্রতার মধ্যে বাস করতেন। আবু আসব (পরে আবু মুহম্মদ) ইবন আল মুকাফ্ফা (এনসাইক্লোপেডিয়া ইসলাম ॥ ৪০৪) আর তিনি এক ব্যক্তি নন।

আবু আলী মুহম্মদ বি. মিসকাওয়াইহ তিনি সদ্বংশজাত একজন পারসিক এবং বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি মালিক আইদ উদদৌলা বি. বুয়াইদ এর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি অনেকগুলি পুস্তকের লেখক। সম্ভবত তিনি হিঃ ৪২০ সালে ইন্তেকাল করেন।

দাউদ সুলেমান বিশকির্তি—পারস্যের ইতিহাসের সংকলন বৌধাত-উল আলবাব-এর লেখক। সুলতান আবু মইদ বাহাদুরের নির্দেশে তিনি খাতাই রাজাদের ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

আবুল ফরাজ—এই নামের দুইজন আছে (১) ৮৯৭-৯৬৭ খ্রিঃ সুবিখ্যাত কিতাব উল আখালীর লেখক (২) বরহে ব্রেয়াস, ১২২৬-১২৮৬. এক খ্যাতনামা পৃথিবীর ইতিহাস পুস্তকের লেখক। (এনসাইক্লোপেডিয়া ইসলাম দ্রষ্টব্য)।

হাফিজল মদুদ্দীন-ইসমাইল বি. আবদুল্লাহ আদ দিমাথাকী। হিঃ ৭৭৪ (১৩৭২ খ্রিঃ) ইন্তেকাল করেন। তাঁর লিখিত ইতিহাসের নাম 'আলবিদায়াহ ওয়া আল নিহায় আহ'। তাঁর নিজের সময় পর্যন্ত লিখিত হয়।

মুকাদ্দামী এই নামের কয়েকজনই আছে। সামসুদ্দীন আবদুল্লাহ একটি ভূগোল পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তাঁর নাম আহসানউল তাকাসিক ফি মারিফাতিল আকালিম, সাত যাবহাওয়ার বর্ণনা। হিঃ ৩৪১ (১০৪৯ খ্রিঃ) ইন্তেকাল করেন (এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম III ৭০৮) ; দ্বিতীয় হুসামসুদ্দীন মুহম্মদ বি. আবুল ওয়াহিদ, বিচারের রায় সম্বন্ধীয় এক পুস্তকের লেখক ; হিঃ ৬৪২ (১২৪৫ খ্রিঃ) ইন্তেকাল করেন। সম্ভবত আবুল ফজল তাঁকেই বুঝিয়েছেন, সাহাবুদ্দীন আবু মাহমুদ আস শাফা–ই, তাঁর গ্রন্থের নাম মুথিরুল খরাম ইলা জিয়ারাতিল কুদস ওয়াল শাম। হিঃ ৭৬৫ (১৩৬১ খ্রিঃ) ইন্তেকাল করেন।

আবু হানিফা আহমদ বি. দাউদ আদ দিনাওয়ারী-ইসলাহ উল মনতিক নামক গ্রন্থের প্রণেতা। হিঃ ২৯০ (খ্রিঃ ৯০২) সালে ইন্তেকাল করেন।

মাসাউদী–সুরুজ–উদ–দহাব–এর লেখক। তিনি খলিফা মোতিয়া বিল্লাহ–এর রাজত্বকালে প্রণয়ন করেন। তিনি আরও কতিপয় পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক সৃষ্টির আরম্ভ হতে শুরু করে খলিফাদের ইতিহাস লিখে তাঁর সময় পর্যন্ত আসেন। হিঃ ৩৪৬ (৯৫৭ খ্রিঃ) কায়রোতে তিনি ইন্তেকাল করেন। (এনসাইক্লোপেডিয়া ইসলাম III ৪০৩)।

ইবনে খাল্লাকান-খ্যাতনামা জীবনী লেখক : তাঁর গ্রন্থ ওয়াফায়আতুল আয়আকান বিখ্যাত লোকদের জীবনী এবং এটা একটি সুবিখ্যাত পুস্তক। মিশরের মামলুক বংশের সুলতান ব্যরবার এর অধীনে এ গ্রন্থ লিখিত হয়। এই পুস্তকের শেষে তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে সামান্য বিবরণ দিয়েছেন। পুস্তকটি হিঃ ৬৭২ (১২৭৩–৪ খ্রিঃ) শেষ হয়। এর জন্ম হয় হিঃ ৬০৮ (১২১১ খ্রিঃ) এবং মৃত্যু হয় হিঃ ৬৮১ (১২৮২ খ্রিঃ এনসাইক্লোপেডিয়া : ইসলাম ।। ১৯৬)।

আবদুল্লাহ বি আসাদ আল ইয়াফা-ই আল ইয়ামনী, মৃত্যু হিঃ ৭৬৮ (১২৬৬ খ্রিঃ)। তাঁর প্রণীত সিরাতুল জনান ওয়া ইবরাত উল ইয়াফবীন, হিজরতের সময় হতে শুরু করে তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস। তাঁর অপর গ্রন্থ রৌধাতুল রিয়াহিম, মুসলমান দরবেশগণের জীবনী। এনসা. ইস. IV ১১৩৪।

উতবী–তাঁর গ্রন্থ তারিখ ইয়ামনী। তাঁর সমসাময়িক গজনীর সুলতান ইয়াসীন উদ দৌলা মাহমুদ বি. মবুক্তজীনের ইতিহাস। এতে হিঃ ৭২৭ (১০৩৬–৭) সন পর্যন্ত ইতিহাস দেওয়া হয়েছে।

বৈহাকী–(১) আবু হাসান আলী বি. জায়েদ আল বৈহাকী, তিশাহী দুমিয়াতিল কসর পুস্তকের লেখক। এটা কবি বখাবজীর দুমিয়াতুল কসরএর একটি পরিশিষ্ট। হিঃ ৪৬৭ (১০৭৫ খ্রিঃ) তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি তারিখই বৈহাক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

বৈহাকী–(২) আবুল ফজল 'মুহম্মদ বি. হোসেন–৩০ খণ্ড সম্বলিত গজনীর রাজাদের ইতিহাস পুস্তকের লেখক। এর পাঁচ খণ্ড মাসাউদ বি. মাহমুদের রাজত্বের ইতিহাস রক্ষিত আছে। এনসাইক্লোপেডিয়া ইসলাম । ৫৯২–৫৯৩।

আবুল হোসেন-মুহম্মদ বি. সুলেমান আল আশারী পারসিক রাজাদের ইতিহাস তারিখ খসরুভীর প্রণেতা।

আব্বাস বি. মুসাব-তারিখ খোবাসালের লেখক। আহমদ বি. মারয়ার বি. আইয়ুব-হাফিজ, আবুল হাসান আল মারওয়াজী একজন সুবিখ্যাত ও বিশ্বস্ত ছুন্না পরিবহনকারী। মৃত্যু হি. ২৬৮ (৮৮১ খ্রিঃ) আবু ইসহাক মুহম্মদ বি. আল বাজ্জাজ, হিরাতের এক ইতিহাস গ্রন্থের লেখক। আবুল কাসিম আলী বি. মাহমুদ বালখের এক ইতিহাস পুস্তকের লেখক।

আবুল হাসান-আবদুল গফুর বি. ইসমাইল আল ফারসি-সিয়াক ফি দাইলী তারিখ নিশাপুর নামক গ্রন্থের লেখক। হিঃ ৫২৭ (১১৩২ খ্রিঃ) ইন্তেকাল করেন। হাঃ খাঃ খুজযানী তাঁর গ্রন্থ তাবাকাত ই নাসিরী দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ বি. মুহম্মদ আলতামাস এর সামরিক অভিযানসমূহের ইতিহাস। লেখকের নাম আবু ওমর, ওসমান বি. মুহম্মদ আল মিনহাজ, সিরাজ আল খুজজানী। বেভার্তী এই গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন।

কবির উদ্দীন ইরাকী-সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর বিজয় অভিযানের ইতিহাসের লেখক তাজউদ্দীন ইরাকীর পুত্র। তিনি একজন সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। জিয়াউদ্দীন বারনীর তারিখ-ই ফিরোজ শাহীতে তাঁর উল্লেখ আছে। আবুল কাসিম জামালুদ্দীন মুহম্মদ-মৃত্যু হিঃ ৮৩৬ (১৪৩২ খ্রিঃ) ফারসি ভাষায় জুবদাতুল তাওয়ারিস গ্রন্থের প্রণেতা।

আবুল ফজল ওবায়দুল্লাহ-(হাজীখান বৌধাত উস সাফা গ্রন্থে আবদুল্লাহ লিখেছেন) বি. আবিনসর আহমদ বি. আলী বি. আল মিকাল। তাঁর প্রণীত উভয় গ্রন্থই ইতিহাস গ্রন্থ। আলাউদ্দীন আতা মালিক আল যুআইনী ফারসি ভাষার ইতিহাস জাহান কুশার লেখক। এনসা. ইসঃ। ১০৬৭-১০৭০।

হামদুল্লাহ বাজভিনী-তারিখ গুজিদার লেখক। এটা প্রাচ্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এটা উজির গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদএর জন্য লিখিত হয়। প্রথমে এটা ৫০,০০০ কবিতায় লিপিবদ্ধ হয় পরে হিঃ ৭৩০ (১৩২৯-৩০ খ্রিঃ) একে গদ্যে পরিণত করা হয়। এনসা. ইস. ।। ৮৪৪।

কাজী নাসিরুদ্দীন আবদুল্লাহ বি. ওমর আল বৈদাভী মৃত্যু হিঃ ৬৮৪ (১২৮৫ খ্রিঃ)। নিধামুত তাওয়ারিখ নামক গ্রন্থের প্রণেতা। এটা পারস্যের ইতিহাস এবং তৎসঙ্গে উমেয়াদ বংশ হতে খোজাবজক ও মুঘলদের সহ মুসলমান রাজবংশগুলির ইতিহাস সংযুক্ত। এনসা. ইস. । ৫৯০।

খাজা রশিদী-খাজা রশিদুদ্দীন ফজলুল্লাহ,তাবিব, "পারস্যের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের একজন" (হিঃ ৭১৮, ১৩১৮ খ্রিঃ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়)। জামিউত তাওয়ারিখ গ্রন্থের লেখক। তিনি খাজান খানের মৃত্যুর অল্প আগে হিঃ ৭০৪ (১৩০৪ খ্রিঃ) লেখা আরম্ভ করেন। তাঁর পরবর্তী খোদাবন্দা মুহম্মদ তাঁকে এটা করবার নির্দেশ দেন এবং এর প্রারম্ভে তাঁর নাম দিতে বলেন এবং চিঙ্গিশ বংশের ইতিহাসের সঙ্গে সাধারণ ইতিহাস সংযোজন করতে বলেন। এনসা. ইস. ।। ১১২৪।

হাফিজ আব্রু শিহাবুদ্দীন আবদুল্লাহ বি. লুতফুল্লাহ বি. আবদুর রশিদ আল খাকি (আল হারাভী নয়) জুবতাতুল তাওয়ারিখের লেখক। ইহা বহিসনখর মির্যার জন্য লিখিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রধান প্রধান ও অস্বাভাবিক ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ হতে সম্বলিত হয়। হিঃ ৮২৯ (১৪২৫ খ্রিঃ) পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস লিখিত হয়। হিঃ ৮৩৪ (১৪৩০ খ্রিঃ) তিনি ইন্তেকাল করেন। এনসাই. ইস. ॥ ২১৩।

অভিমেন্না-এই খ্যাতনামা দার্শনিকের পুরা নাম আবু আলী হোসেন বি. আবদুল্লাহ বি. মিশ, আস শেখ, আর রহিম। ফলে প্রাচ্যে তিনি তাঁর পিতার নাম হতে ইবনে মিশ এবং পুরই মিশ নামে পরিচিত। এনসা. ইস. ॥ ৪১৯-৪২০ (ইবনে মিশ নামে)। হিঃ ৩৭০ (৯৮০ খ্রিঃ) বুখারায় তাঁর জন্ম হয় এবং হিঃ ৪২৮ (১০৩৬ খ্রিঃ) ৫৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

আইন-১

প্রাদেশিক প্রতিনিধি। সিপাহসালার অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর সেনাপতি।[৫৩]

তিনি সম্রাটের প্রতিনিধি। প্রদেশের সামরিক বাহিনী অধিবাসীগণ তাঁর অধীনস্থ এবং তাদের মঙ্গল তাঁর ন্যায় পরায়ন শাসনের উপর নির্ভরশীল। তাঁর সব কার্যে তিনি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা পূরণ করবেন এবং সর্বদা তার প্রসংশা করবেন ও বিনয় প্রকাশ করবেন। কখনও তিনি জনগণের মঙ্গলের কথা বিস্মৃত হবেন না বা কখনও তাঁর উদ্যম হারাবেন না। তিনি দাম্ভিক ও রুক্ষ মেজাজের হবেন না। তিনি সদা সতর্ক থাকবেন এবং পদমর্যাদার প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন বিশেষত যে সব অধীনস্থ অনুচর তাঁর আশেপাশে কাজ করে এবং দূরের কর্মচারীদের সম্বন্ধে। যে কাজ অধীনস্থ লোকদের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে সে কাজে কখনও তিনি তার পুত্রদের নিয়োগ করবেন না। আর যে কাজ পুত্রদের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে সে কাজ কখনও নিজে করবেন না। প্রত্যেক আদান-প্রদান সম্বন্ধেই তিনি তার চেয়ে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ নিবেন। কিন্তু যদি সেরূপ কোন ব্যক্তি না পাওয়া যায় তবে তিনি কয়েকজন বাছাই করা লোকের সাথে আলোচনা করবেন এবং তাদের মতামত বিবেচনা করে দেখবেন।

কখনও এমন হয়, পলিত কেশ মহাজ্ঞানী
আসল কাজের সময় যায় হারমানী
আর কম বয়সের অনিপুণ হাতের
সহসা নিক্ষিপ্ত তার লক্ষ্য ভেদ করে।

(সাদী গুলিস্তান, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

তিনি বেশী লোকের পরামর্শ নিবেন না। কারণ বুদ্ধিমান, উদ্যমশীল, আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ পরায়ন পরামর্শদাতা কদাচিৎ পাওয়া যায়। তাই বেশি লোক তার গোপন তত্ত্ব জ্ঞাত হলে

---

৫৩. সিরাতুল আহমদীদে আকবরের ফরমান উদ্ধৃত আছে তাতে সিপাহশালালের দায়িত্ব বর্ণনা করা আছে। প্রদেশিক প্রতিনিধি (সিপাহশালার) এবং রাজস্ব আদায়কারীদের প্রধান (দেওয়ান) মধ্যকার পার্থক্য মুসলিম শাসনতন্ত্রের গোড়া হতে চলে আসছে। যখন আরবগণ মিশর অধিকার করে শাসন প্রতিষ্ঠা করে তখন হতে ; "আরব শাসনের প্রথম যুগে (মিশরে) দুই প্রকারের রাজনৈতিক কার্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শাসনকর্তৃত্ব ও কোষাগার, প্রদেশিক শাসনকর্তা, আমীরের শুধু সামরিক বাহিনী ও পুলিশের উপর কর্তৃত্ব ছিল। একই সাথে কোষাগারের প্রধান আমির কর্তৃত্ব করতেন। এই দুই কর্মচারী একে অপরের কার্যাবলীর প্রতি সতর্ক নজর রাখতেন, "সি. এইচ. বেকার-এনসা. এস. ।। ১৩। এই প্রদেশিক শাসনকর্তাদের নাম পরে নাজিম এবং সুবাহদার রাখা হয়। আকবর সর্বপ্রথম তাঁর রাজত্বের ২৪ বৎসরের সময় (১৫৭৯ খ্রিঃ) সমস্ত সাম্রাজ্যকে ১২টি প্রদেশ বা সুবায় ভাগ করে প্রত্যেকটিতে একইরূপে কর্মচারী নিযুক্ত করেন।

তাদের মধ্যে কেহ হয়তো বিভেদের সৃষ্টি করতে পারে যার ফলে সময়োচিত কাজ করবার সুযোগ চলে যেতে পারে। তাঁর কর্তৃত্বের পদকে তিনি অভিভাকত্বের পদ বলে মনে করা উচিত ও সাবধানতা অবলম্বন করবেন এবং মানব চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানকে শাসনতন্ত্রের সঙ্গ বলে গণ্য করবেন এবং নিজের পদমর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করবেন। চপলতা ও ক্রোধকে তিনি যুক্তির দ্বারা বশে রাখবেন। বিদ্রোহী ভাবাপন্নদের তিনি কার্যাবলী পরিচালনায় ন্যায়পরায়নতার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এবং সৎ পরামর্শ দিয়ে সৎপথে চালিত করতে চেষ্টা করবেন ; অপারগ হলে তিনি দ্রুত তাদের তিরস্কার করে ভয় দেখিয়ে, কারারুদ্ধ করে, বেত্রদণ্ড দিয়ে বা অঙ্গহানি করে শাস্তি দিবেন কিন্তু জীবনের সূত্র ছিন্ন করবার পূর্বে তিনি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। বাজারের অকর্মণ্য কথাবাজ লোকদের মতো তিনি মন্দ কথা বলে মুখ নষ্ট করবেন না। কথাবার্তা বলবার সময় তিনি হলফ করবেন না, কারণ এরূপ করলে নিজের প্রতিই দোষারোপ করা হয় এবং তাতে শ্রোতার মনে তার প্রতি অবিশ্বাসের সঞ্চার হয়। বিচার কার্যের তদন্তের সময়, তিনি শুধু সাক্ষি ও হলফের উপরই আস্থা স্থাপন করবেন না। অনুসন্ধান এবং চেহারা পর্যবেক্ষণ ও অন্তদৃষ্টির ব্যবহার দ্বারা সত্যাসত্য বিচার করবেন; আবার এই দায়িত্ব অন্যের উপর দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত বসে থাকবেন না।

সাবধান হও, যাতে ন্যায় বিচারের ভার তাঁরই উপর না বর্তায় যাঁর অন্যায় কাজ বিচার প্রার্থীর ক্ষতি সাধন করেছে। তিনি যেন বিচার প্রার্থীদের আশা করে থাকবার যাতনা না দেন। দোষের প্রতি চক্ষু বন্ধ করে তিনি যেন কৈফিয়ৎ গ্রহণ করেন এবং এমন আচরণ করবেন যাতে তাঁর উচ্চ বংশজাত সুনাম ও মর্যাদার হানি না হয়। কারও ধর্মবিশ্বাস হস্তক্ষেপ করা তাঁর পক্ষে উচিত নহে। জ্ঞানী লোকেরা সাময়িক পার্থিব ব্যাপারে নিজের ক্ষতি সাধন করতে চায় না। তবে কেন সে জ্ঞানত চিরস্থায়ী আধ্যাত্মিক জীবন ত্যাগ করবে, তার হস্তক্ষেপ করা অপরাধ এবং যদি তা অজ্ঞানতার রোগ হয় তবে দয়াশীল ব্যবহারেরই যোগ্য। রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে তিনি যেন উদ্যমশীল ন্যায়পরায়ণ লোক নিযুক্ত করেন এবং বিশ্বাসী–পাহারাদার নিযুক্ত করে পথঘাটের নিরাপত্তা বিধান করেন এবং তাদের নিকট হতে নিয়মিত সংবাদ নেন। গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি যেন সৎ, বিচক্ষণ, সত্যবাদী ও নির্লোভী লোক নিযুক্ত করেন। তবে যদি এইসব গুণাবলী সম্পন্ন লোক না পাওয়া গেলে তিনি যেন প্রত্যেক কাজের জন্য পরস্পরের সহিত অপরিচিত কয়েকজনকে নিয়োগ করেন এবং তাঁদের বিভিন্ন রিপোর্ট পরিদর্শন করে সত্য নির্ণয় করেন। তাঁর ব্যয় যেন তাঁর আয়ের চেয়ে কম হয় এবং তাঁর কোষাগার হতে তিনি দরিদ্রকে সাহায্য করেন বিশেষত যাঁরা মুখ ফুটে নিবেদন করতে পারেনা। কখনও যেন তিনি সেনাবাহিনীর রসদ ও সাজসজ্জা সম্বন্ধে অবহেলা না করেন। তিনি যেন অশ্ব চালনা অভ্যাস করা হতে বিরত না হন এবং যেন তীর ধনুক ও বন্দুক ব্যবহার করেন ও তাঁর লোকজনদেরও যেন এইরূপ অনুশীলন করতে নির্দেশ দেন। তার নিজের পরিচর্যায় লোক নিযুক্ত করবার সময় এবং লোকের প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি করবার সময় যেন তিনি সবদিক উত্তমরূপে বিবেচনা করে দেখেন। এমন বহু বদস্বভাবের ও উচ্ছৃঙ্খল লোক আছে যারা আন্তরিকতা প্রদান করে এবং নিজেদের অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে। কৃষির উন্নতি এবং ভূমির উৎকৃষ্ট সাধনের প্রতি তাঁর বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত এবং এইরূপে বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব সম্পাদন করে জনগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হন এবং

কৃষকদের বন্ধুত্ব লাভকে যেন তিনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে মনে করেন। তাঁর উচিত রাজস্ব আদায়ের জন্য নিরপেক্ষ আদায়কারী নিয়োগ করা এবং সময় সময় তাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে সংবাদ নেওয়া। তিনি যেন পুকুর ও কূপ খনন করে, খাল কেটে, বাগান তৈরি করে সরাই নির্মাণ ও অন্যান্য সৎকাজ করে এবং যা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তার সংস্কার সাধন করে নিজের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করেন। তিনি অবসর জীবন যাপন করবেন না বা সন্ন্যাসীদের মতো মানসিক অস্থিরতায় ভুগবেন না বা সাধারণ লোকের সাথে সর্বদা মেলামেশা করবেন না, বা কখনও জনতা দ্বারা ঘেরাও হবেন না, কারণ যারা স্বভাব ও বাহ্যিক চেহারায় অন্ধ ভক্ত তারাই এরূপ করে।

পৃথিবীকে অতিরিক্ত ভালবেসো না বা একে সম্পূর্ণ ত্যাগও কর না

বিজ্ঞের মতো বিচরণ কর, রূপকথার পাখিও হইও না আবার মাছিও হয়ও না।

আল্লাহর প্রিয়পাত্রগণকে তিনি সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং আধ্যাত্মিক যশ সংসার ত্যাগীগণও আলুথালু চুল ও খালি পায়ালা সন্ন্যাসীদের যেন তিনি বিনীতভাবে তাদের সহায়তা পাওয়ার চেষ্টা করেন। সূর্য হতে বা সূর্য প্রদীপ হতে আশীর্বাদ প্রার্থনা করাকে যেন তিনি অগ্নিপূজা মনে না করেন।[৫৪] তিনি যেন রাত্রিতে চৌকি দেওয়া অভ্যাস করেন এবং পরিমিত আহার ও নিদ্রা অভ্যাস করেন। তিনি যেন সকাল সন্ধ্যা ধ্যান করেন এবং দুপুর ও মধ্যরাত্রিতে এবাদত করেন। পার্থিব কার্য হতে অবসর যাপনের সময় এবং যদি তার মন তুষ্ট না হয় তা হলে তিনি যেন মসনভীর (জালালুদ্দীন রুমীর) আধ্যাত্মিক অনুশাসন অধ্যয়ন করেন এবং শব্দার্থ ভুলে এর তাৎপর্য গ্রহণ করেন। তিনি যেন কালিলা ও দখনার উপদেশমূলক গল্পগুলি হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং এইভাবে জীবনের উত্থান পতনের সম্বন্ধে অবহিত হন এবং প্রাচীন পণ্ডিতদের অভিজ্ঞতাকে নিজের বলে মনে করে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি যেন সত্যিকার জ্ঞান আহরণের সাধনা করেন এবং ছেলেভুলানো গল্প পরিহার করেন। তিনি যেন একজন সুবিবেচক ও বিশ্বাসী বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশা করেন এবং তাকে তাঁর নিজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি সযত্নে পর্যবেক্ষণ করেন যাতে তাঁর বিবেচনায় এর কোন দোষ দেখা গেলে তিনি যেন একে গোপনে তাহা এর গোচরে আনয়ন করেন এবং যদি কখনও তার পর্যবেক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ হয় তা হলে তিনি যেন অসন্তুষ্ট না হন কারণ মানুষ চিরকালই অপ্রিয় সত্যভাষণে অনগ্রসর বিশেষত যখন ক্রোধের সময় হয় তখন যুক্তি তলিয়ে যায় এবং চেতনা অগ্নিকার্য হয়ে উঠে। সভাসদগণ বেশি ভাগই এড়িয়ে যাবার ছল খুঁজে এবং ভুলের উপর মিথ্যা রং চড়ায় এবং যদি কখনও এদের একজন সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়। তবে তিনি ভয়ে চুপ করে থাকেন। কারণ এমন লোক পাওয়া দুষ্কর যে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও অন্যের উপকার করে। নিন্দাকারীদের অপবাদে যেন তিনি ক্রোধান্বিত না হন, তিনি যেন সাবধানতার পথ অবলম্বন করেন কারণ দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা কথায় কপটতা করে এবং তাদের গল্পে সামান্য সত্য মিশিয়ে দেয় এবং নিজেদের নিঃস্বার্থপর প্রমাণ করে অন্যের ক্ষতি

---

৫৪. প্রথম খণ্ডের অনুবাদ দেখুন।

সাধন করে। তিনি যেন নিজেকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত না করেন, সর্বদা দরবারে হাজির হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন। তিনি যেন পরশ্রীকাতর না হন, বিনীত ও ভদ্র ব্যবহার করেন। প্রাচীন পরিবারগুলিকে যেন তিনি ক্ষতি সাধনের চেষ্টা না করেন, যেন বংশ গৌরব পরবর্তী অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের উন্নত করতে সাহায্য করে তাঁর চেষ্টা করেন। তিনি যেন লক্ষ্য রাখেন যে তার অনুগামীদের মধ্যে সাক্ষাৎ হ'লে বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তি যেন অভিবাদন করে, "আল্লাহু আকবর[৫৫] 'আল্লাহই মহান' এবং বয়োজেষ্ঠ জবাব দেন জাল্লাজালালুহু, সম্রাট মহৎ'। তিনি যেন এক বৎসরের কম বয়স্ক ভেড়া ও ছাগল ভক্ষণ না করেন এবং তার উচিত তার বাৎসরিক জন্মদিনের পর একমাস কোন মাংস আহার না করা। নিজে যা হত্যা করেছেন তাহা যেন তিনি ভক্ষণ না করেন। আসক্ত লিপ্সায় যেন তিনি মিতাচারী হন এবং গর্ভবতী মহিলাদের সহিত সঙ্গম না করেন। মৃত্যুর পর স্মৃতিতে যে খাদ্য পরিবেশন করা হয় তা যেন তিনি প্রতি বৎসর তার জন্মদিনে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করেন।

কবরকে স্বর্গীয় সম্পদে পূর্ণ কর
জীবিতকালেই তা সংগ্রহ কর, মরে গেলে কেউই কিছু করবে না।

(গুলিস্তান)

সূর্য যখন রাশিচক্রের এক গৃহ হতে অপর গৃহে গমন করে তখন যেন তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তোপধ্বনি করে ও বন্দুক ছুঁড়ে ভুলের নিদ্রায় নিমগ্নদের জাগরিত করেন। পৃথিবী সমুজ্জ্বলকারী চন্দ্রের প্রথম আলোকপাতের সময় এবং মধ্যরাত্রিতে যখন এর পুনরুত্থাপনের পথে ফিরে আসে তখন যেন তিনি ঢাক বাজিয়ে সকলকে সচেতন করবার ব্যবস্থা করেন।

---

৫৫. আল্লাহ আকবর এই কথাটি একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রকাশের সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত কথা। এটা মুসলমানদের জীবনে বিভিন্ন পরিবেশে ব্যবহৃত হয় যেখানে আল্লাহর মহত্ব ও সার্বভৌমত্ব বুঝাতে হয় সেরূপ স্থলে। দৈনিক নামাজের আহ্বান করতেও এর ব্যবহার করা হয়। হজ্বের সময় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)! সব সময় এই তকবীর উচ্চারণ করতেন। সম্রাট আকবর প্রচলিত সালাম আলাইকুমের পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে অভিবাদনের সময় আল্লাহ আকবর প্রচলনের চেষ্টা করেন। এতে অশিক্ষিত লোকেরা মনে করে যে তিনি বুঝি আল্লাহ'র স্থান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন। এই ভুল ব্যাখ্যায় আবুল ফজল অত্যন্ত বেদনা বোধ করেন। তিনি আকবরনামায় তৃতীয় খণ্ড ৩৯৭ পৃ. এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

আইন-২

ফৌজদার[৫৬]

সম্রাট যেরূপ সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক প্রদেশে সেনাবাহিনীর একজন সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছেন তেমনিভাবে তিনি তাঁর বিচারবুদ্ধি এবং জ্ঞানবত্তা দ্বারা তাঁর একজন বিশ্বাসী ন্যায়পরায়ণ ও নিঃস্বার্থ এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অনুচরকে কয়েকটি পরগণার দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তাকে উপরোক্ত নাম দেওয়া হয়। অধীনস্থ ও সাহায্যকারী হিসেবে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, যদি কোনো ভূস্বামী বা বন্ধকীয় ভূমিকা কোনো রাজস্ব আদায়কারী বা সরকারি ভূমির জায়গীরদার বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হয়, তিনি ভাল কথা বলে তাকে সৎপথে রাখতে চেষ্টা করবেন কিন্তু বিফল হলে তিনি প্রধান কর্মচারীদের লিখিত সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন এবং তৎপর তাকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হবেন। তিনি বিদ্রোহীর নিকটস্থ স্থানে শিবির স্থাপন করবেন এবং প্রত্যেক সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের শরীর ও সম্পদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবেন কিন্তু সহসা কোনো সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হবেন না। যদি পদাতিক বাহিনী দ্বারা ব্যাপারটার সমাধা করা যায় তবে যেন তিনি অশ্বারোহী সেনা নিয়োগ না করেন। কোনো আক্রমণ করতে তিনি যেন দুঃসাহসের বশবর্তী না হন। এ ছাড়াও বন্দুকের পাল্লার বাইরে শিবির স্থাপন করে পথঘাট বন্ধ করে দেন। রাত্রিতে অতর্কিতে আক্রমণের বিরুদ্ধে যেন তিনি হুশিয়ার থাকেন এবং পশ্চাদপসারণের স্থান ঠিক করে রাখেন এবং সর্বদা ভ্রমণ-পাহারা নিযুক্ত রাখেন। তিনি শত্রু শিবির তাঁর দখলে এলে ভাগ-বাটোয়ারায় যেন তিনি পক্ষপাত শূন্য হন এবং এক পঞ্চমাংশ রাজকীয় কোষাগারের জন্য সংরক্ষণ করেন। যদি সেই গ্রামের রাজস্ব বাকি পড়ে থাকে, সর্বপ্রথম তার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি যেন সর্বদা অশ্ব ও সেনাবাহিনীর সাজসজ্জা পরিদর্শন করেন। যদি কোনো অশ্বারোহীর অশ্ব না থাকে, তার সহকর্মীগণ তাকে সাহায্য করতে পারে কিনা তা দেখতে হবে। আর যদি অশ্ব যুদ্ধে নিহত হয়ে থাকে তবে রাষ্ট্রের খরচে তাকে অশ্ব সংগ্রহ করে দিতে হবে। তিনি উপস্থিত-অনুপস্থিত সমস্ত সৈন্যের তালিকা সম্রাটের দরবারে নিয়মিত প্রেরণ করবেন এবং সর্বদা সম্রাটের পবিত্র বিধিসমূহ পালনের কর্তব্য মনে রাখবেন।

---

৫৬. ফৌজদারের দায়িত্ব অনেকটা বর্তমান ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সাহেবের মোট দায়িত্বের অনুরূপ কিন্তু কালেক্টরের নয়।

আইন-৩

মীর আদল এবং কাজী[৫৭]

যদিও সর্বময় ক্ষমতা এবং অন্যায়ের বিচারের অধিকার সার্বভৌম সম্রাটের তবু একজন লোকের পক্ষে সমস্ত শাসনতন্ত্র তত্ত্বাবধান করা সম্ভবপর নয়। ফলে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে তিনি তাঁর একজন সুবিবেচক ও নিরপেক্ষ কর্মচারীকে বিচার কার্যের প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ ও হলফ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন না। বরং অত্যন্ত যত্ন ও শ্রম সহকারে খুব ভালরূপে তদন্ত করবেন। কারণ বিচার প্রার্থীগণ জানে যে অনুসন্ধানকারী কোনো সংবাদ রাখে না। সম্পূর্ণরূপ তদন্ত না করে এবং ন্যায়পরায়ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ না করে সঠিক বিচার করা দুঃসাধ্য। মানব স্বভাবের অতিরিক্ত নীতিভ্রষ্টতা ও লোভের ফলে কোনো সাক্ষির না তার শপথের উপর আদৌও নির্ভর করা যায় না। নিরপেক্ষতা এবং চরিত্রের জ্ঞান দ্বারা তিনি অত্যাচারী ও অত্যাচারীতকে ছিনিয়ে নেবেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসার পর সাহসিকতার সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রথমে খুব ভালরূপ জেরা করে তার সম্পূর্ণ ঘটনা জেনে নেওয়া উচিত এবং কোন পরিবেশের সহিত কোনটা খাপ খায় তা মনে রাখবেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ জেরা করবেন এবং এইরূপে স্বতন্ত্র প্রত্যেক সাক্ষির সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি যখন জ্ঞান, সুবিবেচনা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা কার্যসম্পন্ন করেন তখন কিছুকালের জন্য তিনি অন্য কাজে মনোনিবেশ করেন এবং এ সম্বন্ধে কাকেও কিছু না বলেন। অতঃপর যেন তিনি মামলাটির পুনরায় নতুনভাবে তদন্ত করেন এবং বিচার–বুদ্ধি দ্বারা লক্ষ্য স্থির করে এর মূল আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। যদি একজনের মধ্যে ক্ষমতা ও উদ্যম না থাকে তবে তিনি যেন দুইজন লোককে নিযুক্ত করেন যাকে বলে কাজী। আর অপরজন মীর আদল। তার বিচারের ফল কার্যে পরিণত করবেন।

---

৫৭. কাজী সম্বন্ধে যদুনাথ সরকারের মুঘল শাসন দ্রঃ।

আইন-৪

কোতায়াল[৫৮]

এই পদের জন্য উপযুক্ত লোক উদ্যমশীল, অভিজ্ঞ, কর্মঠ, চিন্তাশীল, সহিষ্ণু, তীক্ষ্মবুদ্ধি ও দয়ালু হ'বে। তার সতর্কতা ও রাত্রিতে চৌকি দেওয়ার ফলে নাগরিকগণ নিরাপত্তা ভোগ করবে এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা আত্মগোপন করবে। তিনি নাগরিকগণকে পরস্পরের সাহায্য করতে অঙ্গীকার করাবেন এবং তাদের ভালমন্দের একসূত্রে গ্রথিত করবেন। কতিপয় এলাকা নিয়ে তিনি তার একটি কেন্দ্র স্থাপন করবেন এবং তার একজন চতুর কর্মচারীকে তার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করবেন এবং সেখানে দৈনিক কে কে আসা-যাওয়া করে এবং যে সব ঘটনা ঘটে তার রিপোর্ট নেবেন। তিনি ঐ কর্মচারীর অপরচিত একজন অজ্ঞাত লোককে চর নিযুক্ত করবেন এবং তাদের সংবাদ লিখে রাখবেন এবং তার পর্যালোচনা করে দেখবেন। তিনি একটা স্বতন্ত্র সরাইখানা তৈরি করবেন যেখানে অপরিচিত আগন্তুকগণকে এনে বিভিন্ন গুপ্তচরের সাহায্যে তাদের সংবাদ নেবেন। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের আয় ও ব্যয়ের উপর অতি সতর্ক নজর রাখবেন এবং মিষ্টি কথা বলে তার সতর্কতা যেন তার শাসনকে সম্মানিত করে তার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেক শ্রেণীর কারিগরদের মধ্যে একজনকে তিনি সেই শ্রেণীর নেতা এবং আর একজনকে দালাল নির্বাচন করবেন এবং তাদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন হবে। এদের নিকট হতেও তিনি প্রায়ই রিপোর্ট নেবেন। রাস্তাঘাটের খোলা জায়গাগুলির প্রতি নজর রাখবেন। রাত্রি খানিকটা গভীর হলে তিনি নগরে লোকের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ বন্ধ করে দেবেন। বেকারদের তিনি কাজে নিয়োগ করবেন। তিনি পূর্ব অসন্তোষ দূর করবেন এবং অন্যের গৃহে বলপূর্বক প্রবেশ নিষিদ্ধ করবেন। তিনি চোরকে খুঁজে বের করবেন এবং চোরাই মাল উদ্ধার করবেন। নতুবা ক্ষতির জন্য দায়ী হবেন। তিনি এরূপ নির্দেশ জারি করবেন যাতে কেহ অস্ত্রশস্ত্র, হাতি, ঘোড়া, উট, ভেড়া,ছাগল এবং পণ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কোনো কিছুর উপর কোনোরূপ শুল্ক দাবি না করে। প্রত্যেক সুবায় কোনো নির্দিষ্ট স্থানে যৎসামান্য আমদানী শুল্ক ধার্য করবেন। পুরাতন মুদ্রা গলাতে দিয়ে তা ধাতুরূপে কোষাগারে মূল্যের যা'তে কোনরূপ হেরফের না হয় তা দেখবেন এবং ব্যবহারের ফলে তা ক্ষয়পাত্র হতে তিনি ক্ষয়ের পরিমাণ ধাতু আদায় করবেন। মূল্য কমানোর সময় তিনি তার সুবিবেচনা প্রয়োগ করবেন এবং নগরের বাইরে প্রবেশ অনুমতি দেবেন না। ধনীগণ তাদের ব্যবহারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিনতে পারবেন না। তিনি ওজন পরীক্ষা করবেন

---

৫৮. মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে বাজার তদন্তের ভার প্রায়ই মুহতারিখদের হস্তে অর্পণ করা হত।

এবং সের যেন ৩. দামের কমবেশি না হয় তা দেখবেন। নিম্নে বর্ণিত গজের কোনরূপ হ্রাসবৃদ্ধি তিনি হ'তে দেবেন না এবং তিনি সুরা তৈরি করা, সরবরাহ করা, ক্রয় ও বিক্রয় করা হতে সকলকে নিবৃত্ত করবেন, কিন্তু কখনও গৃহ জীবনের গোপন ব্যয় হস্তক্ষেপ করবেন না। উত্তরাধিকারী বিহীন মৃত ব্যক্তির বা হারান ব্যক্তির সম্পত্তির তিনি একটা বিবরণের তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং সে সম্পত্তি তার তত্ত্বাবধানে রাখবেন। তিনি নারী ও পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র ফেরী ও কুয়ার ব্যবস্থা করবেন।

সর্বসাধারণের জলপথের জন্য তিনি সৎ চরিত্রের লোক নিযুক্ত করবেন এবং মহিলাদের ঘোড়ায় চড়া নিষিদ্ধ করবেন। তিনি নির্দেশ দেবেন যাতে কোনো ষাঁড় বা মহিষ বা অশ্ব বা উট জবেহ না করা হয় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা ও দাস বিক্রয় নিষিদ্ধ করবেন। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো মহিলাকে যেন পোড়ান না হয় এবং মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য এমন অপরাধীকে যেন খুঁটিয়ে বন্ধ না করা হয় এবং দ্বাদশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কাকেও যেন মুসলমানী না করান হয় তা দেখবেন। এর উর্ধ্ব বয়স্কদের বেলায় অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। ধর্মে অতি উৎসাহী অসাধু ব্যবসায়ীগণকে তিনি বহিস্কার করে দেবেন অথবা তাদের কার্যাবলী হতে বিরত রাখবেন কিন্তু সাবধান হতে হবে যেন ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসীকে অপদস্থ না করেন বা নগ্নপদ ভ্রমণকারী ফকিরদের উপর অত্যাচার না করেন। কসাই, পশুশিকারী, মৃতদেহ ধৌতকারী, ঝাড়ুদারের জন্য তিনি স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্বাচিত করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন যাতে এইসব পাষাণ হৃদয় বিষণ্ন চেহারার লোকদের সহিত সাধারণ লোকেরা মেলামেশা করা হতে বিরত থাকে। কোনো হত্যাকারীর কাজের সঙ্গীর তিনি হস্তচ্ছেদন করবেন। তিনি কবরখানা নগরের বাইরে পশ্চিমদিকে স্থাপন করবেন। তার অনুচরগণ যাতে শোকচিহ্ন ধারক গম্ভীর পোশাক না পরেন তিনি তা দেখবেন এবং তাদের লাল পোশাক পরতে উৎসাহিত করবেন। ফরওয়ার দিন মাসের প্রথম হ'তে উনিশ তারিখ পর্যন্ত। সমস্ত সাবান মাস, রাশিচক্রের এক গৃহ হতে সূর্যের অপর গৃহে গমনের সময় অর্থাৎ প্রত্যেক সৌর মাসের প্রথম দিন, ষোড়শ দিন। ইলাহী উৎসবের দিনসমূহ, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের দিন। সপ্তাহের প্রথমদিন কোনরূপ প্রাণীবধ তিনি নিষিদ্ধ করবেন তবে শুধুমাত্র শিকারী প্রাণীদের আহার ও রুগ্ন ব্যক্তির আহারের জন্য প্রয়োজন মতো অনুমতি দেবেন। তিনি বধ্যভূমি নগরের বাইরে স্থানান্তরিত করবেন এবং যাতে ইলাহী উৎসবগুলি পালিত হয় সেদিকে নজর রাখবেন। নওরোজের রাত্রিতে (নববর্ষের রাত্রে) এবং ১৯ ফরওয়ার দিন তিনি প্রদীপ জ্বালবেন। কোনো উৎসবের প্রাক্কালে এবং উৎসবের সময় তিনি প্রতি মাসে ঢাক বাজানোর বন্দোবস্ত করবেন। পারসিক ও হিন্দু পঞ্জিকায় যাতে ইলাহী সাম্বৎসর ব্যবহার করা হয় তিনি তার ব্যবস্থা করবেন এবং হিন্দু নামানুসারে শুক্লপক্ষে মাসের শুরু করবেন।

আইন-৫

আমলগুজার বা রাজস্ব আদায়কারী

কৃষকদের বন্ধু হবেন। উদ্যম ও সত্যবাদিতা তার মূলমন্ত্র হবে। তিনি নিজেকে সার্বভৌম অধিপতির প্রতিনিধিজ্ঞান এবং এমন স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন যাতে কোনরূপ অন্তবর্তী লোকের সাহায্য ছাড়াই প্রত্যেকে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। অবাধ্য ও অসাধু লোকদের তিনি তিরস্কার করবেন কিন্তু তাতে ফল না হলে শাস্তি দিতে অগ্রসর হবেন।

শক্তি দেখে যেন তিনি উদ্বিগ্ন না হন। তিনি কখনও রাস্তাঘাটের ডাকাতদের খুনিদের ও দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি দিতে বিরত হবেন না বা অতিরিক্ত অর্থদণ্ড আদায় করতে দ্বিধা করবেন না এবং এমনভাবে শাসন করবেন যাতে অভিযোগের ক্রন্দন বন্ধ হয়ে যায়। দরিদ্র কৃষকদের তিনি অর্থ কর্য দিয়ে সাহায্য করবেন এবং ক্রমশ তা আদায় করে নিবেন। আর যখন গ্রাম প্রধানের চেষ্টার ফলে সমস্ত রাজস্ব আদায় হয়ে যায় তখন তিনি তাকে তার কার্যের উপযুক্ত অন্য পুরস্কার দিবেন। তিনি কষ্টিত ভূমির পরিমাণ নির্ণয় করবেন এবং ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মাপকাঠিতে ভিন্ন ভিন্ন জমির প্রতিটির উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে অবহিত হবেন। বিভিন্ন জেলায় জমির ফসলের পরিমাণ বিভিন্ন রূপ হয় এবং বিশেষ বিশেষ ভূমি বিশেষ বিশেষ ফসলের উপযোগী। ফলে[৫৯] তিনি প্রত্যেক কৃষকের সহিত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করবেন এবং তার অবস্থা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করবেন। পূর্বের রাজস্ব আদায়কারীরে ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি বিবেচনা করে দেখবেন এবং অজ্ঞানতা বা অসাধুতার পরিণাম সংশোধন করে নেবেন। অনাবাদী ভূমির তিনি আবাদ করাতে চেষ্টা করবেন এবং আবাদী ভূমি যাতে অনাবাদী হ'য়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। তিনি মূল্যবান ফসলের চাষ বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করবেন এবং এ জন্য প্রয়োজন মতো রাজস্বের হার কিছু হ্রাসও করতে পারেন। কৃষক যদি কম আবাদ করে এবং নানারূপ কৈফিয়ৎ দেয়, তিনি যেন তা গ্রহণ না করেন ; কোনো গ্রামে যদি পতিত জমি না থাকে অথচ সেখানের কোনো কৃষক অতিরিক্ত জমি আবাদে সক্ষম হয় তবে তিনি অন্য কোনো গ্রামে তাকে ভূমি বরাদ্দ করবেন।

ওজন দেবার সময় তিনি ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ হবেন। তিনি যেন প্রতিবৎসর কৃষকদের সুযোগ–সুবিধা বৃদ্ধি করেন এবং তার চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী আবাদী ভূমির মোট পরিমাণের উর্ধ্বে কোনো কিছু আদায় না করেন। যদি কেহ মাপজোক করে এবং কেউ ফসলের আন্দাজ করে চুক্তি করতে চায় তবে তিনি যেন সকল কাগজপত্রসহ চুক্তিপত্রসহ

---

৫৯. এক বিঘার বিশ ভাগের ভাগ।

চুক্তিপত্র সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি যেন শুধু অর্থই গ্রহণ না করেন, ফসলও যেন আদায় করেন। শেষটা কয়েক প্রকারেই করা যায়। প্রথম, কানকুত, হিন্দিভাষায় কান অর্থ ফসল আর কুত আন্দাজ। সমস্ত ভূমি হয় প্রকৃতপক্ষে মাপজোক করা হয় নতুবা পায়ে হেঁটে মাপা হয় এবং উৎপন্ন ফসল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতায় আন্দাজ করে নেয়া হয়। এই কার্যে অভিজ্ঞগণ বলেন যে এটা প্রকৃত মাপের কিছু কম হয়। যদি কোনোরূপ সন্দেহ হয় তবে ফসল কেটে সবচেয়ে ভাল, মাঝামাঝি ও সবচেয়ে খারাপ, এই তিন ভাগে ভাগ করে আন্দাজ করতে হবে এবং সন্দেহ দূর করে নিতে হবে। পর্যবেক্ষণ দ্বারা ভূমির পরিমাণ আন্দাজ করলে প্রায়ই তা সঠিক হয়। দ্বিতীয়ত বাতাই, ইহাকে ভাওলীও বলা হয়। এতে ফসল কেটে গাদা করা হয় এবং উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে আপোষে বণ্টন করা হয় কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় কয়েকজন সুচতুর পরিদর্শকের প্রয়োজন হয়। নতুবা দুষ্ট প্রকৃতির ও অসাধু লোকেরা ঠকাতে চেষ্টা করে। তৃতীয়ত ক্ষেত বাতাই তাতে বপনের পর জমি ভাগ করে নেওয়া হয়। চতুর্থত লাং বাতাই ; তাতে ফসল কেটে গাদা করা হয় এবং আপোষে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে যার যার অংশ সে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং তা ঝেড়ে বেছে লাভবান হয়। কৃষকের যদি কোনো ক্ষতির কারণ না হয় তবে তিনি ফসলসহ জমির বাজার দরে মূল্য নগদ মুদ্রায় গ্রহণ করতে পারেন। যদি এই জমিতে প্রথম বৎসরেই সর্বোত্তম ফসল ফলান হয়ে থাকে তবে প্রচলিত রাজস্বের এক চতুর্থাংশ মাপ করে দেওয়া যেতে পারে। রাজস্ব আদায়ের সময় যদি দেখা যায় যে ভাল ফসল যদি পূর্ববর্তী বৎসরের চেয়ে অধিক পরিমাণ উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু কম জমি চাষ করা হয়েছে এবং যদি রাজস্বের পরিমাণ সমানই হয় তা হলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না বা ঝগড়া করবেন না। সর্বদা তিনি ফসলের মালিককে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবেন। ফসলের পরিমাপ করবার কাজ যেন তিনি গ্রাম প্রধানের উপর অর্পণ না করেন। এতে শিথিলতা ও অযোগ্যতা দেখা দেবার এবং উদ্ধত অত্যাচারীদের হস্তে অসঙ্গত ক্ষমতা অর্পণের সম্ভাবনা থাকে। তিনি স্বয়ং প্রত্যেক কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তার দাবি পেশ করবেন এবং আলাদাভাবে ও ভদ্র ব্যবহার দ্বারা তার প্রাপ্য আদায় করবেন। তিনি ভূমির জরিপকারী, পরিমাণ নির্ধারণকারী ও অন্যান্য রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় কর্মচারীদের নিকট হতে অবশ্যই জামানত গ্রহণ করবেন। জমির জরিপের কার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের তিনি তাদের কার্যে নিযুক্ত থাকবার প্রতিদিনের জন্য ১৬ দাম ৩১ সের হিসেবে দেবেন এবং তাদের নিম্নলিখিত হারে মাসিক খাদ্য সরবরাহ করবেন।

	ময়দা	তৈল	শস্য	তরকারী
	সের	সের	সের	ইত্যাদি দাম
জরিপের তত্ত্বাবধায়ক	৫	১/২	৭	৪
লেখক	৪	১/২	৪	৪
জমি জরিপকারী ও চারজন থান্যারদারের প্রত্যেক	৮	১	৫	৫

যে ভূমি জরিপ করা হয়ে গেছে তাতে তিনি চিহ্ন দিয়ে রাখবেন এবং গ্রামপ্রধানের নিকট হতে মুচলেকা গ্রহণ করবেন যেন কোনো ভূমি গোপন করা না হয় এবং বিভিন্ন ফসল ঠিকমতো রিপোর্ট করা হয়। জরিপের সময় যদি কোনো নিকৃষ্টতর ভূমি নজরে পড়ে তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তার পরিমাণ নির্ণয় করবেন এবং দিন দিন এর শ্রেণী লিপিবদ্ধ করবেন এবং এই প্রমাণপত্র তিনি কৃষককে দেবেন। কিন্তু যদি রাজস্ব আদায়ের পর এই ব্যাপার নজরে পরে তবে তিনি প্রতিবেশীদের নিকট খোঁজখবর নেবেন এবং বেসরকারী দলিলপত্র দেখে এই সম্বন্ধে একটা মোটামুটি হিসেব করবেন। কারফুল (রাজস্ব আদায়ের তালিকা প্রস্তুতকারী) যে রূপে রাজস্ব আদান-প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপার লিপিবদ্ধ করে রাখে, সেরূপে মুকাদ্দমা[৬০] (গ্রামের প্রধান রাজস্ব কর্মচারী) এবং পাটওয়ারী ও তাদের হিসেব রক্ষা করবে। আমলগুজার (রাজস্ব আদায়কারী) এইসব দলিল মিলিয়ে দেখবেন এবং এগুলিকে তার সীলমোহর করে রাখবেন এবং একটা নকল কেরানীকে দেবেন। গ্রামের রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণের কাজ যখন সম্পূর্ণ হয় তিনি তখন তা গ্রামের হিসাবের সংক্ষিপ্ত তালিকায় তা লিপিদ্ধ করবেন এবং পুনরায় এটা মিলিয়ে দেওয়া কারফুল ও পাটওয়ারী সাথে এর নির্ভরযোগ্যতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়ে প্রতি সপ্তাহে এটা সম্রাটের নিকট পাঠাবেন এবং কখনও এটা যেন ১৫ দিনের বেশি বিলম্ব না হয় তা দেখবেন। রাজস্বের খসড়া সম্রাটের দরবারে পাঠানোর পর যদি কোন দৈব দুর্বিপাকে ফসলের ক্ষতি হয় তবে ঘটনাস্থলে প্রত্যক্ষ তদন্ত দ্বারা বিবরণ সংগ্রহ করে তিনি ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করবেন এবং তা লিপিবদ্ধ করে দরবারে প্রেরণ করবেন যাতে এটা অনুমোদিত হয় অথবা তদন্তকারী প্রেরণ করা হয়। তিনি আশেপাশে রাজস্ব আদায় করবেন এবং অন্যান্য দাবির হাত প্রসারিত করবেন না। বসন্তকালের ফসলের রাজস্ব আদায় তিনি হোলির সময় শুরু করবেন। সূর্য যখন কুম্ভরাশি হতে মীনরাশিতে প্রবেশ করে অথবা মীনারাশির মাঝামাঝি স্থানে উপস্থিত হয় তখন হিন্দুদের এই হোলি উৎসব করা হয়। আর শরৎকালীন ফসলের রাজস্ব আদায় দশয়ার সময় হতে আরম্ভ করবেন। এই উৎসব সূর্য যখন কন্যা রাশির মাঝামাঝি অবস্থায় বা শেষদিকে থাকে অথবা তুলা রাশির প্রথম দশদিনের মধ্যে থাকে তখন সম্পন্ন করা হয়। তিনি নজর রাখবেন যাতে কোষাধ্যক্ষ কোনো বিশেষ ধরনের[৬১] মুদ্রা দাবি না করে এবং প্রচলিত ওজনের ও প্রামাণিক মুদ্রার সবই গ্রহণ করেন, যাহা ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। বর্তমান মুদ্রায় তার মূল্য আদায় করে তার রশিদে লিখে দেবেন। তিনি যেন শর্ত আরোপ করেন যাতে কৃষক স্বয়ং কোনো নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা নিয়ে আসেন যাতে নিচমনা দালালদের অন্যায় কাজ বন্ধ করা যায়। যখন উৎপন্ন হয় তখন তিনি সম্পূর্ণ খাজনা আদায় করবেন, ভবিষ্যতের উৎপন্ন ফসল হতে আদায়ের জন্য কোনো অংশ বাকি রাখবেন না। খাজনা ধার্য হবার যোগ্য জমিতে যদি কেহ আবাদ না করে তা পশুচারণের জন্য ঘেড়াও করে, তবে আসনগুজার বাৎসরিক প্রতি মহিষের জন্য ছয় দাম, প্রতি ষাঁড়ের জন্য ৩ দাম হিসেবে আদায় করবেন কিন্তু বাছুরের জন্য, এবং যে মহিষের বাছুর হয় নাই তার জন্য

---

৬০. মুকাদ্দমের জন্য উইলসন দেখুন ৩৫১ পৃ.।

৬১ মূল পুস্তকের জায়-ই-খাম-এর অর্থ সম্রাটের প্রচলিত মুদ্রাও হতে পারে।

কোনো খাজনা আদায় করবেন না। হালের জন্য তিনি চারটি ষাঁড়, দুটি গাভী এবং একটি মহিষ বরাদ্দ করবেন এবং এদের জন্য কোনো শুল্ক আদায় করবেন না। কোষাগারে যে অর্থ জমা হয় তা তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করবেন, গণনা—করবেন এবং কারফুলের দৈনিক জমাখরচের খাতায় সাথে তা মিলিয়ে নেবেন। কোষাধ্যক্ষের হিসেবের সহিত ইহার মিল হওয়ার প্রমাণ হিসেবে এতে তিনি তার সাথে নেবেন এবং সীলমোহর করা থলির ভিতরে এটা রেখে দেবেন। অতঃপর এটা একটি সুরক্ষিত কক্ষে রেখে তার দরজায় বিভিন্ন রকমের অনেকগুলি তালা লাগাবেন তা বন্ধ করবেন। একটি চাবি নিজের নিকট রাখবেন এবং অপরটি কোষাধ্যক্ষের নিকট দেবেন। মাসের শেষে চিতি কচির নিকট হতে তিনি দৈনিক জমা–খরচের হিসেব নেবেন এবং তা সম্রাটের নিকট প্রেরণ করবেন। যখন দুই লক্ষ দাম সংগৃহীত হবে তখন তিনি তা বিশ্বাসী অনুচরের দ্বারা প্রেরণ করবেন। প্রত্যেক গ্রামের পাটোয়ারীকে তিনি যেন পরিষ্কার রূপ নির্দেশ দেন যাতে তিনি কৃষকদের যে চিঠি দেন তাতে যেন বিস্তারিতভাবে তার নিকট হতে গৃহীত অর্থের পরিমাণ লিখে দেন। যাহা কিছু বাকি থাকবে তা তিনি প্রতি নামের অধীনে একটা খাতায় লিখবেন এবং তাতে গ্রামপ্রধানের স্বাক্ষর নেবেন এবং পরবর্তী ফসলের সময় তিনি কোনরূপ যাতনা না দিয়ে আদায় করে নেবেন। তিনি সতর্কতার সহিত—ময়ূরখাল[৬২] ভূমের শর্তাবলী পরীক্ষা করে দেখবেন এবং তাদের নকল সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্য রেজিষ্ট্রি অফিসে প্রেরণ করবেন। তিনি চকনামার সত্যাসত্য যাচাই করে দেখবেন এবং যে প্রাপকের মৃত্যু হয়েছে বা যে প্রাপক অনুপস্থিত অথবা রাষ্ট্রের চাকুরিতে নিযুক্ত তার অংশ পুনর্দখল করবেন। তিনি লক্ষ্য রাখবেন যাতে কৃষক কর্তৃক স্বয়ং চাষ করা জমি প্রজার চাষের জমি নহে এবং পুনর্দখলিত জমি পতিত না হয়ে পড়ে। অনুপস্থিত লোকের এবং বেওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির সম্পদ তিনি তার তত্ত্বাবানে রাখবেন এবং অবস্থার বিবরণ লিখে রিপোর্ট করবেন। তিনি লক্ষ্য রাখবেন যেন কোনরূপ মাথা পিছু বার ধার্য না করা হয় বা পূর্ববর্তী সরকারসমূহ কর্তৃক মওকুফ করা রাজস্ব যেন পুনরায় দাবি করা না হয়।

ভ্রমণ, উৎসব বা লোক উপলক্ষের সুযোগ নিয়ে যেন তিনি কোনো কিছু জবরদস্তি করে আদায় না করেন এবং উপহার গ্রহণ করা হতে বিরত থাকেন। যখনই কোনো[৬৩] মুকাদ্দাম বা পাটওয়ারী অর্থ আনয়ন করবে বা তার সামনের নিকটে আসবার সময় বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ এক দাম উপহার দেব, তিনি তা গ্রহণ করবেন না। একইরূপে তিনি বলকতি প্রত্যাহার করবেন, এটা ফসল যখন কাটবার সময় হয় তখন প্রতিগ্রাম হতে সামান্য ফিস নেবার প্রথা। হস্তশিল্প, হাট–বাজার, পুলিশ, ভ্রমণের পাসপোর্ট, বাগানে উৎপন্ন জিনিসপত্র, সাময়িক গৃহ, ঘেরাও করা স্থান, মৎস ধরবার অধিকার, বন্দর শুল্ক, মাখন, তিলের তৈল, কল্পল তৈরি, চামড়া পশম, ইত্যাদির উপরে নিয়মিত করের উপরে আল্লাহকে ভয় করে না এমনি লোভী

---

৬২. দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রদত্ত ভূমি যার জন্য কোনো রাজস্ব দিতে হয় না বা কোনোরূপ চাকুরি শর্ত ছাড়াই দান করা ভূমি।

৬৩. এক খণ্ড নিষ্কর ভূমি যাতে স্বতন্ত্র রাখা হয়।

লোকদের দ্বারা ধার্যকৃত কর ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থা তিনি রহিত করবেন। এই জেলা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখে এমন ব্যক্তিদের মধ্য হতে সাময়িকভাবে নিযুক্ত করবার জন্য একজনকে বাছাই করবেন যিনি রাজকীয় দরবারে থেকে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সরবরাহ করতে পারে। প্রত্যেক মাসে তিনি প্রজাদের জায়গীরদারদের ও পার্শ্ববর্তী স্থানের অধিবাসীদের অবস্থা, বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ, বাজারদর, বিলিকৃত জমির বর্তমান খাজনার হার, দরিদ্রের অবস্থা, কারিগরদের অবস্থা ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যাপারের একটি বিবরণ পাঠাবেন। যদি কোনো কোতওয়াল না থাকে তবে আমলগুজার স্বয়ং ঐ পদের দায়িত্ব পালন করবেন।

আইন-৬

বিতিকচী[৬৪]

তিনি বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন, সুলেখক এবং একজন কুশলী হিসাবরক্ষক হবেন। আমলগুজারের জন্য তিনি অপরিহার্য। কানুনগোর[৬৫] নিকট হতে অর্থ ও ফসলে গড় দশমালা রাজস্বের অবস্থা গ্রহণ করা তারই দায়িত্ব এবং জেলার আচার ব্যবহার ও নিয়মকানুন সম্বন্ধে বুঝাবেন এবং তাকে বিশেষভাবে সহায়তা করলেও সম্পাদিত সব চুক্তি তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। গ্রামের সীমানা নির্দিষ্ট করবেন এবং আবাদী ও অনাবাদী ভূমির পরিমাণ নির্ণয় করবেন। তিনি মুন্সিফ,[৬৬] জাবিত বা তত্ত্বাবধায়ক, জমি জরিপকারী থানাদার আর তাছাড়া কৃষক ও গ্রামপ্রধান ইত্যাদির নাম লিখে রাখবেন এবং নিচে কি ফসল ফলান হয়েছে তাও লিখবেন। তাছাড়া গ্রামের নাম, পরগণার নাম এবং ফসলের নাম এবং ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিয়ে সম্পদের মূল্য অথবা গ্রামের লোকের আচরণ অনুযায়ী, নাম লিখবেন। উৎপন্ন ফসলের বপণের তারিখ ও ক্ষয়ক্ষতির হিসেব লিখবেন। গ্রামের জরিপকার্য যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তিনি প্রত্যেক কৃষকদের করের হার নির্ণয় করবেন এবং সমস্ত গ্রামে রাজস্ব নিরূপণ করবেন। তার উপর ভিত্তি করেই আমলগুজার রাজস্ব আদায় করবেন এবং জরিপের একটা নকল হিন্দিতে যাকে খসড়া বলে তা সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করবেন। খাজনার তালিকা প্রস্তুতের সময় পূর্বের দলিলপত্র না পাওয়া গেলে তিনি পাটওয়ারীর নিকট হতে লিখিতভাবে প্রত্যেক কৃষকের নাম ও তার উৎপন্ন ফসলের বিবরণ এবং এইরূপে তার কার্য সম্পাদন করবেন এবং এই তালিকা বাকি বকেয়া ও আদায়কৃত খাজনার পরিমাণসহ নির্দিষ্ট সময়মতো প্রেরণ করবেন এবং দৈনিক হিসেবের খাতায় প্রত্যেক গ্রামের নিচে তহসিলদারের নাম লিখে রাখবেন। যে কৃষক খাজনা নিয়ে আসে তিনি তাদের প্রত্যেকের নাম লিখে রাখবেন এবং তাকে কোষাধ্যক্ষের সই করা একটি রশিদ দেবেন। যে তালিকা অনুযায়ী পাটওয়ারীও মুকাদ্দম খাজনা আদায় করেছে তার নকল এবং সরখাত অর্থাৎ কৃষককে যে লিখিত স্মারকপত্র দেওয়া হয়েছে তা তিনি পাটওয়ারী হতে গ্রহণ করবেন এবং এইগুলি পরিদর্শন করবেন এবং সম্যকভাবে পরীক্ষা করে

---

৬৪. তুর্কী শব্দ, অর্থ লেখক।

৬৫. প্রতি জেলার নিযুক্ত একজন কর্মাচারী যিনি ইহার রীতিনীতি, আচার ভূমি বন্দোবস্তের নিয়ম, সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। এই পদ সাধারণই বংশাণুক্রমিক দেওয়া হত। পাটিওয়ারীদের নিকট হতে তিনি জমির শিকস্তী, পর্যস্ত বিক্রয়, লিজ দেওয়া, দানকরা ইত্যাদি যে সবের ফলে ভূমির বিবরণের খাতা সংশোধনের প্রয়োজন হয়। তার রিপোর্ট পান। তিনি তহসিলদারের অধীনস্থ একজন রাজস্ব কর্মচারী।

৬৬. মুন্সিফ—গ্রামের ভূমি জরিপের মাপজোক তদারক করবার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী।

দেখবেন। যদি কোনো প্রতারণা ধরা পড়ে তবে তিনি তাদের জরিমানা করবেন এবং দৈনিক প্রতি গ্রামের খাজনা আদায়ের পরিমাণ ও বকেয়ার পরিমাণ আমলগুজারের নিকট রিপোর্ট দেবেন এবং এইরূপে তার দায়িত্ব সম্পাদন সাহায্য করবেন। যখনই কোনো কৃষক তার হিসেব পরীক্ষা করতে চায় তিনি তৎক্ষণাৎ তার ব্যবস্থা করবেন এবং প্রত্যেক ফসলের পর তিনি প্রত্যেক গ্রামে আদায়কৃত খাজনা ও বাকির পরিমাণের তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং তা পাটওয়ারীর তালিকার সহিত মিলিয়ে দেখবেন এবং প্রত্যেকদিন জমাখরচের খাতায় প্রত্যেক নাম ও শিরোনামের অধীনে তা লিপিবদ্ধ করে তার সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ তাতে আমলগুজার ও কোষাধ্যক্ষের সহি নেবেন। মাসের শেষে তিনি তা একটা থলিতে ভরে সেই আমলগুজার দ্বারা সিলমোহর করে দরবারে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া তিনি দৈনিক মোহর টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রচলিত মূল্য সর্বপ্রধান কর্মচারীর সীল মোহরে প্রেরণ করবেন এবং প্রতি ফসলের শেষে তিনি কোষাধ্যক্ষের জমা ও খরচের হিসেব নিয়ে তার সত্যতার নিদর্শনরূপে স্বাক্ষর করে প্রেরণ করবেন। প্রতিবৎসর তিনি আমলগুজারের সঙ্গে সারমর্ম এবং রাজস্ব ধার্যের হিসেব প্রেরণ করবেন। দৈনিক জমা খরচের খাতায় তিনি কোন্ গ্রামে সম্পত্তি ও গরুবাছুর লুট হলো তা লিখে রাখবেন এবং ঘটনার বিবরণ দিয়ে রিপোর্ট করবেন। বৎসরের শেষে যখন রাজস্ব আদায়ের সময় শেষ হয়ে যায় তখন তিনি গ্রামে বকেয়া খাজনার পরিমাণ লিখে আমলগুজারকে দেবেন এবং তার নকল দরবারে প্রেরণা করবেন। পদ হতে যখন তিনি অপসারিত হবেন তখন তৎকালীন আমলগুজারের নিকট, বাকী বকেয়া, অগ্রিম প্রদত্ত ইত্যাদি খাতে তার হিসেবপত্র বুঝিয়ে দেবেন এবং সবকিছু সম্বন্ধে তাকে সন্তোষ-জনকভাবে বুঝিয়া দিয়ে তার অনুমিতি নিয়ে দরবারে প্রত্যাগমন করবেন।

খাজনাদার বা কোষাধ্যক্ষ

বর্তমান কালের ভাষায় এ ফোতাদার[৬৭] বলা হয়। কোষাগার প্রদেশিক শাসনকর্তার আবাস স্থলের নিকটে স্থাপন করা উচিত এবং এমন স্থানে তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে এর কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে। কৃষকদের নিকট হতে তিনি সকল রকমের মোহর টাকা, তাম্রমুদ্রা, তারা আনয়ন করে তাই তিনি গ্রহণ করবেন। কোন বিশেষ ধরনের মুদ্রা দাবি করতে পারবেন না। সম্রাটের প্রচলিত মহান মুদ্রায়, মূল্যবান তিনি কম ধরতে পারবেন। পূর্বের নৃপতিদের মুদ্রা তিনি ধাতুরূপে গ্রহণ করবেন। তিনি সব অর্থ একটা সুরক্ষিত কক্ষে রাখবেন এবং তা শিকদার ও রেজিস্ট্রারকে জানাবেন এবং প্রত্যেকদিন বিকালে তা গণনা করবেন এবং এর স্মারকলিপি প্রস্তুত করে তা আমলগুজার দিয়ে সহি করাবেন এবং দৈনিক জমাখরচের খাতার সঙ্গে। রেজিস্ট্রারের হিসেব মিলে দেখবেন এবং তার সহি দ্বারা সত্যতা প্রতিপাদন করবেন। কোষাগারের দরজায় আমলগুজারের সীলমোহরের পর তিনি তার নিজের তালা লাগাবেন এবং শুধুমাত্র আমলগুজারও রেজিস্ট্রারের জ্ঞাতসারে এটা খুলবেন। কৃষকদের নিকট হ'তে তিনি আমলগুজার ও রেজিস্ট্রারের অজ্ঞাতে কোন অর্থ গ্রহণ করবেন না। হিন্দুস্থানে বহিনামে পরিচিত হিসেবের খাতায় তিনি পাটওয়ারীর সহি নিবেন যাতে গড়মিল না থাকতে পারে। দেওয়ানের আদেশপত্র (ভাউচার) ছাড়া কোনো অর্থ প্রদান করবেন না এবং সুদ সম্বন্ধীয় কোনোরূপ আদান-প্রদানে জড়িত হবেন না। যদি কোনো খচর এমন আবশ্যকীয় হয় যে কোনো রূপ বিলম্ব করা যায় না তখন তিনি রেজিস্ট্রার ও শিকদারের আদেশে সেই খরচ করতে পারেন এবং পরে তা সরকারের নিকট নিবেদন করবেন।[৬৮]

সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ হতে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত বর্ণিত কর্মচারীদের দায়িত্বসমূহ প্রধানত সম্রাটের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন এবং যেহেতু কোনো এক ব্যক্তি তা সম্পন্ন করতে পারে না, ফলে প্রত্যেক কাজের জন্য একজন প্রতিনিধি (ডেপুটি) নিযুক্ত করা হয় এবং এইরূপে শাসনতন্ত্রের আবশ্যকীয় অংশসমূহকে শক্তিশালী করা হয়।

জীবিকা নির্বাহের মুদ্রা

মানুষের কার্যাবলীর শুভ ফল ও তেজস্বীতা তার শরীরের পুষ্টিসাধনের উপর যেরূপ নির্ভরশীল সেরূপ তার বিশুদ্ধতার অনুপাতে জীবনীশক্তিতে জোরদার হয়। আর তা না হলে শরীর মোটা হয়ে যায় এবং জীবনশক্তি দুর্বল হয়। এইরূপ বিধি ব্যবস্থায় চিন্তাধারা সূক্ষ্ম হয়

---

৬৭. ফোতা শব্দটি আরবি। এর দ্বারা সিন্ধুদেশ হ'তে আনীত শেখড়ে জড়ানোর কাপড় বুঝায়। শব্দটাও ঐ দেশ হতেই আগত বলে ধারণা করা হয়। এই কাপড়ের নাম হতেই এই পদের নাম ফোতাদার হয়।

৬৮. শিকদার মুঘল সরকারের কোন নির্দিষ্ট বিভাগের ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী। কখনও আবার ইহা প্রদেশের সর্বোচ্চ রাজস্ব কর্মচারীকে বুঝাতে ; আবার কখনও প্রাদেশিক শাসনকর্তার অর্থনীতির দায়িত্ব সম্বন্ধে এই নাম প্রয়োগ করা হতো।

আর কার্যাবলী বিশুদ্ধ হয়। ধীর স্থির যে সব লোক সুখের সন্ধান করে তারা সব জিনিসের আগে বিশেষ করে খাদ্য সম্বন্ধে সতর্ক হয় এবং সব রকমের মাংস ছুঁয়ে হাত অপরিত্র করে না। সরল হৃদয় লোক যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে তাদের পক্ষে পরিশ্রম কষ্টসাধ্য এবং তাদের জীবন ধারণের উপায়ও সংকীর্ণ। তাদের সেই দীপ্তিমান অন্তর্দৃষ্টি নেই যা ধাতুর সত্তা ভেদ করে প্রশান্ত হয় কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালায় সন্তুষ্টির ভয়ে ক্ষুধার তাড়নায় আত্মার আসন্নতায় তলাইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সেই লোকের কথা ধরা যাক যার কয়েকটি গাভী আছে, যেগুলি তার বৈধসম্পদ এবং তিনি তাদের দুগ্ধে জীবন ধারণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত এরূপ হ'ল যে এইগুলি সহসা একদিন কোথায় চলে গেল এবং তিনি কয়েকদিন উপবাস করে কাটাল। একজন কর্মঠ লোক অত্যন্ত পরিশ্রম করে এদের খুঁজে ফিরে এলে। কিন্তু তিনি এদের গ্রহণ করতে অসম্মত হলেন এবং বললেন, "আমি জানি না গত কয়দিন ঐ বোবা প্রাণীগুলি কোথায় আহার করেছে।," অল্প সময়ের মধ্যেই এই সরল অন্তকরণের লোকটি ইন্তেকাল করলেন। এইরূপ স্থূলবুদ্ধি লোকদের দুনিয়া হতে এইভাবে বিদায় গ্রহণ করবার বহু গল্প প্রচলিত আছে। আবার এমন লোভী বিষয়ী লোকও আছে যারা অন্যের ও নিজের সম্পদের পার্থক্য স্বীকার করে না এবং তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের বিনিময় নিজেদের বাসনা চরিতার্থ করে। অজ্ঞান ও বিক্ষিপ্তমনা লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন উপলক্ষ্য করে লুণ্ঠন ও বলপূর্বক অধিকার নিজেদের জন্য অনন্ত শক্তির ব্যবস্থা করে।

সরল নিরীহ লোকেরা মনে করে যে অনধিকৃত কোনো পতিত ভূমি নাই আর তা পাওয়া গেলেও চাষাবাদ করবার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হবে, আর সেগুলি পাওয়া গেলেও এ যে প্রয়োজনীয় খাদ্য হলে তারা পরিশ্রম করতে সক্ষম হবে, তা পাওয়া যাবে না। তারা খনন করবার কোনো খনি আবিষ্কার করতে পারেনা, আর যদি কেউ মালিক নাই এমন একটা তাদের দেখিয়ে দেয়, তবে তা হতে জীবিকা সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হবে। তারা অস্ত্রশস্ত্রের পেশা গ্রহণে অনিচ্ছুক, কারণ এর ফলে লাভের জন্য প্রিয় জীবন বিনিময় করতে হয়। তারা ব্যবসা করা হতেও বিরত থাকে এই কারণে যে বহু লোক তাদের পণ্যের জন্য উচ্চ মূল্য দাবি করে এবং সেগুলির দোষ ঢাকে এমন সব গুণাবলী আরোপ করে যে সব গুণ ঐ জন্যে নাই, আর যখন তার জন্য ক্রয় করতে যায় তখন তার চমৎকার গুণাবলীর প্রতি চক্ষু বন্ধ করে যে সবে যে দোষ নাই তাই আরোপ করে নিন্দা করতে থাকে। এইভাবে তারা অন্যের ক্ষতির বিনিময়ে নিজের লাভ করতে চেষ্টা করে। আর তারা প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের জিনিস বাজেয়াপ্ত করাকে আইনসঙ্গত বলে মনে করে সন্তুষ্ট থাকে। এরা তাদেরও অনুমোদন করে না এবং তারা দাবি করে যে এইরূপ মিথ্যা ভান করা যদি বোধগম্য ও সুবিবেচনার কাজ হয়। তবে এটা অন্যের সম্পদ দখল করে রাখবার অনুমোদন না হয়ে, শুধু অতিরিক্ত দুশ্চিন্তার কারণ হবে মাত্র ; কারণ অন্যের সম্পদের বেআইনী দখল করাকে কি করে ধর্মের পার্থক্যের জন্য সমর্থন করা যেতে পারে ; অপরদিকে এটা দুষ্ট লোকের প্ররোচনা মাত্র, অর্থ গৃধ্ন লোকের উদ্ভট স্বপ্নমাত্র এবং সৎলোকের শ্রবণের অযোগ্য। বর্তমান কালে সম্রাট সর্বলোকের সম্মুখে পথের মধ্যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছেন, যাতে তারা রাস্তার ও খাদ্যের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং যাতে ধ্বংসের পথে তলিয়া না যেতে পারে বা যাতে তাদের জীবন ধারণ নিষ্ফল না হয়ে যায়, যেহেতু মানব চরিত্রের অসংখ্য বিচিত্র

রকমের দিক আছে এবং অন্তর এ বাইরের বিক্ষিপ্ততা প্রতিদিন বৃদ্ধি পায় এবং লোভের ভারী পদক্ষেপ দ্রুত পথ অতিক্রম করে আর হাল্কা মাথার ক্রোধবদ্ধ করায়, যেখানে অসম্মানের পতিত ভূমি দৈত্য–দানবে পূর্ণ যেখানে বন্ধুত্ব অতি বিরল এবং ন্যায় বিচার চক্ষুগোচর হয় না, সেখানে বাস্তবিক পক্ষে এই বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে স্বৈরতন্ত্র ছাড়া আর কোন উপায় নেই এবং শাসনতন্ত্রের এই মহৌষধি লাভ তখনই সম্ভব হয় যখন সম্রাট ন্যায়পরায়ণ হয়। যদি একটা গৃহ বা একটা স্থান একজন বিবর্ত শাসনকর্তার ভরসা ও ভয় ছাড়া পরিচালনা করা না যায়, তবে এই ঝড়ঝাপ্টাওয়ালা ভীমরুলের বাসায় পূর্ণ পৃথিবীকে একমাত্র সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধির ক্ষমতা ছাড়া কি করে শান্ত রাখা যাবে? এইরূপ অবস্থায় কি করে লোকের সম্পদ, জীবন, মানসম্মান এবং ধর্ম রক্ষা করা যাবে, যদিও কোন কোন সন্ন্যাসী কল্পনা করে যে আধ্যাত্মিকতা দ্বারা এটা সম্পন্ন করা যায় কিন্তু সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা কখনও সার্বভৌম নৃপতিদের ছাড়া লাভ করা যায় নি। অর্থ অলৌকিক ক্ষমতার জ্বলন্ত উষর ভূমিও সময় সময় সম্মোহিত ও যাদুমাত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অবিবেচনার সমুদ্র মতে বিশৃঙ্খলার ঝড় উঠে এবং বহু প্রাণ সরলতার ও অদূরদর্শিতার জন্য অনভিজ্ঞতার উত্তাল তরঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে এবং এখনও যায়। আবার যারা জ্ঞানের আলোতে এবং স্বীকৃতির প্রভাবে বাসনাররশি টেনে সুদীর্ঘ যাত্রার পানের সংগ্রহ করেছেন, তারা বিক্ষিপ্ততার চৌরাস্তায় পড়ে তাদের বোকামী, ধর্মহীনতা ও অবিশ্বাসের জন্য উচ্চ নীচ সকলেরই নিন্দাভাজন হয়। ঐ অজ্ঞানতার সমাবেশে যদি কোন অভিজ্ঞ দার্শনিক প্রবেশ করেন তবে তাকেও বোকামীর ভান করে নীচজনের ঔদ্ধত্য হতে পলায়ন করতে হবে।

এটা সুস্পষ্ট যে সমস্ত আবাদী এলাকায় সম্পত্তি ও অধিকারীর সংখ্যা অসংখ্য এবং তারা বংশাণুক্রমিক উত্তরাধিকারীসূত্রে ভূমির মালিক, কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণতা এবং ঘৃণার ফলে তার মালিকী স্বত্ব অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন হয় এবং তার উপর দৃঢ়তার হস্ত আর তখন প্রসারিত নাই। কৃষক যদি পৃথিবীর অলঙ্কার এবং জীবনের সঞ্জীবনীর ক্ষমতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে এবং ব্যবসায়ী যদি অমোঘ পরিকল্পনা ত্যাগ করে স্বর্গীয় আশীর্বাদের আধার পৃথিবীর অধিপতির করুণার কথা মনে রাখে তা হলে তার সম্পদের প্রকৃতই শ্রীবৃদ্ধি হবে। ফলে সম্পদের গুণাবলী নির্ভর করে এর আত্মনিবেদনের উপর এবং একজন ন্যায়বান শাসনকর্তা লবণের খনির মতো অপরিচ্ছন্নকে পরিছন্ন করে এবং খারাপকে ভাল করে। কিন্তু আন্তরিক সহযোগিতা প্রচুর পরিমাণে রাষ্ট্রের আনুষঙ্গিক উপকরণ এবং পূর্ণ কোষাগার ছাড়া তিনিও কোনো সফলতা লাভ করতে পারেন না এবং বশ্যতা ও আনুগত্যের ভিত্তি নিয়মানুবর্তীতার অভাবে শিথিল হবে। তাই শক্তিশালী গঠনের লোকেরা প্রথমত সামরিক বাহিনীর চাকুরি পছন্দ করে। সে কি সাহায্য করতে পারে তা চিন্তা করা উচিত যাতে মানব সমাজের অস্তিত্ব রক্ষায় তার জীবন উৎসর্গ করা হয়েছে বলে মনে করতে পারে। তেমনি শ্রমিকের জীবন ধারণের অবলম্বনও তার গবাদি পশুর খাদ্যের ন্যায় প্রচুর। কিন্তু কোনো লোক যদি এই কাজের অনুপযুক্ত হয় তখন তার উচিত কোন রকমে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা। সুতরাং দেখা যায় যে জীবন ধারণের অবলম্বন দুইটি ভিত্তির উপর অবস্থিত যথা : সার্বভৌম নৃপতিদের ন্যায়পরায়ণতা এবং অনুগত আশ্রিতদের মঙ্গল করবার আগ্রহ। নীচ বিষয়ী লোক যুক্তির ভাষা বুঝতে পারে না এবং কখনও শরীরের অনুভূতির সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে না। এই অনুর্বর ভূমির জন্য তরবারি সিঞ্চনের প্রয়োজন হয়, বিশুদ্ধ শক্তি

প্রদর্শনে কোনো কাজ হয় না। রাজার মর্যাদার সম্মুখে অহঙ্কারী ও বিকৃত স্বভাব লোকেরা অন্ধকারে তলিয়ে যায়। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ ভাল লোকের নিরবছিন্ন উন্নতি সাধিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে শাসনতন্ত্রের চারটি[৬৯] অমূল্য উপাদানের উপর কর্তৃত্বের প্রতিদান যাই হোক না কেন, এটা যুক্তিযুক্ত, সুবিধাজনক এবং সর্বশক্তিমানের নির্দেশ। গৃহের পাহারাদারকে তারা অধিপতি পুরস্কার দেয় এবং পৃথিবীর পাহারাদারদের পথপ্রদর্শন করে। যদি কোন লোকের সমস্ত সম্পদ তার সম্মান রক্ষার্থে ব্যয়িত হয়, এটা ন্যায়সঙ্গত হবে যে তার উপরে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার সমস্ত প্রখ্যাতি জামানত রাখে, আবার রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের অভিভাবকত্বের প্রশ্ন যখন আসে তখন তা এর চেয়ে আরও কত গুরুত্বপূর্ণ হবে তাই কি বিবেচ্য নয়? কিন্তু ন্যায়পরায়ণ নৃপতিগণ তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু আদায় করে না এবং অতিরিক্ত ধর্মলিপ্সা দ্বারা নিজেদের হাত কুলষিত করে না, এবং ফলে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে স্থান ও কাল ভেদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। এই ইঙ্গিতপূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে সতর্ক নৃপতিগণ তাদের নিকট হতে যাই আদায় করুক না কেন, তা অত্যন্ত সুবিবেচনা করে এবং ন্যায়পরায়ণতার উপর ভিত্তি করে এবং যা তাদের অনুগতদের দান করে তা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং সর্বত্রই এরূপ করা হয়ে থাকে। এটাও পরিষ্কার বুঝা যায় যে সৈন্যদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা আরও বেশি উত্তম হওয়া উচিত। এর পর আসে কৃষকগণ ও তারপর অন্যান্য কারিগরগণ। প্রাচীন গ্রীক[৭০] পুস্তকসমূহ দাবি করে যে পেশা তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সম্ভ্রান্ত, নীচমনা ও মধ্যবর্তী। প্রথমটা মানসিক অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে এবং তাও তিন প্রকারের বেশি হয় না যেমন প্রথমটা বিশুদ্ধ বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত যথা বিজ্ঞতা ও শাসন পরিচালনার ক্ষমতা; দ্বিতীয় লব্ধ ক্ষমতা রচনা করা বা বাগ্মিতা; তৃতীয় ব্যক্তিগত সাহস যথা সামরিক দায়িত্ব। নীচমনাও তিন প্রকারের হয়: প্রথম মানবজাতির সাধারণ মঙ্গলের পরিপন্থী যেমন গোপনে শস্য মজুত করে রাখা, দ্বিতীয় যে কোনো একটি গুণাবলীর বিপরীত যেমন ভাড়ামি; তৃতীয় এমন হয় যে তাদের প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবে পরাম্মুখ যেমন নাপিতের মুচির বা ঝাড়ুদারের ব্যবসা। মধ্যবর্তীগণ নানাবিধ পেশা ও ব্যবসায় নিযুক্ত কতিপয় অবশ্য প্রয়োজনবশত যেমন কৃষিকার্য অন্যান্যগুলি যা সম্পন্ন করতে পারা যায় যেমন রং করা; অন্যান্যগুলি আবার খুব সহজ যেমন ছুতারের কাজ ও লোহার জিনিস তৈরির কাজ; আবার কিছু শক্ত কাজ যেমন দাড়িপাল্লা ও ছুরি তৈরি করা। এই আলোচনা হতে সামরিক পেশার গৌরবময় ভূমিকা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সংক্ষেপে জীবিকা নির্বাহের সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত এমন পেশা যার সহিত ন্যায়পরায়ণ আচরণ, আত্ম-সংযম ও সাহস যুক্ত আছে এবং যা অন্যায় কাজ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হতে স্বতন্ত্র। সৎ লোকেরা কোনো পেশায় তিনটি জিনিস অতীব প্রয়োজনীয় মনে করে—অত্যাচার পরিহার করা অসম্মানের কাজ হতে দূরে থাকা, নীচুতা হতে বিরত থাকা; অসম্মানের

৬৯. প্রথম খণ্ডে আবুল ফজল তার ভূমিকায় লিখেছেন যে এই চার উপাদান নিম্নরূপ: (১) যোদ্ধা (২) কারিগর ও ব্যবসায়ী (৩) পণ্ডিতগণ (৪) কৃষক ও শ্রমিক। প্রকৃতির চার উপাদানের সঙ্গে যথাক্রমে এগুলোর তুলনা হয়, যথা: আগুন, বায়ু, পানি ও মাটি।

৭০. এখানে আবুল ফজল নিঃসন্দেহে এরিস্টটলের পলিটিকস গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। আরবিতে শব্দানুবাদ করতে গিয়ে অর্থ খানিকটা এলোমেলো হয়ে পড়েছে।

কাজ দ্বারা ভাড়ামি এই জাতীয় হীন পেশা : আর নিচ কাজ দ্বারা বুঝা যায় নিকৃষ্টতর পেশার অবলম্বনের উপযুক্ত অবলম্বন পাওয়া যায় তখন উপার্জনের এক অংশ জমিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন, যদি তাতে পরিবার প্রতিপালনের কষ্টকর হয়ে না উঠে। ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয় বা তাকে লোলুপ ও লোভী বলে তিরস্কার করাও অন্যায়। সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ তখনই হয় যখন এর ব্যয় আয়ের চেয়ে কম হয় ও ব্যবসায়ে লাভের আশায় সামান্য ঝুঁকি নেওয়া কোনো দোষ নাই এবং লাভজনক পেশা অবলম্বন করে কিছু অংশ অর্থ-এ মূল্যবান সামগ্রীতে, কিছু অংশ জিনিসপত্রে, কিছু লাভের আশায় পুনর্বিনিয়োগ করায়। আবার আর এক অংশ ভূমি ও স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ করা, ও আর এক অংশ হাওলাত দেওয়া যেতে পারে আর খরচ মিতাচার, ন্যায়পরায়ণতা ও সাবধানতার সহিত নিয়ন্ত্রণ করা সঙ্গত। এরূপ লোকেরা যেন ব্যবসায়ীকে আদান প্রদানে সরলতা অবলম্বন করে এবং অন্তরে যেন কোনোরূপ আত্ম-ভৎর্সনার স্থান না দেয়, সে যেন তার উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর ইচ্ছার কথা স্মরণ রাখে এবং কৃতজ্ঞতা লাভ, যশবৃদ্ধি এবং পুরস্কার লাভের দিকে না ঝুঁকে পড়ে। যে সব দরিদ্র লোকের দরিদ্রতা অপ্রকাশিত থাকে সে যেন তাদের পর্যরূপ দান করে। বদান্যতারও দুইটি দিক আছে, যা পরিমিত ভাবে প্রয়োগ করলে প্রশংসনীয় হয়, প্রথমত যা দান করা হয় তাহা সম্পূর্ণ সহৃদয়তা বা উৎসবাদিতে উপহার দেওয়া, এটা দ্রুত এবং গোপনে সম্পন্ন করা উচিত এবং তাতে যেন কোনরূপে কৃপণতা না করা হয় অথচ যাতে তা নিজের সম্পদের উৎসের অঙ্গহানী বা শূন্য করে ফেলা না হয়।

দ্বিতীয়ত যাকে বলে সাময়িক সংকট নিরসনের প্রয়োজনীয়তা, হয় আরামের উপকরণ সংগ্রহ করা বা অভিযোগ দূর করা যেমন অত্যাচারীদের বা লম্পটদের যা দেওয়া যায় যাতে সেই লোকের হাত হতে সম্পত্তির ক্ষতি ও সম্মানের হানি না হতে পারে। কিন্তু এতে তার মিতাচারী হ'তে হবে। তবে জীবনের আরাম আয়েসের উপকরণ সংগ্রহে বদান্যতা যেন প্রচুর হয়।

জীবন ধারণের ব্যাপারে পৃথিবীর লোকদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর লোক এমন বেপরোয়া হয়েছে বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন তাদের বোধগম্যই হয় না, যে কথা কার্যত বিবেচনা করা তো দূরের কথা। আর একে শ্রেণী তাদের স্বর্গীয় সৌভাগ্য প্রকৃত সত্য সন্ধানে এত মগ্ন যে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তারা কোনো চিন্তাই করে না। কিন্তু যারা সুখের সন্ধান করে আচার ব্যবহার সাবধানতা অবলম্বন করে জীবনের ন্যায্য উপলব্ধি সম্বন্ধে যারা অবহেলা করে না এবং যারা আল্লাহ্‌র প্রেমিকদের দলভুক্ত হবার আশায় বাইরের অবস্থাকে অন্তরের উন্নতির উপকরণ করে নেয় এবং এইভাবে সুখের তৃতীয় মার্গে উত্তীর্ণ হয় যখন পরিত্রাণের শুষ্ক পতিত ভূমি অতিক্রম করে হয়তো তারা দ্বিতীয় মার্গে পৌঁছিতে পারে। সার্বভৌমত্বের প্রাপ্য এইরূপ নিরাপিত করা হয়। জীবন ধারণের উপকরণের প্রচলন বিচক্ষণ নৃপতিদের ন্যায়পরায়ণতা এবং সুবিবেচক অধীনস্ত ব্যক্তিদের সাধুতা এই দুই-ভিত্তির উপর নির্ভরশীল এবং যেহেতু রাজকীয় অবস্থা ও বিশেষ অধিকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হয় আর ভূমিও বিভিন্ন রকমের হয়, কোনোটাতে অল্প পরিশ্রমেই প্রচুর ফসল ফলে, আবার কোনোটা এর ঠিক বিপরীত। তাছাড়া পানি নিকটে ও দূরে থাকার ফলে

উর্বরতায় বৈষম্য দেখা দেয়। ফলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃপক্ষকেই এই সব বৈষম্য অনুধাবন করতে হয় এবং সেই অনুপাতে কর ধার্য করতে হয়। হিন্দুস্থানের সর্বত্র, যেখানে সর্বকালে বহু সুবিখ্যাত নৃপতি রাজত্ব করে গিয়েছেন, উৎপন্ন ফসলের ১/৬ রাজস্ব আদায় করা হতো। তুরস্ক সাম্রাজ্যে, ইরানের ও তুরানেও যথাক্রমে $\frac{১}{৫}$ অংশ ও $\frac{১}{১০}$ অংশ। প্রাচীনকালে মাথাপিছু এই কর আদায় করা হতো। এর নাম খিরাজ। কুবাদ এই প্রথা অনুমোদন না করে স্থির করেন যে আবাদী জমি জরিপ করে তার উপর রাজস্ব নির্ধারিত করা হবে। কিন্তু অর্থ পরিকল্পনা কার্যকরী করবার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। নৌশিরওয়ান (তার পুত্র) এটা কার্যে পরিণত করে এবং দশ বর্গনলে এক জরিপ মাপ ঠিক করেন। এটা রাজকীয় ৬০ বর্গগজের সমান। এর এক–চতুর্থাংশকে এক কাগজি ধরা হতো এবং এর মূল্য তিন দিরহাম ধরা হতো এবং ইহার এক–তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের পাওনা বলে ধার্য করা হতো। কাফিগজ এবং মাপএর নাম এটা মা–আ ও বলা হতো, এর ওজন ৮ বাতল এবং কেহ বলে আরও বেশি। দিরহাম ওজনে এক মিনকালের সমান। খিলাফত যখন ওমরের কর্তৃত্ব আসে তখন তিনি পণ্ডিতদের পরামর্শে নৌশিরওয়ানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের ফলে তিনি এতে কিছু পরিবর্তন সাধন করেন যা প্রাচীন পুস্তক হতে জানা যেতে পারে। তুরান ও ইরানে বহু প্রাচীন কাল হতে তারা এক–দশমাংশ আদায় এসেছে, কিন্তু আদায় বৃদ্ধি পেয়ে অর্ধেকেরও বেশি হয়েছে, যা স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের নিকট বেশি বলে মনে হয় না। মিশরে তারা আদায় করে এক—

কদ্দান সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভূমির জন্য ৩ ইব্রাহিমী
কদ্দান সর্বাপেক্ষা মাঝামাঝি ভূমির জন্য ২ ইব্রাহিমী
কদ্দান সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ভূমির জন্য ১ ইব্রাহিমী

ফাদ্দান ৮০ ভূমির এক মাপ ১০০ বর্গনলের সমান। প্রতি নল এক বা–আ এর সমান। এক ইব্রাহিমীর মূল্য ৪০ কবির এবং ১৪ কবির আকবর শাহী এক টাকার সমান। তুরস্ক সাম্রাজ্যের কোনো কোনো অংশে তারা কৃষকের নিকট হতে প্রতিজোড়া হাতে এক কসবাহ ; ১০ কসাবাহতে এক আমল ; এক জবির এক বর্গ আমল এর সমান অর্থাৎ ১০ বর্গ কসবাহ বা ১০০ বর্গ হাত। কুদামাহ–এর মতে ৪ আমা এক কবজাহএর সমান এবং ১০ কবজাতে এক হাত ৬০ হাতে এক আমল। এই হিসেবে এক ৬০ বর্গহাতের সমান। ৭৮ কাফিজ=১২৪ মতে ১৪৪ বর্গহাত পরিমাণ ভূমি।

৭৯ দিরহাম সম্বন্ধে এনসা ইসলা ৯৭৮ ও আইনী–ই আকবরীর ১ খণ্ড আইন–২ দেখুন। ৮০ রাতন ১২ হতে ১৬ আইন্স ওজন ধরা হয়, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাপ হয়। বোম্বাইতে ইহা ৩৬ সুরাট টাকার সমান ধরা হয়। লোহিত সাগর এলাকায় রত্তোলো বলা হয় এবং ১০ হতে ১৪ আউন্স হয়।

ষাড়ের জন্য ৩০ আকচেহ আদায় করে। আকচেহ রৌপ্য মুদ্রা এবং ইহা ৮১ ইব্রাহীমীর সমান। রাজকীয় ভূমির রাজস্ব ৪২ আকচেহ এবং প্রত্যেক সৈন্য হ'তে ২১ আদায় করা হয়

তাছাড়া প্রাদেশিক শাসনকর্তা আদায় করে ১৫। কোনো কোনো স্থানে প্রতি হালের জন্য ২০, প্রতি সৈন্য হ'তে ৭ আকচেহ, এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তা নেয় ছয়। অন্যান্য স্থানে সনজকবেগী[৭১] পায় ২৭ এবং সুবাশী (কোতওয়াল) নেয় দ্বাদশ। ঐ সাম্রাজ্য আর বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

ইসলামী রাজস্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা

মুসলিম শাসনের প্রথমদিকের অস্পষ্ট ও গোলমেলে ভূমি ব্যবস্থার সুন্দর বিবরণ এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে বিভিন্ন স্থানে, নিম্নলিখিত শব্দগুলির অধীনে দেওয়া আছে খারাজ (হিই ৯০২), মুসাসামা (পরিশিষ্ট ১৫৪), উশর (হি ১০৫০-১০৫২), দার-অল-সুলহ (হি ৯১৯) ও ফাই (হিই ৩৮)। আবু ইউসুফ ইবনে ইয়াকুবের কেতাব-উল খিরাজ হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। আওরঙ্গজেবের সময়ে ভারতে প্রবর্তিত এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে যদুনাথ সরকারের মুঘল এডমিনিস্ট্রেশন পুস্তকে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে, তৃতীয় সংস্করণ, নবম পরিচ্ছেদ।

মুলহিই শব্দের অর্থ বের করবার জন্য আবুল ফজল প্রাচীন পুস্তক দেখবার পরামর্শ দিয়েছেন। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামের (হি ৯১৯-দারউল সুলদের অধীনে) নিম্নলিখিত বিবরণ হ'তে ইহা ভাল বুঝা যাবে, "নাজরানের খ্রিস্টান অধিবাসীদের সাথে মুহম্মদ স্বয়ং এক চুক্তি সম্পাদন করেন। তাতে তাঁদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন এবং তাঁদের উপর এক কর আরোপ করেন। এ সম্বন্ধে বালাঞুরীর ফুতুহ-উল বুলদান এ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। এই ব্যাপারের শাসনতান্ত্রিক অবস্থার মাওয়ারদি নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেন, "মুসলমান শাসনাধীনে সমস্ত দেশ তিন ভাগে বিভক্ত (১) যেগুলো সামরিক বল প্রয়োগে অধিকার করা হইয়াছে (২) যেগুলো পূর্ববর্তী শাসন কর্তাদের পলায়নের পর বিনা যুদ্ধে দখল করা হইয়াছে (৩) যেগুলো সন্ধির ফলে হস্তগত হয়েছে। শেষোক্ত শ্রেণীতে জমির মালিকানা যদি পূর্ব মালিকদের নিকট থেকে যায় তবে সন্ধির শর্ত এই হয় যে মালিকগণ তাদের জমি ভোগ দখল করবে এবং তাদের উৎপন্ন ফসল হতে খারাজ কর দিবে ; আর এই খারাজকে জিজিয়া হিসেবে ধরা হয় তা যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহ'লে কর দিতে হয় না। তাদের জমির প্রকৃত মালিক তারা থেকে যায়, তাই ইচ্ছামতো বিক্রি করতে বা বন্দক রাখতে পারে এবং তাদের দেশ দারুল ইসলাম বা দারুল হারব, কোনোটাই নয়, ইহা দারুল সুলহ। যদি এই সব জমি কোন মুসলমানের মালিকানায় চলে যায় তবে আর খারাজ আদায় করা যায় না।

---

৭১. সনজক একটি তুর্কী শব্দ, অর্থ পতাকা বা চিহ্নবাহী দণ্ড। ইহা ক্ষুদ্র প্রকাশও বুঝায় এবং ইহার কয়েকটির সমবায়ে এক আইল্যাণ্ড বা সরকার গঠিত হয়। সম্ভবত এই শেষোক্ত মর্মেই এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাদেশিক শানকর্তা বুঝাতে। এক আকচেহ $\frac{১}{৩}$ পারার সমান এবং ফলে $\frac{১}{১২০}$ পিয়াস্ত্রার সমান বা $\frac{১}{৫৫}$ পেনীর সমান। ইহা অনপার নামেই বেশীরভাগ বর্ণিত হয়। প্রকৃত তুর্কী শব্দের গ্রিক অপভ্রংশ। (এনসা. ইসলাম পৃ. ১৪৮)

মত্তিয়ারদী এই দারুল মুলহকে বিলাদ আল ইসলামের অন্যভুক্ত গণ্য করে। তাছাড়া এই সূত্রে ফাই ফাহি এর অধীনে গনউল নাদিরকে দেখা হ'তো বহিস্কার করে দেওয়ার পর, মুহম্মদ যখন সিদ্ধান্ত করেন যে তার পরিত্যক্ত ভূমি ও বাগানসমূহ তিনি যারা অবরোধে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ভাগ করে দিবেন না, শুধু মোহাজেরদের দিবেন, তখন কোরানের সুরা ৯ (৫৯) ৬,৩ ও ১০ নাজিল হয়. তিনি ইহা এই বলে সমর্থন করেন বা প্রকৃতপক্ষে এইগুলি যুদ্ধ করে অধিকার করা হয় নাই—আত্মসমর্পণ দ্বারা শান্তিপূর্ণ ভাবেই অধিকার করা হয়েছে।"

"পরবর্তীকালে প্রথম ওমর স্থির করেন যে এই বিধান নব--বিজিত দেশগুলিতে ও প্রয়োগ করা হবে। তিনি নির্দেশ দেন যে শুধু অস্থাবর সম্পত্তি আরব বিজয়ীদের মধ্যে বিলি করা হবে, জমি নহে । সাধারণত শুধু স্থানীয় অধিবাসীগণ ভূমি চাষ করবে এবং মুসলমান কোষাগারে কর দিবে। এই কর (খারাজ) জমি দখলের সঙ্গে সর্বকালের জন্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকবে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হবে সে সব জেলা যার অধিবাসীগণ আরবদের আগমন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জমি তারা নিজের দখলে রাখতে এই শর্তে আত্মসমর্পণ করে। এই সব জেলায় (দার-উল-সুলহ নামে পরিচিত) ভূমি ফাইএর অন্তর্ভুক্ত নয়।" (যদুনাথ সরকার)। মুসলমানগণ বিজিত ভূমি তিন প্রকারের বর্ণনা করেছেন : উশরী, খিরাজী ও সুলহী-ই। প্রথম দুইটি আবার ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত এবং শেষটি দুইভাগে। উশরী প্রথম শ্রেণী কেহামাহ জেলা, মক্কা, তায়ফ, ইয়েমন, ওমান, বাহরাইন ইহার অন্তর্গত।[৭২] দ্বিতীয় শ্রেণী যে ভূমির মালিক স্বইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। তৃতীয় যে সব ভূমি বিজয় করবার পর ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ যে জমিতে ঐ ধর্মীয় লোক কোন মসজিদ নির্মাণ করেছে, আঙ্গুর গাছ লাগিয়েছে বা বাগান করেছে বা বৃষ্টির পানি দ্বারা উর্বর করেছে ; নতুবা অন্যরূপ নিয়ম ঘটবে। চতুর্থ ; মালিকের অনুমতি নিয়ে বা পতিত জমি আবাদী করা হয়েছে। খিরাজী, ১ম শ্রেণী ; মূল্য পারস্য ও কিরমান ; ২য় যে ভূমি করদাতা প্রজা তার নিজের বাসগৃহের চতুস্পার্শে রেখেছে ; ৩য় যে জমি কোনো মুসলমান আবাদ করেছে এবং যাহাতে সরকারী খরচে প্রস্তুত কোনো উৎস হইতে পানি সিঞ্চন করা হয়, ৪র্থ যে জমি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আয়ত্ব করা হয়েছে। ৫ম যে জমিতে রাজস্বদের এরূপ জলাশয় হতে পানি সিঞ্চন দ্বারা আবাদ করা হয়। সুলহী-ই-বনি নাজরান ও বনি তখলিব[৭৩]। ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রাচীন দলিলে হ'তে সংগ্রহ করা যাবে। তেমনি, কোন কোন পুস্তকে ভূমিকে তিন ভাগে ভাগ করা

---

৭২. মূল গ্রন্থে বাহরাইন শব্দের পর আর একটি শব্দ আছে যা ঠিক বুঝা যায় না। সম্ভবত ইহা রাবাহ বা রায়াহ হবে, কিন্তু সম্ভবত আবুল ফজল কাজী খানের ফতোয়া হতে উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে উশরীর সীমানা ঠিক এইরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে, রাবাহ শব্দ বাদ দিয়ে। ফতোয়া-ই-আলমগীতি কাজী খানের অনুসরণ করেছে। ব্যাখ্যার যে অস্পষ্ট পাঠ দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় কোনো অপভ্রংশ।

৭৩. মূলগ্রন্থে থা-লব শব্দ আছে, যা ভুল। এই দুই উপজাতির আত্মসমর্পণের বিস্তৃত বিবরণ এনসা. ইসলাম ৩ ৮২৫ এ দেওয়া আছে।

হয়েছে। ১ম মুসলমানদের চাষ করা ভূমি, যাকে তারা উশর[৭৪] বলে মনে করে। ২য় যে জমির মালিকগণ ঐ ধর্ম গ্রহণ করেছে। কারো কারো মতে ইহাই উশরী আর অন্যান্যরা বলে যে ইহা উশরী কি খারাজী হবে তা ইমাম করবেন। তৃতীয় যুদ্ধ জয় করে যে ভূমি দখল করা হয়েছে, ইহাকে কেহ বলে উশরী আবার কেহ বলে খারিজী, আবার কেহ কেহ বলে যে ইহার শ্রেণী বিভাগ ইমাম যে রূপ নির্দেশ দেয় সেইরূপ হইবে। ৪র্থ যে জমি ধর্ম এই ধর্মের অন্তর্গত নয় এরূপ লোক প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী দখল করে। ইহা তারা বলে খরিজী। খিরাজী জমি যে কর দেয় তখন দুই প্রকারের। ১। মুকাসমাহ (বিভক্ত) ভূমির উৎপন্ন ফসলের $\frac{১}{৫}$ বা $\frac{১}{৬}$ অংশ ২। ওয়াজিকা[৭৫] যাহা করদাতার সামর্থ্য ও সুবিধা বিবেচনা করে ধার্য করা হয়। কেউ সমস্ত রাজস্বের আয়কে বলে খিরাজ, এবং যেহেতু উৎপন্নকারীর অংশ তাদের খরচের চেয়ে বেশী, তা হতে কতিপয় বিশেষ মত সাপেক্ষে জাকাত[৭৬] আদায় করা হয় এবং ইহাকে তারা এক দশমাংশ মনে করে কিন্তু বর্ণিত প্রত্যেকটি ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। খলিফা ওমর তাঁর সময়ে যারা তার ধর্মাবলম্বী 'নয়' তাদের নিকট হ'তে ধনী হলে ৪৮ দিরহাম, মধ্যবর্তী শ্রেণীর হলে ২৪ আর নিম্ন শ্রেণীর হইলে ১২ দিরহাম হারে কর ধার্য করেন। ইহাকে বলা হইত জিজিয়া (মাথাপিছু কর)। প্রত্যেক রাজ্যেই সরকার ভূমি রাজস্ব ছাড়াও সরকার ও প্রজাদের সম্পত্তির উপর কর ধার্য করেন এবং ইহাদের তারা বলেন তমখাহ[৭৭]। ইরান ও তুরনে তারা কারও নিকট হতে ভূমি রাজস্ব, কারও নিকট হতে জিহাত এবং কারও নিকট হতে আবার সায়ব জিহাত আদায় করেন। আর তাছাড়া ওয়ামুহাত ও ফারুআহাত নামীয় শুল্ক আদায় করেন। সংক্ষেপে আবাদী জমির উপরে অন্যান্য দায় দায়ীত্ব হতে মুক্তি দিয়া যে কর আদায় করা হয় তাকে বলে মাল। ভাল ভাল তৈরী জিনিস আমদানীর উপর যে শুল্ক

---

৭৪. এই শব্দ দ্বারা $\frac{১}{১০}$ অংশ বুঝায়। মুসলমান শাসনে ভূমি হতে যে $\frac{১}{১০}$ অংশ খাজনা আদায় করা হত তাদের এই নাম দেওয়া হয়। ফলে উশরী যে সব ভূমির $\frac{১}{১০}$ অংশ খাজানা দেয়।

৭৫. ওয়াজিফা দ্বারা বৃত্তি বা যা কিছু সুনির্দিষ্ট দেওয়া হয় বা অঙ্গীকার করা হয় তা বুঝায়। ফলে ইহার অর্থ জমি হতে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কর আদায় করা।

৭৬. জাকাত বা দরিদ্রদের জন্য কর। মূল শব্দ জাকা অর্থ পবিত্র। এর দ্বারা এই বুঝা যায়, যে অংশ আল্লাহর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে বাকি অংশ পবিত্র করে নেওয়া হয়। ধার্যের হার বিভিন্নরূপ হয় কিন্তু সাধারণত $\frac{১}{৪০}$ অংশ বা শতকরা ২$\frac{১}{২}$। যদি সম্পত্তি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হয় এবং তা অন্তত : ১১ মাস দখলে থাকে তবে ইহা দিতে হয়। এনসা. ইস. দেখুন ই-১২০২-১২০৪।

৭৭. তুর্কী শব্দ তমসা অর্থ রাজকীয় সিলমোহর। কখনও ইহা তুর্কী শব্দ আল বা লাল হতে আলত মখা ও বলা হয়। এই শব্দ দ্বারা ভূতপূর্ব দেশীয় রাজন্যদের সিলমোহরে দেওয়া রাজকীয় দানও বুঝা যায় এবং ইংরেজ সরকার এই চিরস্থায়ী নিষ্কর ভূমি স্বত্ব মানিয়া নেন। এই স্বত্ব বংশাণুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য। যদিও সম্ভবত এই দানের সিলমোহরে বা স্বাক্ষর পূর্বে লাল কালিতে দেওয়া হত ভারতীয় রীতি অনুযায়ী এই প্রথার গুরুত্ব হারিয়ে যায়।

তাকে বলা হয় জিহাত আর বাকি সব সায়েব[৭৮] জিহাত। ভূমি রাজত্বের অতিরিক্ত যা রাজস্ব কর্মচারীগণ আদায় করেন তা ওয়াজুহাত, অন্যান্যগণ যা করেন তা ফুরুয়াহাত নামে পরিচিত। প্রত্যেক দেশেই এইরূপ কর ধার্য প্রজাদের অসুবিধার সৃষ্টি করে ও বিভক্তিকর হয়। সম্রাট তার সুবিজ্ঞ দূরদর্শিতায় ও মহানুভব শাসন ব্যবস্থার ফলে অতি সতর্কতার সঙ্গে এই ব্যাপারটি বিচার বিবেচনা করেন এবং সমস্ত স্বেচ্ছাচারমূলক কর রহিত করে দেন। এগুলি যে প্রচলিত প্রথা হিসেবে চলে এসেছে তিনি তার নিন্দা করেন। তিনি প্রথমে গজ, তনাম ও বিঘা স্থির করেন। অতঃপর তিনি উৎপন্ন ফসলের মূল্য হিসেবে জমির শ্রেণীবিভাগ করেন এবং সেই অনুপাতে রাজস্ব নির্ধারণ করেন।

৭৮. এই শব্দটির আদি অর্থ দ্বারা চলতি, বা বাকি অংশ বুঝায়। শেষ অর্থ ইহা দ্বারা ভূমি রাজস্ব ছাড়া আর সব বাকি শুল্ক বুঝায় যেমন, আমদানী শুল্ক, যাত্রার জন্য শুল্ক, বাড়িঘর, কি রাজার শুল্ক ইত্যাদি। এই অর্থে ইহা সমস্ত ভারতে প্রচলিত। এই নামীয় বহু শুল্ক ইংরেজ সরকার রহিত করে দেন শুধু আমদানী শুল্ক, আমগারী শুল্ক এর আর কতিপয় পণ্যের শুল্ক বজায় থাকে। ব্যক্তিবিশেষে কর্তৃক শায়র নামীয় স্থানীয় কর আদায়ের অধিকার বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও উৎপন্ন ফসলের রাজস্ব ছাড়া ভূমির উপরে ধার্য এই নামে পরিচিত যেমন মাছ ধরা, কাঠকাটা, ফলপাড়া, মধু আহরণ ইত্যাদির উপর যে কর ধার্য হয় তা-ই।

আইন-৮

ইলাহী গজ

একটা লম্বা মাপবার পরিমাণ ও মাপিবার আদর্শ নমুনা। উচ্চনীচ সকলেই এর কথা উল্লেখ করে এবং এটা ন্যায়পরায়ণ ও অন্যায়কারী উভয়েরই কাম্য। হিন্দুস্তানের সর্বত্র এইরূপ তিন প্রকারের পরিমাপ প্রচলিত ছিল যথা : লম্বা, মাঝামাঝি ও খাটো। প্রত্যেকটি ২৪ সমানভাবে বিভক্ত এবং প্রতি ভাগকে বলা হয় তসসুজ।[৭৯] প্রথমটির ১ তমসুজ পাশাপাশি রাখা ৮টি বালি শস্যের সমান আর বাকি দুইটির যথাখমে ৭টি ১৬টি বালি শস্যের সমান। লম্বা গজ আবাদী জমি, রাস্তা, দূরত্ব, দুর্গ, জলাশয় এবং মাটির দেয়াল মাপতে ব্যবহৃত হতো। মাঝারি গজ পাথরের ও কাঠের গৃহ, বাঁশের তৈরি গৃহ, প্রার্থনা গৃহ, কুপ ও বাগান মাপতে ব্যবহৃত হতো আর ছোট গজ কাপড়, অস্ত্র, বিছানা, জাঁকজমকপূর্ণ আসন, মেদান চেয়ার, পাল্কি, চেয়ার গাড়ি এবং এই দুই ধরনের জিনিসপত্র পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত হতো।

অন্য কোনো কোনো দেশে যদিও ২৪ তমসুজে গজ ধরা হয়, তারা নিম্নরূপ মাপ ব্যবহার করে :

১	তসসুজ	এর	সমান	২	হাব্বাহ (শস্য)
১	হাব্বাহ	,,	,,	২	বার্লি শস্য
১	বার্লিশস্য	,,	,,	৬	সরিষাদানা
১	সরিষাদানা	,,	,,	১২	ফসল
১	ফসল	,,	,,	৬	ফতিলা
১	ফতিলা	,,	,,	৬	নকির
১	নকির	,,	,,	৮	কিতমির
১	কিতমির	,,	,,	১২	জাররাহ
১	জাররাহ	,,	,,	৮	হবা
১	হবা	,,	,,	২	ওয়াহমাহ
কেউ কেউ আবার এরূপ মাপে :			৪	তসসুজ	এ ১ দাং
			৬	দাং	এ ১ গজ

---

৭৯. তসসুজ ফারসি শব্দ তসুর আরবি রূপান্তর। তমু ৪ বালি শস্যের ওজনের সমান।

আবার কেউ কেউ ২৪ আঙ্গুলে এক গজ ৬ দাং এবং এক আঙ্গুলে ৬ বার্লি শস্য হিসেবে পরিমাপ করে এবং একটা বার্লি শস্যকে টাটু ঘোড়ার কেশরের ৬টি চুলের সমান পুরু ধরা হয়। কোনো কোনো প্রাচীন পুস্তকে দেখা যায় তারা ২ বিঘত ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্টের গিরার দুই প্যাচ ও এক গজ ধরতে এবং প্রতি গিরা ৪ ভাগে ভাগ করে তাদের ৪ পহর বলত এবং ফলে গজের $\frac{১}{৬৪}$ অংশ এক পহর হতো।

অন্যান্য প্রাচীন দলিলে দেখা যায় শত রকমের গজ প্রচলিত ছিল। প্রথম গজই সওদা (যানবাহনের গজ) ২৪ অঙ্গুলি ও এক অঙ্গুলি দুই তৃতীয়াংশের সমান। আব্বাসী বংশীয় হারুন অর রশিদ তাঁর পরিচারক এক আবিসীনায় কৃতদাসের হাতেরই মাপ অনুযায়ী এই মাপ প্রচলন করেন। মিশরের কিলোমিটার[৮০] এই একই মাপের আর গৃহাদি এবং কাপড়চোপড় পরিমাপেও এই মাপ ব্যবহার করা হতো। ২য় জিরবা–ই কসবাহ (নল খাগড়া গজ), একে আয়ামাহ এবং দৌড়ও বলা হতো। এটা ২৪ আঙ্গুলের সমান ; এটা ইবনে আবিলায়লা[৮১] প্রচলন করেছিলেন। ৩য় ইউসুফিয়াহ, বাগদাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বাড়িঘর মাপে এর ব্যবহার করতেন ; এটা ২৫ আঙ্গুলের সমান। ৪র্থ ছোট হাশিমিয়াহ, ২৮ আঙ্গুল ও এক তৃতীয়াংশের সমান। আবী বরদাহ এর পুত্র বিলাল[৮২] ইহার প্রচলন করেছিলেন কেউ কেউ বলেন যে এটা তার পিতামহ আবু মুসা আশআরী প্রচলন করেছিলেন। ৫ম লম্বা হাশিমিয়াহ ২৯ আঙ্গুল ও $\frac{২}{৩}$ অংশের সমান যা আব্বাসীয় খলিফা মনসুর পছন্দ করতেন। এটা মালিক এবং জিয়াদিয়াহ নামেও পরিচিত। যে আবু সুফিয়ান আরবি ইরাকের ভূমির পরিমাপ করতেন জিয়াদ[৮৩] তার পুত্র বলে পরিচিত ছিলেন। ষষ্ঠ ও মরিয়াহ, ৩১ আঙ্গুল পরিমাণ। তার খিলাফতের সময়ে ওমর খুব সাবধানতার সঙ্গে লম্বা, মধ্যম ও ছোট গজ সম্বন্ধে চিন্তা করেন। তিনি এই তিন প্রকারের গজ একত্র করে তার মোট পরিমাণের এক তৃতীয়াংশ নেন এবং এর সহিত বন্ধ মুষ্টির উচ্চতা সোজা বৃদ্ধাঙ্গুষ্টের উচ্চতা যোগ করেন। তিনি এই পরিমাপের টিন দিয়া বন্ধ করেন এবং এটা হুদায়কাহ[৮৪] এবং ওসমান[৮৫]

---

৮০. কিলোমিটারের হাত ইহুদীদের হাতের পরিমাণের সমান হওয়ার কথা, যা ইংরেজি মাপ ২ ফুটের একেবারে সমান। যদি হয় ২৪ আঙ্গুল, ২৪ ইঞ্চি হবে। এক আঙ্গুল প্রস্থে অনায়াসে $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি পরিমাণ ধরা যায়।

৮১. মুহম্মদ বি. আবদুর রহমান, উপনাম ইবনে আবি লায়লা একজন খ্যাতনামা আইনবিজ্ঞানী ও তাবি–ইদের একজন ছিলেন। তিনি কুফার কাজী ছিলেন। সেখানেই হিঃ ৭৪ সালে তার জন্ম এবং ১৪৮ সালে মৃত্যু হয়। (ডি হাবব)।

৮২. বিলাল—বসবার কাজী আবু মুসা আল–আশারীর পৌত্র। তাঁর পিতামহ এর শাসনকর্তা ছিলেন।

৮৩. জিয়দ ইরাকের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলন।

৮৪. হুদায়কাহ হযরত মুহম্মদ একজন অন্যতম আসাবী (সঙ্গী) ছিলেন। ওমর তাঁকে মদায়েনের শাসনকার্যে নিযুক্ত করেন এবং ওসমানের হত্যার ও আলীর খলিফা হওয়ার ৪০ দিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

৮৫. খলিফা আলীর সময়ে তিনি বশরার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন।

বিঃ লুনায়েক এর নিকট প্রেরণ করেন এবং তারা এই মাপ আরবি ইরাকের ভূমি মাপবার কাজে ব্যবহার করেন। ৭ম সামুনিয়াহ, এক তৃতীয়াংশ কম ৭০ আঙ্গুল পরিমাণ। মামুন এর প্রচলন করেছিলেন এবং এটা নদী সমতল ভূমি এবং রাস্তার দূরত্ব পরিমাপের কাজেও ব্যবহৃত হতো। আগেকার দিনে কেউ কেউ কাপড় মাপবার (গজ) কে ৭ মুষ্টির সমান এবং এক মুষ্টি ৪ বন্ধ আঙ্গুলের সমান হিসেব করত। অন্যান্যদের মতে আবার এটা এক আঙ্গুল কম ছিল। কারো মতে জরিপের গজ এই একই ৭ মুষ্টি ছিল : অন্যান্যরা আবার এক আঙ্গুল (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট) সোজা অবস্থায় ৭ম মুষ্টির যোগ করত। আবার কেউ কেউ এই মুষ্টির সাথে আরও এক আঙ্গুল যোগ করত ; আবার কেউ সাত মুষ্টির সঙ্গে এক আঙ্গুল যোগ করে হিসেব করত।

হিন্দুস্তানে সুলতান সিকান্দার লোদী অপর এক প্রকার গজ প্রচলন করেন যা ৪১$\frac{১}{২}$ সিকান্দারীর প্রশস্তের সমান। এটা রৌপ্য মিশ্রিত তাম্র মুদ্রা ছিল। হুমায়ুন এর সহিত অর্ধেক যোগ করে এটা ৪২ এ পরিণত করেন। এর দৈর্ঘ্য ছিল ৩২ আঙ্গুল। কিন্তু তাঁর পূর্বের কোনো কোনো লেখক এইরূপ এক পরিমাপের কথা উল্লেখ করেছিলেন। শেরখান এবং সলিম খান (মুর) যাদের সময়ে হিন্দুস্তানে জমির পরিমাপে শস্য ও তার অংশ ভাগ করবার প্রথা হ'তে রক্ষা পায়, তারা এই গজ ব্যবহার করতেন। পবিত্র সম্বৎসরের ৩১ বৎসর পর্যন্ত ৪৬ আঙ্গুলের সমান আকবরশাহী গজ কাপড়ের মাপ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও আবাদী জমির ও গৃহাদীর মাপজোকে ইসকান্দারী গজ ব্যবহার করা হ'তো। সম্রাট তার প্রগাঢ় জ্ঞানের ফলে উপলব্ধি করেন যে এইরূপে বিভিন্নরূপে মাপ ব্যবহারের ফলে প্রজাদের যারপর নাই অসুবিধা হয়, এবং এটা অসাধু লোকদের সহায়তা করে। তাই তিনি এগুলি রহিত করে দেন এবং ৪১ আঙ্গুলের এক মধ্যম গজ সাধারণ ব্যবহারের জন্য প্রচলন করেন। তিনি একে ইলাহী গজ নামকরণ করেন এবং জনসাধারণ সমস্ত মাপেই এই গজ ব্যবহার করে।

আইন-৯
তনাব[৮৬]

সম্রাট জরিপের জন্য পূর্বের গজের মাপই নির্ধারিণ করেন এবং ৬০ বর্গ মাপ অনুমোদন করেন তবে ইলাহী গজ গ্রহণ করেন। হিন্দুস্তানে তনাব (তাবুর রশি) ছিল পাকানো শনের রশি যা আবহাওয়ার শুষ্কতা ও পরিমাপ ছিল, এটা ৬০ কাফিয বা ৩৬৪ মদ্দ (৭৬৮ পাউণ্ড) এর সমান ছিল। পরে এটা জমির পরিমাপ কার্যে ব্যবহার করা হয়। এক জমির ওজনের শস্য দানা দ্বারা যে পরিমাণ ভূমি আবাদ করা যায় তা জরিপ নামে পরিচিত হয় এবং পরে একে সতর্কভাবে বিঘা অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কালক্রমে এটা বিভিন্ন পরিমাণের ভূমির মাপ বুঝতে ব্যবহৃত হয় এবং মাপের শিকল বা রশিকেও এই নামে অভিহিত করা হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শিকল দিয়া মাপ নেওয়া হয় এবং জরিব প্রতিটি ১১ গজের ৫ শিকলের সমান বা ৬০ গজ ২০ গাথার বা গাটের সমান। এক বর্গ জরিবে এক বিঘা হয়। জরিপের নতুন ব্যবস্থার পূর্ব খাজনা দেয়। জমি সাধারণত ১৮ গাটওয়ালা জরিবে মাপা হতো; দুইটি গাট মাপকারীর দিকে গুটাইয়া রাখা হতো, কিন্তু নিষ্কর ভূমি পুরা রশি দিয়াই মাপা হতো, সিন্দুতে জরিবের পরিমাণ ১৫০ বর্গফুট। তেলেগুতে এটা বাগান ভূমি বা ইহার উৎপন্ন ফসলের বুঝাতে প্রয়োগ করা হয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের জরিপকারীদের আদর্শ বিঘার পরিমাণ = ৩০২৫ বর্গগজ বা এক একরের $\frac{৫}{৮}$ অংশ। বাংলাদেশে বিঘার পরিমাণ মাত্র ১৬০০ বর্গগজ বা এক একরের $\frac{১}{৩}$ অংশের সামান্য কম। বেনারসে সেটেলমেন্টের সময় ইহা ৩১৩৬ বর্গগজ নির্ধারিত করা হয়। অন্যান্য পরগণায় এটা ২০২৫ হতে ৩৬০০ বা ৩৯২৫ বর্গগজ ধরা হয়। কোনো কোনো স্থানে কাচ্চা বিঘা এর এক-তৃতীয়াংশ আবার কোথায়ও মাত্র এক চতুর্থাংশ। আকবরের ৩৬০০ ইলাহী গজের বিঘাকে হিন্দুস্তানের বিঘা ৩০২৫ বর্গ গজের সমান ধরা হয়। কটকে বিঘাকে ইংরেজি একরের সমান গণ্য করা হয়। মারাঠী বিঘাকে ২০ পার্ত্ত বা ৪০০ বর্গ কাঠি বলা হয়। প্রতি কাঠি ৫ হাত ৫ আঙ্গুল পরিমাণ। গুজরাটী বিঘা মাত্র ২৮৪$\frac{৩}{৪}$ বর্গ গজ। মি: ইলিয়ট উত্তরের প্রদেশসমূহে ছয় রকমের বিভিন্ন বিঘার ব্যবহার লক্ষ্য করেন। উইলসনের গ্লোসারী এনসা ইসল। iii ৫১০-৫৩৯ (আল মিযান) এবং i ১০১৮ (জরির) দ্রষ্টব্য। ইলিয়ট, মেমোয়ারম ii ১৮৯ (জরির)।আর্দ্রতা অনুযায়ী ছোটবড় হতো। একে শিশিরের মধ্যে রেখে ঠকানোর জন্য আর্দ্র করা হতো, প্রায়ই ভোরবেলা যখন এটা ভিজে ছোট হয়ে যায় সে সময় ব্যবহার করা হতো এবং দিনের শেষে যখন এটা শুকিয়ে আসে তখন আবার লম্বা হয়ে যেত। প্রথমোক্ত সময়ে কৃষকদের ক্ষতি হতো আর দ্বিতীয় সময়ে রাজকীয় রাজস্ব কমে যেত। পবিত্র সম্বৎসরের ১৯ বৎসরে বাঁশ লোহার শিকল দিয়ে যুক্ত করে জরি তৈরি করা হয়। এরূপে এর ছোটবড় হয়ে বন্ধ করা হয় এবং সর্বত্র জনসাধারণ হাফ ছেড়ে বাঁচে আর অসাধুতার হাত খাট হয়ে যায়।

---

৮৬. দেখা যায় তনাব, জরিপ ও বিঘা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং একই অর্থে বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। জরিপের আদি ব্যবহার অনুযায়ী (উইলসনের গ্লোসারীর মতে) ধারণক্ষমতার

আইন-১০

বিঘা

জবিরকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এটা ৬০ গজ দীর্ঘ ও ৬০ গজ প্রশস্ত পরিমাণ ভূমি। লম্বা অথবা পাশে কম বেশি হলে এটাকে বর্গমাপে পরিণত করা হয় এবং ৩৬০০ বর্গ গজে[৮৭] পরিণত করা হয়। তাছাড়া বিঘাকে বিশভাগে ভাগ করে, প্রতি ভাগকে বলা হয় ধবশাওয়াহ। এটা আবার প্রত্যেকটি ২০ ভাগ করা এবং প্রতি ভাগকে বলা হয় বিশওয়ানশাহ। পরিমাপের সময় আর কোনো ভাগ করা হয় না। ৯ বিশওয়ানশাহ পর্যন্ত কোন খাজনা দিতে হয় না কিন্তু ১০ বিশওয়ানশাহ হলেই তা এক বিশওয়াহ ধরা হয়। কেউ আবার বিশওয়ানশাহকে ২০ ভাগে বিভক্ত করে প্রতিভাগকে বলে তপওয়ানশাহ। ইহা আবার তারা ২০ ভাগে ভাগ করে এবং এদের প্রত্যেকটিকে বলে তপওয়ানশাহ। ইহা আবার ২০ ভাগ করে প্রত্যেকটিকে বলে অনমওয়ানশাহ। শনের তৈরি তনব দ্বারা পরিমাপ করা এক বিঘা বাঁশের তনব দিয়ে মাপা বিঘা হতে দুই বিশওয়াহ ও ১২ বিশওয়ানশাহ কম হয়। এতে ১০০ বিঘার মাপে ১০ বিঘা কম হয়। যদিও শনের তনব ৬০ গজের হয় পাকানোর ফলে এটা ৫৬ এ পরিণত হয়। ইলাহী গজ ইসকান্দরী গজ হতে এক বিশওয়াহ, ১৬ বিশওয়ানশাহ, ১৩ তসওয়ানশাহ, ৮ তসওয়ানশাহ ও ৪ অনমওয়ানশাহ বেশি লম্বা। এই দুইএর তারতম্যের ফলে বিঘার মাপ ১৪ বিশওয়াহ, ২০ বিশওয়ানশাহ, ১৩ তমওয়ানশাহ, ৮ তপওয়ানশাহ ও ৪ অনমওয়ানশাহ বেশ কম হয়। একশত বিঘার এই দুই মাপে ২২ বিঘা, ৩ বিশওয়াহ ও ৭ বিশওয়াহশাহ পার্থক্য হয়।

---

৮৭. মূল গ্রন্থে ভুলক্রমে ৬০০ পরিবর্তে ৬০ দেওয়া হয়েছে। ৩৬০০ বর্গ গজ = ২৬০০ বর্গ গজ (ইংলিশ গজ) = ০.৫৩৮ বা অর্ধেক একরের সামান্য বেশি।

আইন-১১

ভূমি ও তার শ্রেণীবিভাগ এবং আনুপাতিক সার্বভৌমত্বের কর

সম্রাট যখন গজ, তনব এবং বিঘার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিলেন, তখন তাঁর সুগভীর জ্ঞানবত্তার ফলে তিনি ভূমির শ্রেণীবিভাগ করে দিলেন এবং প্রতিশ্রেণীর দেয় বিভিন্ন রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিলেন।

পোলাজ ভূমি প্রতি বৎসর আবাদ করা হয় এবং পর পর প্রত্যেক ফসল ফলান হয় এবং কখনও পতিত রাখা হয় না।

পরৌতী ভূমি উর্বরতা ফিরে পাবার জন্য কিছু সময় অনাবাদী রাখা হয়। চচর ভূমি তিন কি চার বৎসর পতিত রাখা হয়।

বনজর ভূমি পাঁচ বা ততোধিক বৎসর অনাবাদী জমিকে বলা হয়। প্রথম দুই রকম ভূমির তিন শ্রেণীবিভাগ আছে। ভাল মধ্যম ও মন্দ। তারা প্রত্যেকটির উৎপন্ন ফসল একত্র করে এর এক–তৃতীয়াংশ গড় উৎপন্ন ফসল হয় এবং ইহার $\frac{১}{৩}$ অংশ রাজকীয় প্রাপ্য হিসেবে আদায় করা হয়। শেরখান যে রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন, বর্তমানে সমস্ত প্রদেশে সর্বাপেক্ষা কম রাজস্ব নির্ধারণ বলে দাবি করা হয় যা সচরাচর আদায় করা হয়, এবং কৃষকদের ও সৈন্যদের সুবিধার জন্য তা আদায় করা হত।

বিভিন্ন ধরনের তিন বিঘার মোট উৎপন্ন ফসল পোলাজ ভূমির উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ[৮৮] বসন্তকালীন ফসলের যাকে হিন্দিতে বলা হয় আসাধী।

---

৮৮. পরবর্তী ৪টি তালিকার আদায় গ্রাডউইন হতে নেওয়া। আবুল ফজল ৪র্থ ও ৫ম ঘরে শুধু গমের হিসেব দিয়েছেন। খুদ ও ডালের বেলায় তিনি ৪র্থ ঘর এবং বাকি সবগুলির ৫ম ও ৬ষ্ঠ ঘর বাদ দিয়ে গিয়েছেন। সেরের $\frac{১}{৪}$ অংশের কম ভগ্নাংশ রাজস্বের হিসেব করতে দেওয়া হয়; $\frac{১}{৩}$ অংশ ও সব সময় হিসেব মতো ঠিক নয়, আবার ভগ্নাংশ কখনও সম্পূর্ণ সেরে ধরা হয় আবার কখনও সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়।

	সর্বোপেক্ষা উত্তম পোলাজ ভূমির ১ বিঘার উৎপন্ন ফসল	১ বিঘার মধ্যম রকমের পোলাজ ভূমির উৎপন্ন ফসল	১ বিঘার নিকৃষ্ট ধরনের পোলাজ ভূমির উৎপন্ন ফসল		আগের ঘরের ১/৩ অংশে, ১ বিঘা পোলাজ ভূমির গড় উৎপন্ন ফসল	গড় উৎপন্ন ফসলের ১/৩ অংশ নির্ধারিত রাজস্ব
	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের
গম	১৮	১২	৮ ৩৫	৩৮ ৮৫	১২ ৮৮ ১/৪	৪ ১২ ৩/৪
নুখুদ (কলাই)	১৩	১০ ২০	৭ ২০	৩১	১০ ১৮ ১/৪	৩ ১৮
মশুর	৮ ১০	৬ ১০	৪ ২৪	১৯ ১৫	৬ ১৮ ১/[illegible]	২ ৬
বার্লি	১৮ ০	১২ ২০	৮ ১৫	১৮ ৮৫	১২ ৩৮ ১/৪	৪ ১২ ১/২
তিসি	৬ ২০	৫ ১০	৩ ৩০	১৫ ১০	৫ ৭	১ ২৯

	সর্বোপেক্ষা উত্তম পোলাজ ভূমির ১ বিঘার উৎপন্ন ফসল	১ বিঘার মধ্যম রকমের পোলাজ ভূমির উৎপন্ন ফসল	১ বিঘার নিকৃষ্ট ধরনের পোলাজ ভূমির উৎপন্ন ফসল		আগের ঘরের ১/৩ অংশে, ১ বিঘা পোলাজ ভূমির গড় উৎপন্ন ফসল	গড় উৎপন্ন ফসলের ১/৩ অংশ নির্ধারিত রাজস্ব
	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের
সাফ্লাওয়ার	৮ ৩০	৬ ৩০	৫ ১০	২০ ৩০	৬ ৩৬ ১/২	২ ১২
আরজন (হিন্দীচীনা)	১০ ২০	৮ ২০	৫ ৫	২৪ ৫	৮ ১ ১/৩	২ ২৭ ১/২
সরিষা	১০ ২০	৮ ২০	৫ ৫	২৪ ৫	৮ ১ ১/৪	২ ২৭ ১/২
মটরশুঁটি	১৩ ০	১১ ০	৯ ৩৫	৩৪ ৩৫	১১ ২৫	৩ ৩৫
মেথী	১৪ ০	১১ ০	৯ ৩৫	৩৪ ৩৫	১১ ২৫	৩ ৩৫
কুর চাউল	২৪ ০	১৮ ০	১৪ ১০	৫৬ ১০	১৮ ৮০	৬ ১০

মাস্ক তরমুজ, আজওয়েন, পেয়াজ ও অন্যান্য শাকশবজি যা উৎপন্ন ফসল বলে গণ্য করা হয় না, তার খাজনা নিম্নে বর্ণিত হারে নগদ মূল্যে নির্দেশ দেওয়া হয়।

পোলাজ ভূমি শরৎকালীন ফসল হিন্দীতে বলা হয় শাবনী

	১ বিঘা সর্বোত্তম পোলাজের উৎপন্ন ফসল	১ বিঘার মধ্যম পোলাজের উৎপন্ন ফসল	১ বিঘার নিকৃষ্ট পোলাজে উৎপন্ন ফসল	বিভিন্ন রকমের তিন বিঘার মোট উৎপন্ন ফসল	উপরোক্তটির এক-তৃতীয়াংশ, এক বিঘা পোলাজের গড় উৎপন্ন ফসল	গড় ফসলের এক তৃতীয়াংশ নির্ধারিত রাজস্ব
	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের
গুড়[৮৯]	১৩ ০	১০ ২০	৭ ২০	৩১ ০	১০ ১৩ ১/২	৩ ১৮
তুলা	১০ ০	৭ ২০	৫ ০	২২ ২০	৭ ২০	২ ২০
শালি মুশকিন গাঢ় বর্ণের, ছোট দাগএর সাদা, সুগন্ধি, তাবারারি পাকে এবং খেতে সুস্বাদু	২৪ ০	১৮ ০	১৪ ১০	৫৬ ১০	১৮ ৩০	৬ ১০

শরৎকালীন ফসল হিন্দীতে বলা হয় শাবনী

	১ বিঘা সর্বোত্তম পোলাজের উৎপন্ন ফসল	১ বিঘার মধ্যম পোলাজের উৎপন্ন ফসল	১ বিঘার নিকৃষ্ট পোলাজে উৎপন্ন ফসল	বিভিন্ন রকমের বিঘার মোট উৎপন্ন ফসল	উপরোক্তটির এক তৃতীয়াংশ যা এক বিঘা পোলাজের গড় উৎপন্ন ফসল	গড় ফসলের এক তৃতীয়াংশ নির্ধারিত রাজস্ব
	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের
সাধারণ চাউল, উপরোক্ত রকমের মত উত্তম নয়	১৭ ০	১২ ২০	৯ ১৫	৩৮ ৩৫	১২ ৩৮ ১/২	৪ ১৩
মা-আশ হিন্দীতে মুগ	১০ ২০	৭ ২০	৫ ১০	২৩ ১০	৭ ৬৯	২ ২৩ ১/২
হিন্দী উরিধ (কলাই) একজাতীয়	১০ ২০	৭ ২০	৫ ১০	২৩ ১০	৭ ৩০	২ ২৩ ১/২

৮৯. ৪র্থ ও ৫ম ঘর আবুল ফজল বাদ দিয়ে গিয়েছেন।

মথ (মসুর) সাদা মুগের চেয়ে মোটা, কিন্তু কাল মুগের চেয়ে ভাল	৬ ২০	৫ ১০	৩ ৩০	১৫ ২০	৫ ৬$\frac{১}{২}$	১ ২৯
যোয়ার	১৩ ০	১০ ২০	৭ ২০	৩১ ০	১০ ১৩$\frac{১}{২}$	৩ ১৮
শসাক, হিন্দী মনওয়ান	১০ ২০	৮ ২০	৫ ৫	২৪ ৫	৮ ১$\frac{১}{২}$	২ ২৭$\frac{১}{২}$

শরৎকালীন ফসল হিন্দীতে বলা হয় শাবনী

	১ বিঘা সর্বোত্তম পোলাজের উৎপন্ন ফসল	১ বিঘার মধ্যম পোলাজের উৎপন্ন ফসল	১ বিঘার নিকৃষ্ট পোলাজে উৎপন্ন ফসল	বিভিন্ন রকমের বিঘার মোট উৎপন্ন ফসল	উপরোক্তটির এক তৃতীয়াংশ যা এক বিঘা পোলাজের গড় উৎপন্ন ফসল	গড় ফসলের এক তৃতীয়াংশ নির্ধারিত রাজস্ব
	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের	মণ সের
কোদ্রন,[৯০] (মনওয়ানের মত) কিন্তু এর বাইরের খোসা গাঢ় লাল	১০ ০	১২ ১০	৯ ১৫	৩৮ ৩৫	১২ ৩৮$\frac{১}{২}$	৪ ১২$\frac{১}{২}$
তিল	৮ ০	৬ ০	৪ ০	১৮ ০	৬ ০	২ ০
কাংগুনী	৬ ২০	৫ ১০	৩ ৩০	১৫ ২০	৫ ৭	১ ২৯
তুরিয়া সরিষাদানার মতো কিন্তু লালচে	৬ ২০	৫ ১০	৩ ৩০	১৫ ২০	৫ ৭	১ ২৯
অরজন (সাধারণত বসন্তকালীন ফসল)	১৬ ০	১৩ ২০	১০ ২৫	৪০ ৫	১৩ ১$\frac{১}{২}$	৪ ১৩$\frac{১}{২}$

৯০. ইহা কোদসা ও শদেরাস লেখা আছে। সম্ভবত কোনো এক প্রকারের ক্ষুদ্র শস্য।

শরৎকালীন ফসল হিন্দীতে বলা হয় শাবনী

	এক বিঘা সর্বোত্তম পোলাজের উৎপন্ন ফসল		এক বিঘা মধ্যম পোলাজের উৎপন্ন ফসল		এক বিঘা নিকৃষ্ট পোলাজের উৎপন্ন ফসল		বিভিন্ন রকমের তিন বিঘার মোট উৎপন্ন ফসল		উপরোক্তটির এক তৃতীয়াংশ যা এক বিঘা পোলাজের গড় উৎপন্ন ফসল		গড় ফসলের এক তৃতীয়াংশ নির্ধারিত রাজস্ব	
	মণ	সের	মণ	সের	মণ	সের	মণ	সের	মণ	সের	মণ	সের
লহদরহ (কাংপনীর মত শস্য)	১০	১০	৭	১০	৫	১০	২৩	১০	৭	৩০	২	২৩ ১/২
মনদওয়া, মনওয়ান এর মত শিম, দানা সরিষা দানার মত তবে কিছু লাল আর কিছু সাদা হয়	১১	২০	৯	০	৬	২০	২৭	০	৯	০	৩	০
লুবিয়া, সিমের মত কিন্তু সামান্য ছোট	১০	২০	৭	২০	৫	১০	২৩	১০	৭	৩০	২	২০ ১/২
কুদিরি, সানওয়ান এর মত কিন্তু আরও মোটা	৬	২০	৫	১০	৩	৩০	১৫	২০	৫	৭	১	২৯
কুল্‌ত, মসুরের মত কিন্তু আরও গাঢ়, ইহার রস উটের জন্য ভাল	১০	২০	৭	২০	৫	১০	২৩	১০	১৭	৩০	২	২০ ১/২
বরতি, সনওয়ান এর মত কিন্তু আরও সাদা	৬	২০	৫	১০	৩	৩০	১৫ ১০		৫	৭	১	২৯

কোনো কোনো স্থানে ফসল পাহারা দেওয়ার জন্য এক-চতুর্থাংশ সের (প্রতিমণে) ছেড়ে দেওয়া হয়। আবার কোনো স্থানে আরো বেশি ছাড়া হয়। যেমন নিম্নে দেখান হয়েছে।

নীল, আফিম, পান, হলুদ, সিদ্ধারা[৯১], শন, কচালু, কুমড়া, হিন্না, শসা, বাদরাঙ্গ বেগুন-গাছ, মুলা কেরট, করেলা, কাকুরা, তেন্দা[৯২] ও খযমুজা, যা ফসল রূপে গণ্য করা হয় না তার খাজানা নিম্নে বর্ণিত হারে নগদ মূল্যে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

---

৯১. ইহাকে হিংরা বা পানিফলও বলা হয়। নভেম্বর মাস ফল পাকে এবং যে ফল পাড়া হয় না, তা পরে পানির নিচে তলিয়ে যায়। মে জুন মাসে পানি শুকিয়ে গেলে দেখা যায় যে এই ফল হতে বহু শিকড় বে

পরৌতি ভূমি যখন আবাদ করা হয় তখন তাহা পোলাজের মত একই হারে খাজানা দেয়। সম্রাট তার প্রগাঢ় জ্ঞানের ফলে এইরূপ সুবিধাজনক হারে রাজস্বের হার নির্ধারণ করেন। শিল্প দ্রব্যের উপর দেয় শুল্ক তিনি শতকরা দশ হতে কমিয়ে পাঁচ করেন এবং শতকরা দুই ভাগ পাটওয়ারী ও কানুনগোর মধ্যে ভাগ করে দেন। প্রথমজন একজন লেখক, যাকে কৃষকের পক্ষে নিযুক্ত করা হয়। সে আয় ও ব্যয়ের হিসেব রাখে এবং কোন গ্রামই ইহাদের ছাড়া নাই। শেষের জন কৃষকদের আশ্রয়। প্রতিজেলায় একজন করে আছে। বর্তমান সময়ে কানুনগোর অংশ (শতকরা এক ভাগ) রহিত করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের তিন শ্রেণী মান অনুসারে রাষ্ট্র হতে বেতন পায়। প্রথম শ্রেণীর বেতন পঞ্চাশ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ত্রিশ টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর বিশ টাকা, এবং তাদের ভবন পৌছানোর জন্য একই রকম ভূমি দেওয়া হয়। নিয়ম ছিল যে শাসন বিভাগের শিকদার, কারকুন[৯৩] এবং আমীন উপরি পাওনা হিসেবে দৈনিক ৫৮ দাম করে পাবে। যদি বসন্তকালে তারা ২০০ বিঘার কম ও শরৎকালে ২৫০ বিঘার কম জরিপ না করে। সম্রাট, যার হৃদয় মহাসাগরের মত প্রশস্ত, এই প্রথা রহিত করে দেন এবং প্রতিবিঘায় এক দাম দেওয়া অনুমোদন করেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার প্রতি ধন্যবাদ প্রকাশের জন্য সম্রাট বহু শুল্ক যার পরিমাণ হিন্দুস্তানের আয়ের সমান, তাহা রহিত করে দেন। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি আছে :

মাথাপিছু কর জিজিয়া

বন্দুর শুল্ক মীর বহরী

এবাদতখানায় সমাবেশিত লোকের মাথা পিছু কর[৯৪]

প্রতি ষাড় এর জন্য শুল্ক — গা ও কমারী

প্রতি গাদের জন্য শুল্ক — সর-ই-করোঘতী

উপহার — পেশকাশ

হয়েছে। এগুলিকে তখন সংগ্রহ করে পুকুরের নিচু স্থানে গর্ত করে পানি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। বৃষ্টি হলে যখন পুকুর ভরে উঠতে থাকে তখন এগুলি তুলে নিয়ে প্রত্যেকটি শিকড় ভেঙ্গে দলা পাকিয়ে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলা হয়। যাতে তলিয়ে যেতে পারে। এ গুলি সঙ্গে সঙ্গে শিকড় গাড়ে ও দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং অল্পদিনেই পুকুর পাতায় ছেয়ে যায়। অক্টোবর মাসে ফল ধরতে শুরু করে। এক আদর্শ বিঘায় $২\frac{১}{২}$ মণ ফল হয়। এক টাকায় ১০ সের করে মূল্য ধরা হলে বিঘায় মোট ১০ টাকার ফল হয়। মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরা এই ফল অনেক বেশি পছন্দ করে।

৯২. তন্দুও বলা হয়।

৯৩. কারকুন জমিদারের অধীনে আদায়পত্রের হিসাবরক্ষক। আমীন রাজস্ববিভাগের একজন কর্মচারী তাকে হয় কোনো এলাকার রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হতো নতুবা রাজস্বের পরিমাণ তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হতো। আইন বিভাগেও আমীন নিযুক্ত হতো, দেওয়ানী মামলার বিচারক বা সালিশীকারক হিসেবে।

৯৪. মূল গ্রন্থে শব্দটা কর লেখা আছে। এইগুলিকে মূল গ্রন্থে ওয়াজুহাত বলা হয়েছে। পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের আমলে এইগুলিকে বলা হতো আবওয়ার।

ক্রোক — কুরক

বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরদের উপর কর-পেশওয়ার

দারোগার কর — দারোগানাহ

তহসিলদারের কর — তহসিলদারী

কোষাধ্যক্ষের কর — কোতাহদারী

জমি বন্দোবস্ত পাওয়া ইত্যাদি উপলক্ষে প্রশংসাংক দান — সালামী

বাসস্থানের ভাড়া — ওয়াজিহ কিরায়া

অর্থের নলি — খরিতা

অর্থ-পরীক্ষা ও বদল করা — সররাফী

বাজার শুল্ক — হাসিল-ই-বাজার

গবাদী পশু বিক্রি ; তাছাড়া সন, কম্বল, তৈল, কাচাচামড়া, ওজনকরা (হয়ালী) মাপা ; তেমনি করাইর পাওনা, চামড়া পাকা করা, পাসাখেলা[৯৫], মালপত্রের ছাড়পত্র, পাগড়ী[৯৬], চুলার কর, বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ের কর, খবক্ষয়ে যুক্ত মাটি হতেলবণ তৈরির কর, ফসল কাটার অনুমতির বলকতি, জমাট পশমী বস্ত্র, চুন প্রস্তুত, মাদক সুরা, দালালী, মাছ ধার, আল গাছের ফসল[৯৭], মোটকথায় হিন্দুস্তানের লোকের সমস্ত জিহাত[৯৮] এর মধ্যে গণ্য করে সে সমস্ত শুল্ক বাতিল করে দেওয়া হলো।

৯৫. ইহার পর দু'টি শব্দ আছে যার অর্থ বুঝা যায় না, নিঃসন্দেহে কোন শব্দ বাদ পড়ে গিয়েছে।

৯৬. শব্দটি পাগ পাগড়ীর সংক্ষেপ। প্রত্যেক পাগড়ীর উপর ধার্য এক প্রকারের কর।

৯৭. ইহা হতে এক রকম রং প্রস্তুত করা হয়।

৯৮. নোটটি স্পষ্ট নয়।

আইন ১২

চচর ভূমি

যখন অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে অথবা বন্যার ফলে ভূমি অনাবাদী থাকিয়া যায় কৃষকগণ প্রথমে ভীষণ অসুবিধায় পতিত হয়। ফলে প্রথম বৎসর উৎপন্ন ফসলের $\frac{২}{৫}$ অংশ ধরা হয় ; দ্বিতীয় বৎসর $\frac{৩}{৫}$ অংশ ; তৃতীয় বৎসর[৯৯] $\frac{৪}{৫}$ অংশ এবং পঞ্চম বর্ষে সাধারণ রাজস্ব নেওয়া হয়। অবস্থার তারতম্যে রাজস্ব নগদ মূল্যে বা উৎপন্ন ফসলে দেওয়া হয়। তৃতীয় বৎসরে শতকরা ৫ ভাগ ও প্রতিবিঘায়[১০০] ১ দাম যোগ করা হয়।

---

৯৯. মূল গ্রন্থে সম্ভবত ভুল আছে কারণ চতুর্থ বৎসর বাদ পড়িয়া গিয়াছে। গ্লাডউইন তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরের $\frac{৪}{৫}$ অংশ ধরিয়াছেন।

১০০. সম্ভবত এইখানে কিছু ভুল আছে। শতকরা ৫ ভাগ শিল্প-দ্রব্যের শুল্ক নির্ধারিত হয়। কিন্তু এখানে যেভাবে লেখা হয়েছে তাতে মনে হয় ভূমির উপর অতিরিক্ত শতকরা ৫ ভাগ কর বুঝাচ্ছে। ইহা ন্যায় সঙ্গত বলে মনে হয় না বা কারণ ও বুঝা যায় না।

আইন-১৩

বনজর ভূমি

যখন অতিরিক্ত প্লাবনের ফলে উৎপন্ন ফসলের হার অত্যন্ত কমিয়া যায়, তখন নিম্নলিখিত হারে রাজস্ব আদায় করা হয়।

বসন্তকালীন ফসল

এক বিঘা বনজর ভূমির পাঁচ বৎসরের রাজস্বের হার

	১ম বৎসর		২য় বৎসর		৩য় বৎসর		৪র্থ বৎসর		৫ম বৎসর
	মণ	সের	মণ	সের	মণ	সের	মণ	সের	
গম.............প	০	২০	১	০	২	০	৩	০	পোলাজের সমান
সরিষা ....ব	০	৫	০	২৫	০	৩৫	১	১০	
নুখুদ (কলাই)...প	০	১০	০	৩০	১	১০	২	১০	
ঐ.............ব	০	৫	০	৩০	১	১০	২	১০	

দ্রষ্টব্য : প দ্বারা প্লাবিত ভূমি এবং ব দ্বারা বৃষ্টি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি বুঝায়।

বসন্তকালীন ফসল

এক বিঘা বনজর ভূমির পাঁচ বৎসরের রাজস্বের হার

	১ম বৎসর		২য় বৎসর		৩য় বৎসর		৪র্থ বৎসর		৫ম বৎসর
	মণ	সের	মণ	সের	মণ	সের	মণ	সের	
বালি............প	০	২০	১	০	২	০	৮	০	পোলাজের সমান
ঐ ....ব	০	৫	০	৩৫	১	২০	২	২০	
মটর ....প	০	১০	০	৩০	১	১০	৩	৩০	
ঐ ....ব	০	৫	০	৩০	১	১০	১	৩০	
যব (সিলেট).....প	০	১০	০	২৫	০	৩৫	১	০	
ঐ ....ব	০	৫	০	২৫	০	৩৫	১	০	
তিসি ....প	০	১০	০	২০	০	৩০	১	১০	
ঐ ....ব	০	৫	০	৫	০	৩০	১	১০	

দ্রষ্টব্য : প দ্বারা প্লাবিত ভূমি এবং ব দ্বারা বৃষ্টি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ভূমি বুঝায়।

শরৎকালীন ফসল

এক বিঘা বনজর ভূমির পাঁচ বৎসরের রাজস্বের হার

	১ম বৎসর		২য় বৎসর		৩য় বৎসর		৪র্থ বৎসর		৫ম বৎসর
	মণ	সের	মণ	সের	মণ	সের	মণ	সের	
মাস ....প	০	২০	১	০	১	২০	২	১০	পোলাজের সমান
ঐ ....ব	০	৫	০	২০	১	০	১	২০	
যোয়ার.........প	০	২০	১	০	২	০	৩	০	
ঐ ....ব	০	৫	০	২০	১	০	২	০	
মথ ....ব	০	৫	০	২০	০	৩০	১	১০	
লহদারাহ ......ব	০	৫	০	২০	১	১০	২	০	
কোদ্রন ....প	০	২০	১	০	২	০	৩	০	
ঐ ....ব	০	৫	০	২০	১	২০	২	১০	
সনদওয়াহ ....প	০	২০	১	০	২১	০	৪	০	
ঐ ....ব	০	৫	০	৩০	১	১০	২	১০	

শরৎকালীন ফসল

এক বিঘা বনজর ভূমির পাঁচ বৎসরের রাজস্বের হার

	১ম বৎসর		২য় বৎসর		৩য় বৎসর		৪র্থ বৎসর		৫ম বৎসর
	মণ	সের	মণ	সের	মণ	সের	মণ	সের	
কুদিরি ....প	০	১০	০	২৫	০	৩৫	১	১০	পোলাজের সমান
ঐ ....ব	০	৫	০	২৫	০	৩৫	১	১০	
কাদ্দনী (ফারসীকান) প	০	১০	০	২৫	০	৩৫	১	১০	
ঐ ....ব	০	৫	০	২৫	০	৩৫	১	১০	
তুরিখা ....প	০	২০	১	০	১	১০	১	২০	
ঐ ....ব	০	৫	০	২৫	০	৩৫	১	১০	
সনওয়াক (ফারসী সমাব) প	০	১০	০	২৫	০	৩৫	১	১০	
ঐ ....ব	০	৫	০	২৫	০	৩৫	১	১০	
অরজন ....প	০	১০	০	৩০	১	০	১	১০	
ঐ ....ব	০	৫	০	৩০	১	০	১	১০	
তিন ....ব	০	৫	০	২০	০	৩০	১	১০	

চতুর্থ বৎসরে শতকরা ৫ ভাগ এবং প্রতি বিঘায় এক দাম আদায় করা হয় এবং এই ব্যবস্থা এখনও চালু আছে। বনজর ভূমিতে প্রথম বৎসরে প্রতিবিঘার জন্য এক বা দুই সের নেওয়া হয় ; ২য় বৎসর ৫ সের, ৩য় বৎসর উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠমাংশ ; চতুর্থ বৎসরে এক চতুর্থাংশ ও এক দাম ; অন্যান্য বৎসরে এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। প্লাবনের সময় ইহার কিছু ব্যতিক্রম হয়। সকল ক্ষেত্রেই কৃষক নিজের সুবিধামতো নগদ মূল্যে বা ফসলে রাজস্ব আদায় করতে পারে। পাহাড়ের পাদদেশের বনজর ভূমি এবং সম্বল ও বাহ রাইন জেলার সচরাচর প্লাবিত ভূমি বনজর ভূমি রূপে গণ্য করা হয় না ; কারণ প্লাবনে এত পলিমাটি আনয়ন করে যে এইসব জমি পোলাজের চেয়েও উর্বরা হয়। কিন্তু সম্রাট তার মহানুভবতার জন্য ইহাকে একই শ্রেণী ভুক্ত করেন। কৃষকের ইচ্ছানুযায়ী সে নগদ মূল্যে বা কানকুল বা ভাওলীতে খাজানা পরিশোধ করতে পারে।

আইন-১৪

উনিশ বৎসরে হার[১০১]

বুদ্ধিমান লোকেরা সময় সময় সাম্রাজ্য চালু দ্রব্যমূল্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখেন এবং অতি সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া এই ভিত্তিতে শস্যের এ মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

এক বিঘা পোলাজ ভূমির রাজস্বের হার বর্ণিত রূপে নির্ধারিত করা হইয়াছে। পবিত্র সম্বৎসরের ৬ষ্ঠ বর্ষ হইতে যা নবীচান্দ্র বৎসর ৯৬৮ (১৫৬০-১ খৃ.) সমান, রাজত্বের ২৪ বৎসরের শেষ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তা অত্যন্ত সতর্কভাবে পরীক্ষা করবার পর তাহার সুসংবাদ তালিকা প্রস্তুত করা হয়। সংখ্যাগুলি প্রতিবৎসরের অধীনে দেখান হয়েছে।

আগ্রা সুবায় বসন্তকালীন ফসল–উনিশ বৎসরের মূল্য তালিকা

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর	১৪ বৎসর
গম	৯০ দাম	৮০–৯০ দাম	৯০ দাম	৫০–৬০ দাম	৫৬–৬০ দাম	৫৬–৬৪ দাম	৫৬–৬০ দাম	৫২–৬০ দাম
কাবুলী কলাই	...	...	...	...	...	...	...	...
দেশী কলাই	৮০	৭৬–৮০	৮০	৪৪–৫৬	৪৪–৫৬	৪৪–৫৬	৪৪–৫৬	৩২–৪০
বার্লি..........	৮০	৬০–৭০	৬০	৩৮–৫০	৩৮–৫০	৪০–৫২	৪০–৫৪	৩৬–৪০
খাদ্যাদি সুগন্ধিকারী লতাপাতা ...	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০
আফিং	১৬০	১৬০	১৬০	১৪০	১৪০	১৪০	১৪০	১৪০
সাফ্লাওয়ার	২০ সের	২০ সের	২০ সের	৮০ দাম	৮০	৮০	৮০	৭০–৭৬
তিসি.......			৮০ দাম	৬০–৮০	৬০–৮০	৬০–৮০	৬০–৮০	৫০–৫৬
সরিষা	৮০ দাম	৮০	৮০	৬০–৮০	৬০–৮০	৬০–৮০	৬০–৮০	৫০–৫৬

১০১. ১৯ বৎসর চন্দ্রের এক চক্রের সমান, যে সময়ে ঋতুর সময় একবার সম্পূর্ণ ঘুরে আসে বলে মনে করা হয়।

আগ্রা সুবার বসন্তকালীন ফসল উনিশ বৎসরের মূল্য তালিকা

১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎশর	১৮ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
৩৮–৪৮ দাম	৩৬–৫২ দাম	৩৬–৭৪ দাম	৪৩–৫৪ দাম	১২–৫০ দাম	৪০–৫৮ দাম	৪২ ১/২ – ৮০ দাম	৬৪–৯৪ দাম	৪০–৫৮ দাম	৫২–১১৬ দাম
৩৩–৫৭	৩৩–৫৭	৩৩–৫৭	৩৩–৫৭	৩৩–৫৭	৩৩–৫৭	৩৩–৫৭	৩৩–৫৭	২৬–৫২	৫০–৮৫
২০–৩৮	২০–৩০	২০–৪৮	১৯–২৮	১৯–২০	২১–৩৮	১৯–৪৪ ১/২	২৬ ১/২–৪০	২২–৩৭	৪০–৮৬
২১–২৮	২১৩৪	২১–৫৪	২৮–৮০	২০–৪০	২৬–৪০	২৮–৫২ ১/২	৩৬–[illegible]	[illegible]৩–৩৬	৪০–৯০
৫২–৬০	৫০–৭০	৫০–৬০	৪০–৫৪	৪০–৬০	৪৪–৬২	৪৪–৬০	৪৪–৬০	৪৬–৬০	৪৬–৬০
১–৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০
৬০–৭০	৬০–৭০	৫২–৭০	৫০–৭০	৪০–৭৩	[illegible]–৭৩	৫৪–৭৩	৫৪–৭৩	৫৪–৭৩	৫৪–৭৩
২৪–৩০	১৮–৩০	১৮–২৪	২৩–২৬	[illegible]	২৪–২৬	১৬–৩৪ ১/২	১৬–৩৪উে (১,২)	১৮–২৬	২৪–৪২
২২–৩০	২০–৩০	২৪–৩২	২২–৩০	২২–২৬	১৯ ১/২–৩০	১৯–৩২	২০ ১/২–৩২	১৮ ১/২–২৬	৩০–৪৮

আগ্রা সুবার বসন্তকালীন ফসল–উনিশ বৎসরের মূল্য তালিকা

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর	১৪শ বৎসর
আদছ (সীম) ..	৬০	৬০–৬৮	৫০	৩২–৫০	৩২–৫০	৩২–৫০	৩২–৫০	২৬–৩২
অরজন (সিলেট)	৪৪	৪৪	২০	৩০	৩০	৩০	৩০	২৬–২৮
মটরশুটি	...	৬৮	...	...	...	...	৪৪	১৫–২৬

পারস্য খরমুজ	...	...	...	...	...	...	...	১২০
দেশী "	১০	১০	...	...	৮	৮	৮	১৬
কুর চাউল	৬০	৬০	৬০	৫০–৬০	৫৪–৬০	৬০	৫৪–৭০	৪০–৫৪
আজওয়েন	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৭০
পেয়াজ	...	...	...	...	...	...	...	...
ফেনুগ্রীক	...	...	...	...	...	...	...	...
গাজর	১ মণ	১ মণ	১ মণ	...	...	...	...	...
লেটুস	...	...	...	...	...	...	...	...

দ্রষ্টব্য এইসব তালিকার দ দ্বারা দাম ও জ দ্বারা জিলি বুঝান হয়েছে।

১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
১৫–২৪ ১/২	১৫–২৮	১৫–৩০	১৫–২২	১৫–২৩	১৭–২৫	১৬–৪০	১৬–২০ ১/২	১৬–২৪	২৫–৩০
১৪–২০	১৫–২২	১৫–২৪	১৪–১৮	১৪–১৭	১৬–[illegible]	১১ ১/২–২৫	১২ ১/২–২৪	১২–২৪	১৬–৩৪
১৫–৪২	১৫–৪২	১৫–৪২	১৯–২৪	১৭–২৮	১৭–৩০	১৭–৩০	১৭–৩০	১৮–২৮	৩২ ১/২–৫৬
৮৬–১২০	৮৬–১২০	৮৬–১২০	৮৬–১২০	৮৬–১২০	৮২–১২০	৮২–১২০	৮২–১২০	৮২–১২০	৮২–১২০
১৬	১৫–১৬	১৫–১৬	৮–১৬	১৫–১৬	১৫–১৬	১০–১৬	১২–১৬	১২–১৬	১২–১৬
৩৬–৪৮	৩৬–৪৫	৩৬–৫৪	৩২–৫০	৩২–৪২	৩২–৫৪	৩৪–৫৬	৩৪–৪৮	৩৪–৪৮	৫০–৭০
৭০	৭০–৯০	৭০–৭১	৬০–৯০	৭০	৫০–৪০	৭০–৯০	৭০–৯০	৭০–৭৪	৭২–৭৪
১৭–৭৩	৫৪–৭০	৭০–৭৩	৭০–৭২	৭২–৮০	৭২–৮০	৭০–৮০	৭০–৮০	৭০–৮০	৭০–৮০
৭০	৭০	৫০–৭০	৪০–৭০	৭০	৫০–৮০	৬০–৭০	২৮–৮০	৩২–৮০	৪০–৮০
২০–৩০	২০–৩০	২০–২৮	২০–৪০	২০–৪০	১৬–২৬	১৬–২৬	১৮–২৫	১৮–২৫	২২–৪০
২৪–২৫	২৪–২৫	২৪–২৫	২৪–২৫	২৪–২৫	২৫	২৫	২৫	১৬	১৬

আগ্রাহ সুবার শরৎকালীন ফসল

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
গেণ্ডারী (পৌন্দ)				১৮০–২০০	১৮০–২০০	১৮০–২০০	১৮০–২০০
সাধারণ গেণ্ডারী	১৮০	১৮০	১৮০	১৪০–১৬০	১৪০–১৬০	১৪০–১৬০	১৪০–১৬০
শালী মুশকিন কাল বর্ণের চাউল				৭০–৮০	৭০–৮০	৭০–৮০	৭০–৮০
সাধারণ চাউল	৭০	৭০	৭০	৬০	৫২–৬০	৫২–৬০	৫৬–৬৫
মুনজি চাউল	...	...	...	...	...	...	...
তুলা	১২০	১২০	১৩০	১১০	১১০	১১০	১১০
সুগন্ধি লতাপাতা (ধনে পাতা ইত্যাদি)	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০
তিলবীজ	৬০	৬০	৮০	৭০	৭০	৭০	৭০
মথ মসুর	৪৮	৪৮	৫৪	৩৬–৪৪	৪০–৫০	৪০–৪৮	৩০–৩৬
মাশ	৪৮	৪৮	৫৪	৩৬–৪৪	৪৪	৪৪–৫০	৪০–৪৪

১৪শ বৎসর	১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
১৮০–২০০	১৫০–২০০	১৫০–২০০	১৮০–২০০	১৭০–২০০	১৬০–২০০	১৮০–২০০	১৮০–২০০	১৮০–২০০	১৮০–২০০	১৮০–২০০
১৩৪–১৫৪	১১২–১৭৪	১০০–১৫০	৯০–১৩৪	৯৬–১৩৪	৯৬–১৩৪	৯৪–১৩৯	১০৪–১৭০	১০০–১৪০	৭৬–১০০	৮৮–১২৬
৬৪–৭০	৫২–৬৪	২৯–৭৪	৪০–৬৪	৫২–৭০	৪২–৭০	৪৭–৮৭	৪৭–৮০	৪৭–৮০	৫৬–৮০	৬০–৮০
৪৪–৫২	৩৬–৪৫	৩৬–৫২	৩৬–৪৫	৩৬–৪২	৩৪–৫০	২৯–৫০	২৫–৫৮	৪০–৭৪	৩৮ ১/২–৬৬	৪৬–৪৮
	৪৮	৪৮–৬৫	৪৮–৬৫	৪৮–৬৫	৪৮–৬৫	৪৮–৬৫	৪৮–৬৫	৪৮–৬৫	৪৮–৬৫	৪৮–৬৫
৭০–৯২	৯০	৮৫–৯০	৭০–৯০	৬২–৯০	৭০–৯০	৫৯–৯৪	৭৬–১০১ ১/২	৬০–৯০	৪৪–৫৮	৪৪–৬০
৮০	৭০	৭০	৬০–৭০	৫০–৭০	৫০–৭০	৬০–৭০	৬০–৮০	৬০–৮০	৫৬–৭০	৫৬–৭৬

৬০–৬৪	৫০	৫০	৪০–৫০	২৮–৫০	২৫$\frac{১}{২}$–৫০	২১–৩৮	২১-৩২$\frac{১}{২}$	১৯–৩৬$\frac{১}{২}$	২৪–৩৭	১০$\frac{১}{২}$–৪২
২০–২৮	১৯–৩৬	১৯–২৬	১৪–২২	১৮–২৩$\frac{১}{২}$	১৬–২১	১০$\frac{১}{২}$–২৫	১৯–২৬	১৩–২১	১৩–২৫	১৬$\frac{১}{২}$–৩২
৩২–৩৬	২৮–৩২	২৫$\frac{১}{২}$–৩২	২৬–৩২ দ ও ১৮	২৫–৩৬	২২–৪০	২৫$\frac{১}{২}$–৪৫	২২–৪০	২২–৩৯$\frac{১}{২}$	২৭–৪৭$\frac{১}{২}$	২৬$\frac{১}{২}$–৫০

আগ্রাহ সুবার শরৎকালীন ফসল

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
মুগ	৪৮	৪৮	৪৮	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪
যোয়ার	৫০	৫০	৬০	৪০–৪৮	৪০–৪৮	৪০–৪৮	৪০–৪৮
লহদারাহ	৪৮	৪৮	৪৮–৫০	৩৬–৪৪	৩৬–৫০	৩৬–৪৪	২০–২৪
লোবিয়া	...	...	...	...	...	...	...
কাদরম	৪৪	৪৪	৫০	৪৪	৪০–৪৪	৪৪–৪৮	৩০–৩৬
কোরি	৪০	৪০	৪০	২৪	২৪	২৪	২৪
শামাখ	৩৬	৩৬	৫০	২৬–৩০	২৬–৩০	৩০–৩৬	২৬–৩৪
গাল (এক প্রকারের যব)	৪৪	৪৪	৫০	৩৬–৪০	৩৬–৪০	৪০	৪০
অরজজ (যব)	৪৪	৪৪	৫০	৩০–৪০	৩২–৪০	৩৬–৪০	৩৬–৪০
সনদওয়াহ	৪৮	৪৮	৫০	৩–৪০	৩২		

১৪শ বৎসর	১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
৩২–৪০	৩২–৪০	৩২–৪০	৩২–৪০	২৬–৪০	২২–৩৪	২৭$\frac{১}{২}$–৪৮	২২–৬৫$\frac{১}{২}$	২২–৫০	২৭–৪৪	৩২–৫০
৩০–৪০	২৬–৩০	২৪–৩৮	২৪–৩০	২৪–৩৪	২২–৩৪	২০–৩৪$\frac{১}{২}$	২২$\frac{১}{২}$–৪৬$\frac{১}{২}$	২৬–৪৭	৩৪–৪৮	৩৪–৫৩

২০–৩৬	২০–২৪	২০–৩৬	১৮–২৪	১৮–২৪	১৭–৩১ ১/২	১৭–৩১ ১/২	১৮–৩৩	১৮–৩৩	২০–৩০	২৪–৪০
	২০–৩২	১৫–৪২	২০–৩২	১৪–৩২	১৯–৩২	১৯–৩৭	১৬–৩৬ ১/২	২০–৩৬ ১/২	১৯–২৭	২২–৩৭
২০–২৩	২০–৩২	২১–২২ ১/২	১৯–২৪	১৬–৩২	১৮ ১/২–৩৫	১৮ ১/২–৩৫	২১–৪১	২১–৪২ ১/২	২১–৩৯ ১/২	২৪–৫০
১৬–২০	১০–২৩	৮–২৩ ১/২	৮–২৬	১০–২৬	৭–২৩ ১/২	৫–২৩ ১/২	৫–২৩ ১/২	৭–২৩ ১/২	৭–২০	৭–২৩
১৮–২০	১০–১২	১০–২০	১০–১২	৭–১২	৮–১৬	৬ ১/২–১৫ ১/২	৬ ১/২–১৪	৭–১৭	৭–১৩	৯–১৪
২১–২৮	১৩–১৪	১৩–২৮	১৩–১৪	১৩–১৪	৮–১৪	৯–১৭	৭–২৩	৮ ১/২–২৩	৮ ১/২–১৮ ১/২	১২–১৮
৩৪–৩৬	১৫–২৫	১৫–৩৬	১৫–২৪	১৫–৩৬	১৫–[illegible]	[illegible]–২৪	১৩–২৪	১২–২৮	১২–২৮	১২–২৬

আগ্রাহ সুবার শরৎকালীন ফসল (ক্রমশ উনিশ বৎসরের মূল্য তালিকা)

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর	১৪শ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
নীল	১৪০	১৪০	১৬০	১৪০	১৪০	১৩০	১২৬–১৩০	১২৬–১৩৬
শন	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৭০–৮০
তুরিয়া	৮০	৮০	...	...	...	...	...	...
হলুদ	...	...	...	...	...	...	...	...
কাচালু	...	...	...	...	...	...	...	...
কুলত	...	...	...	...	...	...	...	...
হিন্না	...	...	...	...	...	...	...	...

তরমুজ	...	...	...	...	...	...	...	...
পান	...	...	...	...	...	...	...	...
সিঙ্গারা	...	...	...	...	...	...	...	...

১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
১২৪–১৩২	১১৬–১৪০	১১৬–১৩৬	১৩০–১৬০	১৩৬–১৪০	১৩৬–১৪০	১৩৭–১৪০	১৩০–১৪০	১৩৬–১৪০	১৩৬–১৪০
৭০–৭৬	৭০–৭৮	৭০–৭৬	৬০	৬০–৭৬	৭০–৭৬	৭৪–৭৮	৬৮–৮০	৬০–৮৪	৬০–৮৪
৩২–৪০	৩০–৪০	৩২–৪০	২৪–৪০	২৩ $\frac{১}{২}$–৩২	২৯–৪০	১৭ $\frac{১}{২}$	১৭ $\frac{১}{২}$–৪০	২৩–৪০	২৩–৪০
১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
৭০	৭০	৬০–৭০	৫৪–৭০	৫৪–৭০	৬০–৭০	৬০–৭০	৬০–৭০	৬০	৬০
২৮	২৬	২৬	২২	২২	২৮	২৪	২৪	২০	২৬
৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৬০–৭০	২৪	৫৩–৭২	৫৮	৫৩
১০	১০	১০–১২	৯–১১	৯ $\frac{১}{২}$–১৫	১০–১৩	১০–১৩	১০–১৩	১০–১৩	১০–১৪
১৮০	...	...	...	...	...	...	...	...	...
১০০	...	...	...	...	...	...	...	...	...

এলাহাবাদ সুবার বসন্তকালীন ফসল উনিশ বৎসর মূল্য তালিকা

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর	১৪শ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
গম	৯০	৯০	৯০	৬০–৬৪	৮০–১০০	৮০–১০০	৭০	৬২
কাবুলী কলাই	...	...	...	...	...	...	...	...
দেশী	৮০	৮০	৮০	৫৬–৬৪	৭৬–৯০	৭৬–৯০	৭৬–৯০	৭৬–৯০
বার্লি	৭০	৮০	৮০	৮০–১২০	৮০	৮০	৮০	৭০–৭৬

সুগন্ধি লতাপাতা	৮০	৮০	৮০	৮০–১২০	৮০	৮০	৭০–৭৬	৬০–৭০
আফিং	১৬০	১৬০	১৬০	১৪০	১৪০	১৪০	১৪০	১৩০
সাফ্লাওয়ার	১/২ মণ	১/২ মণ	১/২ মণ	৭০–৮০	৮০	৮০	৮০	৭৬
তিসি	৮০	৮০	৮০	৭০–৮০	৮০	৮০	৮০	৬৪
সরিষা	৮০	৮০	৮০	৭০–৮০	৮০	৮০	৮০	২০–২৬

১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
৪৮–৭০	৪২–১০০	৪২–১০০	৪৮–৭০	৪০–৭০	৪২ ১/২–৬৩ ১/২	৪৮ ১/২–৮৬	৬২ ১/২–৮৬	৪০–৬২	৪০–৭৫
৩৮–৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৩৩–৫০	৩৩–৫০	৩৩–৭৫	২৬–৭৫	৪০–৬৩ ১/২
২৪–৭০	১৮–৪০	৩২–৪৫	২০–৪৫	২০–৪৫	৩০–৭৪ ১/২	৪৮ ১/২–৫৭ ১/২	৩৩–৫০	২২ ১/২–৪৪	২৪–৪৩
৫০–১০৬	৫০–১০০	৫০–১০০	৪০–১০০	৪০–১০০	৪০–১০০	৪৪–৬০	৪৬–৬০	৪৩–৬০	৩৭–৬০
৪৪	২৮–৭০	৩২–৫০	৩০–৫২	২১–৫০	২২–৫০	২২ ১/২–৪৭	৪৫–৮৩	৩৮–৫৬	২৪–৫৬
১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০
৬০–৭০	৬০–৭০	৬০–৭০	৫২–৭০	৫০–৭০	৪৩–৭০	৫৬–৭০	৫৬–৭০	৫৬–৭০	৫৬–৭০
৩০–৮০	২৬–৬৪	৩০–৬৪	১৮–৬৪	২০–৬৪	২২–৩১	২৩–২৮	২০–২৮	১৮–২২	১৮–২৪
৩০–৮০	২৬–৪৪	২৬–৪৪	২২–৪৪	২৪–৪৪	২৫–৪৩	২৬ ১/২–৪৬ ১/২	২৮–৩৬	২২–৩০	২২–৪৪

এলাহাবাদ সুবার বসন্তকালীন ফসল উনিশ বৎসর মূল্য তালিকা

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর	১৪শ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
আদছ—	৬০	৬০	৫০	৪০-৫৪	৫৪-৬০	৫৪-৬০	৫৪-৬০	৪২
অরজন—	৪৪	৪৪	২০	৩০	৪০	৩০-৪০	২৬-৩৬	১৯-৩৬
মটরশুঁটি—								১৫-৬০
পারস্য খরমুজ								১২০
দেশী—	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০-১২
কুর চাউল—	৬০	৬০	৬০	৬০	৫৪-৮০	৬০	৬০-৭০	৪০-৬০
আজওয়েন—	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০
পেয়াজ—								
ফেনুগ্রীক—								
গাজর—	১ মণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

	১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
	১৭-৬০	১৮-৪০	২৪-৪০	১৫-৪০	১৫-৪০	১৮-৪৩	২৪-৩৬	২১-৩৫$\frac{১}{২}$	২৫-২৮	১৭-৩৭-৩৮$\frac{১}{২}$
	১৭-৩৬	১৭-৩৬	১৪-৩৬	১৬-৩৬	১৬-২৩	১৪-২৩	১৬-২৩	১৪-২৩	১৪-২৩	১৪-৩০$\frac{১}{২}$
	১৮-৪৩	১৭-৪০	১৪-৪০	১৫-৪০	১৭-৩৪	১৭-৪৪	১৭-৪৪	১৭-৪৪	১৭-১৮	১৮-৪১$\frac{১}{২}$
	১২০-১৬০	১২০-১৬০	১২০-১৬০	৮০-১৬০	৬৬-১৬০	৪৩-১৬০	৮৬-১২০	৮৬-১২০	৮৬-১২০	৮৬-১২০
	১২-১৬	১২-১৬	১২-১৬	৮-১৬	৯-১৬	১২-৪০	১২-১৬	১২-১৬	১২-১৬	১২-১৬
	৪৪-৪৬	৪০-৪৮	৪০-৪৮	৩৬-৪৬	৩৮-৪৬	২২-৪২	৩৬-৪২	৩২-৪২	৪০-৪২	৪২-৫০
	৭০-১০০	৭০-১০০	৭০-১০০	৬০-১০০	৫২-১০০	৫২-৭০	৫২-৭৩	৭০-৭৩	৫২-৭৩	৫২-৭৩

৭০–১০০	৭০–১০০	৭০–১০০	৭০–১০০	৭০–১০০	৭০–৭৬	৬২–৭৬	৭২–৭৬	৭২–৭৬	৭০–৯৫$\frac{১}{২}$
৩৬–৭০	৩৬–৭০	৩৬–৭০	৩৬–৭০	৩৬–৭০	৫০–৫৩	৫২–৭২	৫২–৭২	২৮–৪০	৪০–৮০
২৪–৩০	২৪–৩০	২৪–৩০	২৪–৩০	২০–৪০	২০–৩২	২০–২৬	১০–২০	১৪–১৫	১৬–২৪

এলাহাবাদ সুবার বসন্তকালীন ফসল উনিশ বৎসর মূল্য তালিকা

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর	১৪শ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
লেটুস								
গেণ্ডারী পৌনদা					২০০	২০০	২০০	২০০
সাধারণ গেণ্ডারী	১৮০	১৮০	১৮০	১৮০	১৮০	১৮০	১৮০	১৭০–১৮০
শালি মুশকিল চাউল				৮০	৮০	৮০–৯০	৮০	৮০
সাধারণ চাউল	৭০	৭০	৭০	৬০	৮০–৯০	৮০–৯০	৭০	৪৮
মুনজি চাউল								
তুলা সুগন্ধি	১২০	১২০	১৩০	১১০	১২০	১২০	১২০	৯৬
লতাপাতা (তেজপাতা)	৭০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০
তিলবীজ	৬০	৬০	৮০	৭০	৮০	৮০	৮০	৬৪
মথ (মসুর)	৪৮	৪৮	৫৪	৪৪	৫৪–৭০	৫০	৫০	৩৬

১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
২৪	২৪	২৪	২৪	২৫	২৫	২৫	২৫	১৬	২৫
২০০	২০০	২০০	২০০	১৭০–২০০	১৬০–২০০	১৮০–২০০	১৮০–২০০	১৮০–২০০	১৮০–২০০

১৭৪–১৮০	১০০–১১৪	৮৬ ১/২–১০২	১০০–১২০	১০০–১৩০	৮৬ ১/২–১৩৪	৮৬ ১/২–১৬৫ ১/২	৮৬–৭০	৮৬–৭০	৭০–১২৬
৫৬–১০০	৫৬–৭৬ ১/২	৫৬–৭৬	৫৬–৭৬	৫০–৭৬	৫৪ ১/২–৭৭	৪৯–৭৭	৪৯–৭৭	৫৬–৭৬	৫৬–৭৬
৩৬–৮০	৩৬–৫০	৩৬–৫৭ ১/২	৩৪–৫৭ ১/২	৩৭–৫৭ ১/২	৩৭–৫৮	৪২–৫৯	৪০–৫০	৩৬–৪৪	৩০–৬১
৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৬০	৪৪ ১/২	৬৫	৬৫	৬৫
৯০–১২০	৯০–১২০	৭০–১২০	৭০–১২০	৭০–১২০	৭০–১২০	৭০–১২৩	৮০ ১/২–১০২ ১/২	৭০–১০২ ১/২	৫০–৭০
৭০	৭০—১০০	৬০–১০০	৫০–১০০	৫০–১০০	৬০–৯৪	৬০–৯৪	৬০–৯৪	৬০–৮৬	৬০–৯৯ ১/২
৫০–১০০	৩৯–৫০	৩৯–৫০	২৮–৪০	২৮–৪০	২২ ১/২–৩৮	২২–৩২	২৪–৩২	২৪–৫২	২৪–৪৬
২২–৬০	২৯–৪৬	২২–৪৬	২০–৪৬	১৮–৪৬	১৩–৩০	২২–২৮	১৬ ১/২–২০	১৬–২৭	১৬ ১/২–২৮

এলাহাবাদ সুবার বসন্তকালীন ফসল উনিশ বৎসরের মূল্য তালিকা

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর	১৪শ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
মাশ	৪৮	৪৮	৫৪	৪৪	৫৪–৭০	৫০	৪৮	৩৬
মুগ	৪৮	৪৮	৪৮	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪
যোয়ার	৫০	৫০	৬০	৪৮	৬০	৪৮	৪৮	৪০
লহদারাহ লুবিয়া	৪৮	৪৮	৪৮	৪৪	৫০–৫৬	৫০–৫৬	৫০–৫৬	৪০–৫৬
কোদরম	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪–৬৪	৫৪–৬৪	৫৪–৬৪	৩৬

কোরি	৪০	৪০	৫০	২৪	৩০	৩০	৩০	২০
শমাখ	৩৬	৩৬	৫০	৩০	৩৬	৫৪	৩৬–৫৪	৩০
গাল	৪৪	৪৪	৫০	৪০	৫০–৫৬	৫০–৫৬	৫০–৫৬	২৮

১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
২৮–৭০	২৮–৪২	২৮–৪২	২৪–৪২	২৫–৪২	২৭–৪৪	২১–৪৪	২১–৪০	২৪–৪৫	২৪–৪৫
৩২–৭২	৩২–৪৬	৩২–৪৬	৩০–৪৬	৩৮–৪৬	৩২½–৪৮	২৮½–৫৬	৩৪–৫৬	৩০–৫০	২৬–৫৬
২৬	২৬	২৬	২৬–২৭	২২–২৬	২৯–৪৬½	২২½–৫৪	৩০–৫৪	৩২–৪০	২৪–৪৪
২০	২০	২০	২০–২২	১৬–৪০	২০–৪৮	২০–৪৮	২০–৪৮	২৪–৪০	২৩–৬১
৫৬	৪২	৩২–৪২	৩২–৪২	৩২–৪২	২১–৪৮	৩৪–৪৪½	২৮–৫৮	২০–৩৬½	২০–৪৪
২১–৬০	২১–৩৩	২০–৪৪	২০–২২	১৬–৩৬½	২০½–৩৮	২৬–৪৮	৩১–৪৮	২২–৩০	২১–৩৯½
১০	১০	১০	১০	৭–২২	৭–১৪	৭–১৪	৭–১৪	১০	৭–১৪
৩০	২০	১০–৪০	১০–২২	১০–২২	৭–২২	৮–২২	৭–১৪	১০½–১৮	১০–১৭
১৮–৪৪	১৩–১৪	১৮–২৪	১০–২৪	৮–২৪	১০½–২১½	১৫–২৩	১৫–২৩	১৪½–২৪	১২–২২½

এলাহাবাদ সুবার বসন্তকালীন ফসল উনিশ বৎসরের মূল্য তালিকা (পূর্বানুক্রমিক)

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর	১৪শ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
আরজাহ	৪৪	৪৪	৫০	৪০	৪০	৪০	৪০	৩৬

সন্দওয়াহ	৪৬	৪৮	৫০	৪০	৪০	৫২–৫৬	৫২–৫৬	৩৪
নীল	১৪০	১৪০	১৬০	১৪০	১৪০	১৪০	১৪০	১৩৬
শন	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৭৭
তুরিয়া	৮০	৮০	৮০					
হলুদ								
কাচালু								
কুল্‌ত								
হিন্না								
তরমুজ								
পান								
সিঙ্গারা								
অরহর								

১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
২০–৩৬	২০–৩৬	২০–৩৬	২০–৩৬	১৬–৩৬	২০–৩৮	১৪–২৮	১৪–২৮	১৪–২৮	১৪–৩০
২২–৫৬	২২–২৯$\frac{১}{২}$	২২–২৯$\frac{১}{২}$	১৭–২৯$\frac{১}{২}$	১৩–২৯	১৯–৩৯$\frac{১}{২}$	২৫–৩২	২৫–৩২	২২–২৮	১৮–২৮
১৫০–১৬০	১৩০–১৬০	১২০–১৮০	১৩০–১৬০	১৩০–১৮০	১৩০–১৪০	১৩২–১৪০	১৩২–১৪০	১৩২–১৪০	১২৩–১৬০
৭০–১২০	৭০–৮০	৭০–৮০	৭৬–৮০	৭৬–৮০	৭৬–৮৮	৬০–৯০$\frac{১}{২}$	৮০	৮০	৮০
৩২–৮০	৩২–৪৪	৩২–৪৪	২৪–৪৪	২৪–৪৪	৩২–৪০	২৬–৪০	২৬$\frac{১}{২}$–৪০	২৬$\frac{১}{২}$–৪০	২০$\frac{১}{২}$–৪০$\frac{১}{২}$
১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
৭০	৭০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০
২০	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	২৪	২৫	২৪	১৮	২৯$\frac{১}{২}$

৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৬০-৮০	৬০-৮০	৬০-৮০	৬০-৮০	৬০-৮০
১০-১২	১০-১২	১০-১২	১০-১২	১০$\frac{১}{২}$-১২	১০-১৪	১০-১৪	১০-১৪	১০-১৪	১০-১৪
১৮০	১৮০	১৮০	১৮০	১৮০	১৬০	২০০	২০০	২৪০	২৪০
১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
					২০	২০	২০	২০	২০

অযোধ্যা সুবার বসন্তকালীন ফসল উনিশ বৎসরের মূল্য তালিকা

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর	১৪শ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
গম	৯০	৯০	৯০	৫২-৬০	৫২-৮০	৫২-৮০	৫২-৭০	৪৬-৬৫
কাবুলী কলাই								
দেশী ঐ	৮০	৮০	৮০	৪০-৫৬	৪৮-৭৬	৪৮-৭৬	৪৮-৭৪	৩৪-৫৮
বার্লি	৮০	৭০	৬০	৪২-৫০	[illegible]-৬০	৫২	৪৮-৫০	৩৬-৪৪
সুগন্ধি লতাপাতা	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৬২-৭২
আফিং	১৬০	১৬০	১৬০	১৪০	১৪০	১৪০	১৪০	১৩০
সাফ্লাওয়ার	$\frac{১}{২}$ মণ	$\frac{১}{২}$ মণ	$\frac{১}{২}$ মণ	৮০	৮০	৮০	৮০	৬০-৭০
তিসি	৮০	৮০	৮০	৬৮-৮০	৬৮-৮০	৬৮-৮০	৬৮-৮০	৫০-৬৮
আদছ	৬০	৬০	৫০	৪০	৪০-৫৪	৪০-৫৪	৫০-৫৪	৩২-৪০
অরজন	৪৪	৪৪	২০	৩০	৩০-৪০	৩০-৪০	৩০-৪০	২৬
মটরশুঁটি								

১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
৪৮	৪২-৫০	৫০-৫২	৩৩-৪৬	৩৩-৪৩	৪৬-৫০$\frac{১}{২}$	৪৬-৭০	৫৪-৭৪$\frac{১}{২}$	৩১-৪৪	৩৮-৪৬
৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০

২৪–৩৮	২৬–৩৩	২৬–৩৩	২০–২৭	২০–২৮	৩০–৪১	৪২–৫৭	৩০–৫৭½	১৯–৪৪	২১–৪০
২৮–৩২	৩০–৩২	৩২–৬১	২০–২৭	২০–২৮	২৯½–৪৫	৪৮–৬২	৩৪–৫৬½	২২–৩০	২৪–৪০
৫৬–৬০	৫০–৬০	৫০–৬০	৪০–৬২	৪০–৬০	৪০–৫২	৪০–৫২	৪০–৫২	৪৪–৬০	২৪–৬০
১৩০	১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০	১০০–১৩০
		১৩০	১১৩০	১৩০	১৩০	১৩০	১৩০	১৩০	
৭০	৬০–৭০	৬০–৭০	৫২–৭০	৫২–৭০	৫৪–৬০	৫৪–৬০	৫৪–৭০	৫৪–৭০	৫৪–৭০
৩০–৩১	২৬–৩১	২৬–৩১	৩০–৩১	১৮–৩১	২০–২৭	২১–৩১	১৭½–১৮	১৭–২০	১৭–২৪
১৮–২৭	১৯–২০	২০	১৪–১৯	১৪–১৮	১৭–২৪	২০–২৪	১৯–২৮	১৯–২২	১৮½–২৫
১০–১৭	১৭–২০	১৭–২০	১৪–১৮	১৪–১৬	১৬–১৮	১৪–১৭	১৬–১৭	১৪–১৬	১৪–১৭
	২৮	২৮	১৬–২৮	১৫–৩১½	[illegible]	১০–২৮	১৬–২২	১৬–২৪	১৬–৩১

অযোধ্যা সুবার বসন্তকালীন ফসল, উনিশ বৎসরে মূল্য তালিকা। এবং
[গেণ্ডারী (পাউদা) থেকে শরৎকালীন ফসল। উনিশ বৎসরের মূল্য তালিকা]

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর	১৪শ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
পারস্যের খরমুজ								১২০
দেশী ঐ	১০	১০	১০	১০	৮–১০	৮–১০	৮–১০	৮–১০
কুর চাউল	৬৬	৬৬	৬৬	৫০–৬০	৫০–৬০	৫০–৬০	৬০–৭২	৫২–৬০
আজওয়েল	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০
পেয়াজ	—	—	—	—	—	—	—	—
কেনুগ্রীক	—	—	—	—	—	—	—	—

গাজর	১ মণ	ঐ	ঐ	—	—	—	—	—
লেটুস	—	—	—	—	—	—	—	—
গেণ্ডারী (পাউন্দা)	—	—	—	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০
সাধারণ গেণ্ডারী	১৮০	১৮০	১৮০	১৬০	১৬০–১৮০	১৬০–১৮০	১৬০–১৮০	১৬০–১৮০
শালিমুশকিন চাউল	—	—	—	৮০	৮০	৮০	৮০	৬০

১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
১২০	১২০	১২০	১৬০–১৮০	৬৬–১২০	৮৬–১২০	৮৬–১২০	৮৬–১২০	৮৬–১২০	৮৬–১২০
১৬	৮–১০	১৬	১৩–১৬	৮–১৬	১৫–১৬	১২–১৬	১২–১৬	১২–১৬	১২–১৬
৪৪–৪৬	৩৬–৪৬	৩৬–৪৬	৩৬–৪৬	২৮–৪৬	২২–৪২	৩২–৪২	৩৫–৪২	৩৫–৪২	৩৬–৫৮
৭০	৭০	৭০–৭১	৬০–৭০	৭০	৫২–৭৩	৫২–৭৩	৭০–৭৩	৫২–৭৩	৫২–৭৩
৭০–৭৩	৭০	৭০–৭৩	৭০–৩	৭০	৭০–৭৪	৭০–৭৪	৭০–৭৪	৭০–৭৪	৭০–৭৪
৭০	৭০	৭০	৭০	৭০	৫২–৮০	৫২–৮০	৫২–৮০	৫২–৮০	৫২–৮০
৮০	২৪	২৪	৫০–৯০	২৪	২০–২৫	২০–২৮	২০–২৮	১৪–২৮	১৭–২৮
২৪	২৪	২৪	২৪	২৫	২৫	২৫	২৫	১৬	২৫
২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০	২০০
১৪৪	১১৪–১৪৪	১০০–১১০	১০০–১১০	১০০–১১০	৯০–১০৬	৭০–১০০	৭০–১০০	৬৪–৮০	৬৪–১০৭
৫৬	৫৬–৬৮	৫৬	৫৬–৭০	৫০–৭০	৫৪–৭০	৪৯ $\frac{১}{২}$–৬৮	৪৪–৭৬	৪০–৭৬	৩৬–৬০

অযোধ্যা সুবার শরৎকালীন ফসল উনিশ বৎসরের মূল্য তালিকা

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর	১৪শ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
সাধারণ চাউল	৭০	৭০	৭০	৬০	৬০–৮০	৬০–৮০	৬০–৮০	৪৮–৫২

মুনজি চাউল	—	—	—	—	—	—	—	—
তুলা	১২০	১২০	১৩০	১১০	১১০–১৩০	১১০–১২০	১১০–১২০	৮৮
খাদ্যে ব্যবহার্য মুসকিলতাপাতা	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৭০
তিলবীজ	৬০	৬০	৮০	৭০	৭০–৮০	৭০–৮০	৭০–৮০	৬৪
মথ (মসুর)	৪৮	৪৮	৫৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪
মাশ	৪৮	৪৮	৫৪	৪৪	৪৪–৪৫	৪৪–৫০	৫০–৫৪	৩৬
মুগ	৪৮	৪৮	৪৮	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪	৪৪
যোয়ার	৫০	৫০	৬০	৪৮	৪৮–৬০	৪৬–৬০	৪৮–৬০	৪০
লমদরাহ	৪৮	৪৮	৪৮–৫০	৪৪	১৬–৪৪	৪৪–৫০	৪৪–৫০	২০–৭০

	১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০শ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
	৩৬	৩৬–৩৮	৩৬–৩৮	৩৬–৩৮	২৮–৩৬	২৪–৩৮	২২–৪৬	৩৬–৪০	২১–৩৬	২২–৩৬
	—	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৪৮	৬০	$৪৪\frac{১}{২}$	৬৫	৬৫
	৯০	৯০	৭০–৯০	৭০–৭৪	৭২–১৩০	৭২–১৩০	৬৫–৭৯	৬৪–৭০	৫০–৬০	৪৬–৯০
	৭০৬০–৭০	৫০–৭৬	৬০–৭০	৬০–৭০	৬৪–৯৪	৬৪–৯৪	৬৪–৯৪	৬৪–৯৪	৬০–৭০	৬০–৬৪
	৫০	৫০	৪০–৫০	২৮–৫০	২৪–৫০	২৮–৩২	২৯–$৯০\frac{১}{২}$	$২১\frac{১}{২}$–৩৩	$২১\frac{১}{২}$–৩০	১৯–২৬
	২২	২২–৩৬	২২	২০–২২	২০–২২	১৩–$২১\frac{১}{২}$	১৮–২৫	১৬–২৫	১২–২০	১৬–২০
	২৮	২৮–৩৬	২৮	২৭–২৮	২৬–২৮	২৩–৩৫	২৮–$৪২\frac{১}{২}$	২৮–৩৪	১৯–৩৬	১৬–২৮

৩২–৪০	৩২–৪০	৩২–৪০	৩২–৪০	৩২–৪০	৩২–৪৮	২৮ ১/২–৪৪	৩০–৫২	৩৬–৪৬	২৫–৩০
২৬	২৬–৪০	২৬	২৬–২৭	২৪–২৬	২৩–৪০	২৩–৪৮	২৫ ১/২–৪৮	৩০–৪০	২৪–৪৬
২০–৪০	২০	২০–৪০	১৮–৪৮	১৮–৪৮	২০–৪০	১৮–৪৮ ১/২	৩০–৪০	১৮–৩০	১৮–৩০

অযোধ্যা সুবার শরৎকালীন ফসল উনিশ বৎসরের মূল্য তালিকা

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর	১৪শ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
লবিয়া	—	—	১৬–৪৪	৪৪	৪৪–৪৫	—	—	—
কোদরম	৪৪	৪৪	৪৪–৪৫	৪৪	৪৪–৪৫	৪৪–৪৫	৫০–৫৪	৩৬
কোরি	৪০	৪০	৫০	[illegible]৪	২৪–৩০	২৪–৩০	৩০	২০
শমাখ	৩৬	৩৬	৫০	৩০	৩০–৩৬	৩০	৩৬	২০
গাল	৪৪	৪৪	৫০	৪০	৪০–৫০	৪০–৫০	৪০–৫০	২৬
অরজন	৪৪	৪৪	৫০	৪০	৪০	৪০	৪০	৩৪–৩৬
মনদওয়াহ	৪৮	৪৮	৫০	৪০	৪০	৪০–৫২	৫০–৫২	৩৪
নীল	১৪০	১৪০	১৬০	১৪০	১৪০	১৪০	১৪০	১৩৬
শন	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০	৭০–৭৮
তুরি	৮০	৮০	৮০	—	—	—	—	—

১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর
দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
২৪	১৫–৫০	৩২	৩২	৩০	২৬ ১/২	৩৫	২০	২০	২০

২১–২৩	২১–৩৬	২০–২১	২০–২১	১৬–২৪	২২–৩০	২৮–৪১	২২–২৪	১৮–২৮	১৫–২৮
১০	১০	৮–১০	১০	১০	৯–১০	৯–১২½	৯–১২½	৯–১২½	১০½–১৮½
১০	১০–২০	১০	৯–১০	৯–১০	৯–১২½	৮½–১৮	১০–১৬	৮–১২	১১–১৬½
১৩	১৩–২৮	১৩	১০–১৩	১০–১৩	১১–১৫	১২–২৩	১২–২৩	১৪–১৪½	১২–১৪
২০	২০	২০	২০	১৮–২৮	২০–২৮	২৪–২৮	১৪–২৮	১৪–২২	১৪–২৫
২২–২৩	২২–২৩	২২–২৩	১৬–২২	১৮–২০½	২২–৩১	১৮–২৮	১৪–২৮	১৪–২৮	১৩২
১৩০–১৩৬	১৩০–১৩৬	১৩৬	১৩০–১৩৬	১৪০	১৪০	১৪০	১৪০	১৪০	১৪০
৭০	৭০–৭৮	৭০	৭০	৭০	৭৯–৮০	৮০	৮০	৬০–৮০	৬০–৮০
৩২	৩২	৩২	২৪–৩২	২৪–৩২	২০–৩২	১৮–৩২	২০–৩২	২০–৩২	১৪½–২৪

অযোধ্যা সুবার শরৎকালীন ফসল উনিশ বৎসরের মূল্য তালিকা (পূর্বানুক্রমিক)

	৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর	১১শ বৎসর	১২শ বৎসর	১৩শ বৎসর	১৪শ বৎসর
	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
হলুদ	—	—	—	—	—	—	—	—
কাচালু	—	—	—	—	—	—	—	—
কুল্‌ত	—	—	—	—	—	—	—	—
হিন্না	—	—	—	—	—	—	—	—
তরমুজ	—	—	—	—	—	—	—	—
পান	—	—	—	—	—	—	—	—
সিঙ্গারা	—	—	—	—	—	—	—	—
অরহর	—	—	—	—	—	—	—	—

১৫শ বৎসর	১৬শ বৎসর	১৭শ বৎসর	১৮শ বৎসর	১৯শ বৎসর	২০ বৎসর	২১ বৎসর	২২ বৎসর	২৩ বৎসর	২৪ বৎসর,
দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ	দ
১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
৬০	৭০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০
২০	৩৬	৩৬	৩৬	৩৬	২৪	২৪	২৪	১৮	২৯$\frac{১}{২}$
৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮–৭০	৫৮–৭০	৬০–৭০	৬০–৭০	৬০–৭০
১০	১৬–১৮	১০	১০	১০	১০–১২	১০–১২	১০–১২	১০–১২	১০–১২
১৮০	১৮০	১৮০	১৮০	১৮০	৩০০	২০০	২০০	২৪০	২৪০
১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
—	—	—	—	—	২০	২০	২০	২০	২০